শহর ও শিল্পাঞ্চলের গণ্ডী
অতিক্রম করে আমাদের
বিদ্যুৎবাহী লাইনগুলি
ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম বাংলার
গ্রামে গ্রামান্তরে।
এ পর্যন্ত সাড়ে চার হাজারেরও
বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের
ব্যবস্থা করা হয়েছে।
শত শতাব্দীর আঁধার ও রিক্ততার
অবসানে গ্রাম বাংলায়
আলোকিত জীবন এবং প্রাচুর্য ও
সমৃদ্ধির স্থায়ী বনিয়াদ রচনার
লক্ষ্য সামনে রেখে
বিদ্যুৎ-কর্মীরা এখন প্রতিদিন
গড়ে চার থেকে সাতটি করে গ্রামে
বিদ্যুৎ শক্তি পেঁাছে দিচ্ছেন॥

গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচী
বস্তুত আঁধার ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে
অভিযান॥

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

চলুন
রিচব্রুর
চালে
যেমন
সরেস
তেমনি
গাঢ়
তেমনি
কড়া
আপনার প্রাণ জুড়োবে রিচব্রু চা।
রিচব্রুর স্বাদ আপনার ভালো
না লেগেই যায় না।
চায়ের মধ্যে সেরা,
আবার প্রতি প্যাকেটে
পাবেন অনেক
বেশি কাপ চা।
একমাত্র প্যাকেটের
চা-ই থাকে তরতাজা,
থাকে স্বাদেগন্ধে
ভরপুর।
LIPTON'S
RICHBRU TEA
LIPTON'S
RICHBRU
TOP QUALITY LEAF TEA
লিপটনের
রিচব্রু
LRC-10/72 BEN

টেলর
ডিল্যুক্স
লিংক
জওয়ান
নোভা
রূপা
প্রাইমা
স্ট্রীমলাইন্‌ড
এক্‌সেলা
ফ্লোরা

ভারতের
প্রতিরক্ষা ও
উন্নয়নে
অংশ গ্রহণ করুন
সেই সঙ্গে
আয় করুন
৭¼%
সুদ
৫ বছরের
ডাকঘর নির্দিষ্টকালীন জমার ওপর
৩ বছরের
জমায়............ ৭%
১ বছরের
জমায়. . ৬%
এই সঙ্গে অন্যান্য করযুক্ত সিকিউরিটী ও ডিপজিটের ওপর
প্রাপ্য সুদ নিয়ে বছরে মোট ৩000 টাকা পর্যন্ত সুদের ওপর
আয়কর লাগবে না।
আপনার ডাকঘর কিংবা আপনার জেলার জাতীয় সঞ্চয়
সংক্রান্ত জেলা সংগঠকের কাছে খোঁজ করুন।
জাতীয়
সঞ্চয়
সংস্থা
davp 72/ 212

দেশবাসীর
আশা-আকাঙ্খা
রূপায়ণে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
১৯৩৬ সাল থেকেই
আমরা দেশবাসীর জন্যে
ওষুধপত্রের গবেষণা, রূপায়ণ
আর বিপণনের কাজে
নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছি।
ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-১৬

এই মরশুমে বাটার ক্যানভাস জুতোর বিপুল সমারোহ

বর্ষ ৩৪ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯

সূচিপত্র

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

ALLAHABAD BANK

Head Office . 14, India Exchange Place, Calcutta-1,

বর্ষ ৩৪ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯

আদ্যাশক্তিমহাশক্তিকালিকাকাহিনী

অশোক মিত্র

ব্যাপার-স্যাপার দেখে হকচকিয়ে যেতে হয়। জিনিশপত্রের দাম বাড়ছে, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাড়ছে, চাকরির বাজারে মন্দা, নানা তরফের বাগবিস্তার সত্ত্বেও কলকারখানার প্রসার আদৌ নেই, এবছর ফসলও ঈষৎ কম হয়েছে, বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান; যেদিকেই তাকানো যায়, কোনো আশার আলো নেই। অথচ ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্য ক'রে মাতামাতি তুঙ্গে উঠেছে। কোথায় এরকম অবস্থায় একটু রয়ে-সয়ে খরচ করা হবে, হৈহুল্লোড় একটু কম ক'রে করা হবে, হচ্ছে ঠিক উল্টোটা। কলকাতার অলিতে-গলিতে-কোণে-সুড়ঙ্গে দুর্গাপুজোর সমারোহ: যেখানে গত বছর দুটো পুজো ছিল, সেখানে এবার চারটে; যেখানে চারটে, সেখানে অন্তত সাতটা। সার্বজনীন পুজোর শুধু সংখ্যাবৃদ্ধিই ঘটছে না, চটকও বাড়ছে, পুজো উপলক্ষ্য ক'রে ঢালাও অর্থের বন্যা বইছে। দেশে বিজলী সংকট, পুজোর ক'দিন কে দেখে বলবে: নানা রঙের আলোর রোশনাই, উৎসবের দাপাদাপি। আমাদের এ-পাড়ার পুজোর চমকেগমকে তোমাদের ও-পাড়ার পুজোকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, অন্যথা মুখরক্ষা হবে না। সুতরাং প্রতি বছর মাতামাতির বহর বেড়েই চলেছে: মাতৃপুজো গৌণ, আসল লক্ষ্য কে কাকে কতটা হারিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু দুর্গার আরাধনাতেই ক্ষান্তি নেই। শ্যামাপুজোর সম্ভার, সন্দেহ হয়, দুর্গোৎসবকে ছাপিয়ে উঠেছে। এক সন্ধ্যার কালীসাধনা টেনে-হিঁচড়ে প্রায় সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে: ডামাডোল, ডামাডোল, কে কত বাজি ফোটাতে পারে, কে কত আলোর ছটায় আকাশকে উন্মত্ত ক'রে আনতে পারে। প্রাণ-কাঁপানো শব্দের অহোরাত্র সমারোহ, প্রতি রাস্তায় কাতারে-কাতারে শ্যামাপুজো, এমন কি পাশাপাশি দুটো সার্বজনীন ব্যাপার একই রাস্তার উপর, অথবা মুখোমুখি। তাছাড়া, পৃথিবীতে দেবদেবীর শেষ নেই: কালী পুজোর পর জগদ্ধাত্রী পুজো, জগদ্ধাত্রীর পর কার্তিক, কার্তিকের পর বাসন্তী, বাসন্তীর পর বিশ্বকর্মা, এমনি ক'রে, পৌষ পেরোতে না-পেরোতে, দেবী সরস্বতীতে পৌঁছে যাওয়া। শুধু সময়ের ফাঁকগুলি ভরিয়ে যেতে থাকো, পুজো থেকে পুজান্তরে এ ভাবে বিহার ক'রে ক'রে অচিরে ফের দুর্গোৎ-সবের ঋতুতে উপনীত হওয়া যাবে। প্রতি নতুন ঋতুতে নিনাদ আরো একটু উচ্চগ্রাম হোক;

আমাদের ডুবতে দাও, আমাদের মরতে দাও।

বছর কয়েক আগেও, পুজোর সম্ভার জোটানো হতো পাড়ায়-পাড়ায় চাঁদার হামলা ক'রে। চাঁদা, যা স্বেচ্ছায় দেয়, তাকে জিজিয়াতে পরিণত ক'রে তোলা হয়েছিল, সাধারণ গৃহস্থের না দিয়ে উপায় কী। হালে চাঁদার অত্যাচার হয়তো কমেছে, উৎসবের সমারোহ বাড়া সত্ত্বেও কমেছে। খুচরো অর্থ সংগ্রহের আর তেমন দরকার নেই ছেলেদের, তারা প্রচুর কাঁচা টাকা পাচ্ছে হাতে। রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে পাচ্ছে, ভয়ে-নীল-হয়ে-আসা ব্যবসায়ীরাও বিজ্ঞাপনের ছুতোয় মোটা টাকা দিচ্ছে। তাছাড়া, সরকারি সৌজন্যও প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হচ্ছে। বলতে গেলে, এ-বছর থেকে, এই পশ্চিম বাংলায়, যাবতীয় হিন্দু পুজাদি রাষ্ট্র-স্বীকৃত, রাষ্ট্রপ্রসাধিত অনুষ্ঠানে পরিণত। সরকার এবং প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রসন্ন অভয় সার্বজনীন সর্ববিধ উৎসবকে মায়ার কাঠি ছুঁয়ে গেছে। সুতরাং যত ইচ্ছে বেলেল্লা হুল্লোড় চলুক, পাড়ায়-পাড়ায় ছেলের দলের ভয়চকিত হবার কোনোই কারণ নেই। আপাতত তাদের কেন্দ্র ক'রে পৃথিবী অন্বিত হচ্ছে, তাদের কড়ির অভাব নেই, রাষ্ট্রপ্রসাদেরও অভাব নেই। পুজা থেকে পুজান্তরে, নিবিড় ঘোরের মধ্য দিয়ে যুবশক্তির বিহার চলবে।

অথচ, খোঁজ নিয়ে দেখুন, বেকারের সংখ্যা ভয়ংকর বেড়ে গেছে গত কয়েক বছরে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছেলেরা ঠায় ব'সে আছে, সতেরো হাজার পদের জন্য সতেরো লক্ষ দরখাস্ত জড়ো হচ্ছে; যারা কলাবিজ্ঞান নিয়ে সাধারণভাবে পড়াশুনা সমাধা করেছে তাদের যেমন সুবিধা হচ্ছে না, যারা কারিগরি শিক্ষায় অতিক্রম হয়েছে, তাদেরও একই অবস্থা। সেচের তেমন প্রসার না-হওয়ায়, এবং ভূমিব্যবস্থার সংস্কার উপস্থিত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকায়, পল্লী অঞ্চলেও অনুরূপ ঘটনার ঘনঘটা; ভিড় বাড়ছে, কিন্তু লোকনিয়োগ বাড়ছে না। অথচ সর্বত্র মূল্যমান ঊর্ধ্বগতি : যাঁদের উদ্বৃত্ত ফসল নেই, অথবা মূল্যবৃদ্ধি থেকে যাঁরা সামান্যতম বাড়তি মুনাফা হাতাতে পারছেন না, তাঁরা সংখ্যায় অমেয়। দেশের জনসাধারণ সার্বিকভাবে মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপে হাঁসফাঁস করছে। সার্বজনীন পুজাসমূহের উদ্যোক্তারা কিন্তু এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার। বেকারের সংখ্যা যত বাড়ছে, জিনিশপত্রের দাম যত বেশি চড়ছে, মহাশক্তিমহাবিদ্যামহাদুর্গামহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীআদ্যাশক্তিকালিকাপরমেশ্বরীবন্দনা ততোই আরো ছড়াচ্ছে।

কেন এমনধারা হচ্ছে তার কিন্তু একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সম্ভব। ধরুন গোটা পশ্চিম বাংলায় বেকারের সংখ্যা তিরিশ লক্ষ ছুঁই-ছুঁই করছে। সামান্য বেশিকম হতে পারে, কিন্তু নানা অনুসন্ধানে মনে হয় এই হিশেবটিতে তেমন-কোনো ভীষণ গলদ নেই; এমন কি রাজ্য সরকারও দু'একবার এই সংখ্যাটিকেই ব্যবহার করেছেন। যদি রয়ে-সয়ে অঙ্ক কষে বলা যায় যে বর্তমান অবস্থায় নতুন কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন জনপ্রতি অন্তত পাঁচ হাজার টাকার বিনিয়োগ, তা হলে তিরিশ লক্ষ নতুন কাজ সৃষ্টি করতে হলে পনেরো শো কোটি টাকার দরকার পড়বে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, হিশেব আরো একটু ছাঁটুন, এখন যে-সমস্ত কলকারখানা বন্ধ আছে কিংবা তৈজসাদির অভাবে অথবা আর্থিক সংকটহেতু যে-সব কারখানায় পুরো কাজ হচ্ছে না, সে-সব জায়গায় অতিরিক্ত লোকনিয়োগের জন্য জনপ্রতি আদৌ পাঁচ হাজার টাকার দরকার নেই, কম হলেও চলবে। কৃষিক্ষেত্রেও ঐ হারে বিনিয়োগ তেমন আবশ্যিক নয় : ভূমিসংস্কার প্রয়োজন, সার-সেচ-বিদ্যুৎ-উন্নত ধরনের বীজ-লগ্নি ইত্যাদি নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলে গড়ে দু'হাজার-আড়াই হাজার টাকা ঢাললেই একজন লোকের কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। তর্কের খাতিরে এত সব কথা মেনে

নিলেও তিরিশ লক্ষ বেকারের ব্যবস্থা করতে হলে নিদেনপক্ষে এক হাজার কোটি টাকা চাই-ই চাই। এই পরিমাণ মুদ্রার সংস্থান রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে উপস্থিত সুদূরপরাহত। তা যদি না-ও হতো, বিনিয়োগের মারফত উৎপাদনব্যবস্থার সম্প্রসারণ চারটিখানি কথা নয়; তা সময়সাপেক্ষ, বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ হ'তে। বেকার-সম্প্রদায় কি অতটা সময় স্রেফ আঙুল চুষতে রাজি থাকবে?

পরিকল্পনার জাল পেতে, উৎপাদনব্যবস্থাকে বিকশিত-উন্মোচিত ক'রে বেকারসমস্যার তাই আশু সমাধান সম্ভব নয়। অত পরিমাণ টাকা নেই, যথাযোগ্য সংগঠনশক্তি নেই, সবচেয়ে যা বড়ো কথা, আপনারা টিপে-টিপে মেপে-ঝেপে পরিকল্পনা রূপায়িত করবেন বহু বছর ধরে, আর সুবোধ বালকের মতো বেকারের দল চুপচাপ আশায় বুক বেঁধে পাশ থেকে আপনাদের প্রকর্ষ অধ্যবসায়-সহকারে নিরীক্ষণ করবে, তা হ'তেই পারে না। সেই ঋতু আমরা অতিক্রম ক'রে এসেছি। তাছাড়া ততদিনে বেকারের সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে যাবে।

এই মুহূর্তে অন্য যা করা যেতে পারে তা কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতার ব্যবস্থা। এখানেও কিন্তু পাটিগণিত মারাত্মক। প্রতি বেকারকে মাসে একশো টাকা ক'রে বৃত্তি দিতে হ'লেও, বছরের হিশেবে গিয়ে দাঁড়ায় বারোশো টাকায়। তিরিশ লক্ষ বেকারের জন্য তা হ'লে বাৎসরিক বরাদ্দ পড়ে তিনশো ষাট কোটি টাকা, এবং বছরের পর বছর ধরে অতএব এই তিনশো ষাট কোটি টাকা বা সমপরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা রাখতে হয়। জনপ্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে ধরলেও বাৎসরিক হিশেব একশো আশি কোটিতে স্তম্ভিত থাকে। বেকারদের শান্ত রাখা কর্তব্য, নইলে আগুন জ্বলবে, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার এমন সামর্থ্য নেই যে স্রেফ পশ্চিম বাংলায় বেকারভাতা বিলোনোর জন্য প্রতি বছর দুশো কোটি টাকার মতো আলাদা ক'রে নির্ধারণ করা হবে।

সমস্ত কর্মহীনকে সুষ্ঠু বিনিয়োগের মারফত কাজ পাইয়ে দেওয়া, অন্যথা প্রত্যেকের জন্য ন্যূনতম ভাতার ব্যবস্থা করা, আপাতত সরকারের পক্ষে অসম্ভব। ময়দানে বক্তৃতার পাটাতনে দাঁড়িয়ে কাব্যিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে, কিন্তু প্রতিশ্রুতির পরিপূরণ সম্ভবপরতার বাইরে, বহু যোজন বাইবে। কিন্তু একটা-কিছু করতেই হয়, নইলে যে-যুবশক্তিকে নির্ভর করে রাজনৈতিক সাফল্যের শীর্ষে পোঁছনো গেছে, তা বিগড়ে যাবে, বিগড়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলা শুরু করবে, উল্টোপাল্টা কথা থেকে উল্টোপাল্টা কাজ, বিষম বিপত্তি ঘটবে।

সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না; যুবকসম্প্রদায় মারমুখো হয়ে উঠবে না, অথচ সরকারি খাতে তেমন মারাত্মক অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন হবে না, এমন রাজযোটক সূত্রের খোঁজে অথচ খুব বেশি দূর যেতে হলো না। পল্লী অঞ্চলের যুব সম্প্রদায় সম্বন্ধে এখনো তেমন মাথা না-ঘামালেও চলবে: কর্মসংস্থানের অভাবে তাদের মনে যদিই বা বিক্ষোভ দানা বাঁধে, সে-অসন্তোষ সহসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই, কারণ গরিব কৃষকদের সংগঠন তেমন জোরালো নয়; পশ্চিম বাংলায় যা-ও একটু জোরালো হয়ে উঠেছিল, রাজনৈতিক ঘটনা-সংঘাতে ফের ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সুতরাং, যদি পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে নিগড়ে বাঁধতে হয়, কলকাতা এবং প্রধান-প্রধান মফস্বল শহরগুলির কর্মহীন যুবকদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। এমন-এক আয়োজন চাই যার প্রসাদে কর্মসংস্থানের কোনো সুচারু ব্যবস্থা হোক না হোক, ন্যূনতম কোনো নিয়মিত উপার্জন থাকুক না থাকুক, যুবকের দল ভুলে থাকবে, সম্মোহিত থাকবে, নিয়োজিত থাকবে। সার্বজনীন পূজার সমারোহে সেই প্রার্থিত পথের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অঙ্কের হিশেবেই ফেরা যাক। ধরুন তামাম কলকাতা শহরে সব-মিলিয়ে দু'হাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইদানীং জনশ্রুতি কোনো-কোনো এ ধরনের পুজোয় খরচের বহর এক লাখ-দেড় লাখে গড়িয়ে গেছে; অন্যদিকে, কোনো-কোনো দরিদ্রতর পাড়ায়, দশ-পনেরো হাজার টাকার মধ্যেই এখনো মহাদেবীর আরাধনা সম্পন্ন হ'তে পারছে। যদি গড়ে প্রতি সার্বজনীন অনুষ্ঠানের খরচের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব'লে ধরা হয়, তা হ'লে দু'হাজার অনুষ্ঠানের জন্য মোট ব্যয় ঠেকে গিয়ে এক কোটি টাকায়। দুর্গোৎসব বাদ দিয়ে সারা বছর ভ'রে অন্য আরো যা-যা পুজোর প্রকোপ চলে, ধরুন সার্বজনীন খাতে সে-সমস্ত অনুষ্ঠানে আরো দু'কোটি টাকা প্রবাহিত হয়ে যায়। সংবৎসরে জননী ভগবতী এবং তাঁর আশেপাশের দেবদেবীদের উপলক্ষ্য ক'রে তাহ'লে সাকুল্যে তিন কোটি টাকার চাহিদা। মফস্বল শহরের পুজাপ্রক্রিয়ায় কলকাতার জৌলুষ নেই, খরচপত্রের বহরও অনেকটাই পরিসীমিত। তাহ'লেও যদি মেনে নেওয়া যায় যে মফস্বলে নানা সার্বজনীন পুজানুষ্ঠানে দু'কোটি টাকা ব্যয়িত হয়, তাহ'লে সারা পশ্চিম বাংলায় প্রকাশ্য পীঠে বহুবিধ দেবীবন্দনার জন্য সম্পূর্ণ খরচের মাত্রা মোটামুটি পাঁচ কোটি টাকার মতো দাঁড়ায়।

এই অঙ্কের একটু-আধটু হেরফের হ'তে পারে, কিন্তু তুলনাগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাতে ব্যত্যয় ঘটবে না। কর্মহীন যুবকদের চাকরি দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই, বিনিয়োগের ব্যবস্থা-শিল্পবিস্তারের প্রতিভা আমাদের আয়ত্তের বাইরে, আমাদের যে-কোনো প্রতিশ্রুতির ভরাডুবি ঘটবার আশঙ্কা। যুবক সম্প্রদায় অলিন্দের বাইরে দাঁড়িয়ে আশায় দোলায়িত হচ্ছে, কিন্তু দুদণ্ড বাদেই, যে-মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র তমিস্রার কাহিনী ঘোষিত হবে, তাদের প্রতীক্ষার চরিত্র বদলে যাবে : তারা হিংসায় ফুঁসবে, ক্রোধে খান্‌খান্‌ করতে চাইবে অলিন্দ-প্রকোষ্ঠ-সুগঠিত প্রাসাদ। সেই সর্বনাশের হাত যদি এড়াতে চাই, এসো, যুবকদের লেলিয়ে দিই, দেবী-পুজোয় ভিড়িয়ে দিই, নেশায় ওরা মাতোয়ারা হয়ে উঠুক। একবার নেশায় মাতলে ওদের দিয়ে আর ভয় নেই, নেশার ঘোরে ওরা পরিপার্শ্ব ভুলবে, নিজেদের অতীত-ঐতিহ্য ভুলবে, ভবিষ্যৎচিন্তা ভুলবে। এই নেশা দৈনন্দিন দিনযাপনের গ্লানিকে চাপা দেয়, খিন্নতা-জীর্ণতার আলোক-পরিধির বাইরে যুব সম্প্রদায়কে তুলে নিয়ে যায়, সমস্ত ভাবনাচেতনা এক উতরোল সম্মোহনে ডুবিয়ে দেয় : কাড়ানাকাড়াজগঝম্প, হট্টগোলশঙ্খনাদদামামাদ্রিমিকি, রক্তসদৃশ-সিন্দুরচর্চিতবিভা, নৃত্যগীতঅট্টহাসিউচ্চহুংকার, দ্রুততমধমনীস্পন্দনহতচকিতবিদ্যুৎবহ্নি। নেশা, ঘোর, বিষাদ ও আনন্দের অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ, মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে-আসা এক অসহ্য সুখসংগীত। যে-ভয়াবহ পার্থিব আরতি জীবনানন্দকে মুহ্যমান করে এনেছিল, সেই শত-শত শূকরের চিৎকার, শত-শত শূকরীর প্রসববেদনা, কান্না-প্রেম-মোহ-অভিমান-অনুভূতি সব-কিছু পিছনে ফেলে রেখে দেবীপুজোর উন্মত্ত প্রস্থান। কেউ-কেউ কাজ পায়, অধিকাংশ পায় না; অল্পসংখ্যক কয়েকজন ফুলে-ফেঁপে-অপরের মাথায় কাঁঠাল বুলিয়ে ঐশ্বর্যের তুঙ্গ পাহাড়ে চড়ে বসেছেন, অথচ অধিকাংশই সানুদেশে ধিকিয়ে-ধিকিয়ে নরকপ্রতিম জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে; শিল্পপতি-সদাগরের দল মিথ্যে কথা বলছেন, জালিয়াতি করছেন, পুকুরচুরি করছেন, সমাজতন্ত্রের ধোঁকা দিয়ে আখের গুছোচ্ছেন, অন্যদিকে দু'মুঠো অন্নের সংস্থানও বি.এসসি-এম.এসসি-এম.টেক পাশ-করা অগণিত ছেলেমেয়েরা করতে পারছে না; গুটিকয়েক অসাধু রাজনৈতিক নেতা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আপোষরফা করে জিনিশপত্রের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, অথচ পরমুহূর্তে খবরকাগজে নাকি কান্নার প্রবাহ বইয়ে দিচ্ছে : একবার মহাশক্তি-কালিকাপরমেশ্বরী প্রভৃতির পুজোর ফেরে ভিড়িয়ে দিতে পারলে এবংবিধ উটকো চিন্তার

মোহাবরণ আর যুবকদের জড়াতে পারবে না। শ্রেণীসংঘর্ষের ইতিকথার মধ্যে তাদের আর প্রবিষ্ট হবার উপায় থাকবে না তাহ'লে, তাঁরা নির্বেদ নির্মোহ মেষশাবককুলে পরিণত হবে। পুজো থেকে পুজান্তরে, এক দেবীর স্তুতি থেকে অন্য-এক ভীষণতরা দেবীর স্তুতিতে, এক তন্ত্রের অজ্ঞান থেকে ঘোরতর অন্য-এক তন্ত্রের গভীরতর জ্ঞানহীনতায় যুবকযুবতীরা বিহার করবে। তারা আলাদা ভাবে চিন্তা করতে ভুলে যাবে, দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা তাদের আর স্পর্শ করবে না, ক্ষুধাতৃষ্ণাদিসম জৈব প্রয়োজন তারা উপস্থিত ভুলে থাকবে; সেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-কথিত নেশার মতো, তারা ভেসে-ভেসে যাবে।

অথচ, কত সস্তায় কিস্তি মাৎ দেখুন। হাজার-হাজার কোটি টাকার শিল্পসম্ভার নয়, কয়েক শো কোটি টাকার বেকার ভাতা পর্যন্ত নয়, প্রতি বছর কমবেশি কোটি পাঁচেক টাকার সামান্য মামলা। যাঁরা রাষ্ট্রশক্তির হাল ধ'রে আছেন, শিল্পপতি-উচ্চবিত্ত-কৃষিব্যবসায়ীদের সঙ্গে যাঁদের নাড়ির সংযোগ, পাঁচসাত কোটি টাকার ব্যবস্থা করা তাঁদের কাছে অতিশয় সরল ব্যাপার, চিনি বা গম বা সুতি কাপড়ের দাম একটু বাড়িয়ে দিলেই এই ঈষৎপরিমাণ টাকা তাঁদের করতলগত আমলকি হয়ে যায়। তাই গঙ্গাজল দিয়েই গঙ্গাপুজোর উপচার সাজানো হচ্ছে : তৈজসাদির দাম চড়িয়ে সাধারণ লোকের কাছ থেকে বাড়তি যে-অর্থ আহরণ করা হয়, তার একটা অংশ যুবককুলকে বশীভূত করার প্রয়োজনে ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত হ'তে থাকে। অশ্লীলতার এক বিশাল বন্যা ভব্যতা-সভ্যতাকে পরাভূত ক'রে বিজয়ী রাজপুত্রের মতো এগিয়ে যায়।

চিকিৎসাশাস্ত্র তথা মনোবিজ্ঞান দু'পক্ষ থেকেই এই মীমাংসার সমর্থন মেলে; পাশ্চাত্ত্যের মহাদেশাদিতে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যে-নৈরাজ্য দেখা গেছে, তার অভিজ্ঞতাও অনুরূপ : একবার নেশার আবর্তে নিমজ্জিত হ'লে বেশ কয়েকদিনের জন্য খাদ্য-পানীয়ের তাগিদের বাইরে চলে যাওয়া যায়, শরীরের আদিম প্রয়োজনগুলি স্তিমিত হয়ে আসে। অবশ্য, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে, স্রেফ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দিন অতিক্রান্ত করলে, দেহে কোনোরকম পুষ্টি অনুপ্রবেশের সুযোগ না-থাকলে, আস্তে-আস্তে মৃত্যুর দূতেরা এগিয়ে আসবে, নেশার ঘোর আর মৃত্যুর সমাচ্ছন্নতার মধ্যে তখন আর বিশেষ তফাৎ থাকবে না, শরীরের বিভা ক্রমশ নিস্তেজ হবে, নিস্তেজ হ'তে-হ'তে একদিন সম্পূর্ণ নিভে যাবে। কিন্তু কী লাভ আগে থেকে সেই মহাশ্মশানের কথা ভেবে। দেশের যাঁরা হাল ধরে আছেন, তাঁদের আপাতত সমস্ত গুরুতর চিন্তার প্রদাহ থেকে মুক্তি। দেশে অন্নাভাব থাক, ক্ষতি কী; দেশে প্রতিদিন বেকারের সংখ্যা হাজারে-হাজারে বেড়ে যাক, কোনো ক্ষতি নেই; আর্থিক প্রগতি এক-জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে থাক, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কোনো ক্ষতি নেই দেশ যদি চরম সর্বনাশের দিকে ধাপে-ধাপে এগোতে থাকে, কারণ আমরা অক্ষত থাকবোই, আমাদের হাতে জাদুকাঠি, আমরা দেশের লোককে পুজোর নেশায় ভিড়িয়ে দিয়েছি, দেবীশক্তিআদ্যাশক্তিমহাশক্তিকালিকা-প্রলয়ংকরীপ্রলয়েশ্বরী আমাদের আশ্রয়, কোনো প্রলয় তাই আমাদের আর ছুঁতে পারবে না।

একবার চিন্তা করুন, এটা ১৯৭২ সাল, মানুষ স্বয়ংসাধিত বিজ্ঞানের সাহায্যে চন্দ্র-লোকে পৌঁছে গেছে, পদার্থের নিভৃততম রহস্য আজ মানুষের কুক্ষিগত, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ডে ঈশ্বরের যে-কোনো অভিব্যক্তি ধূল্যবলুণ্ঠিত। চিন্তা করুন, ভারতবর্ষে রাজ-নৈতিক স্বাধীনতালাভের পর পঁচিশ বছর গত হয়েছে, অথচ ঐ সময়ের পরিসরে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ বাড়ে তো নেই-ই, বরঞ্চ হ্রাস পেয়েছে, ধনৈশ্বর্যবণ্টনের অসাম্য কমে না গিয়ে আরো বিস্ফারিত হয়েছে। চোখ মেলে দেখুন, দুর্গোৎসবকালিকাসাধনার আলোকঝলকিত

মন্ডপের ঠিক বাইরে, কী গভীর স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার, দু'পা এগোলে শীর্ণবুভুক্ষুমুমূর্ষু ভিখিরির শরীরে আপনার পা জড়িয়ে যাবে, এরকম অন্তত পনেরো লক্ষ ভিখিরি-প্রায়ভিখিরি কলকাতার রাস্তায়, খোলা আকাশের নিচে, গ্রীষ্মে-শীতে-বর্ষার বীভৎসতায় দিনাতিপাত করে যাচ্ছে। অথচ, কোনো পুরুষার্থ উত্তেজিত হয় না, ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে, কাড়ানাকাড়া, শঙ্খনাদ, দেবীর রসনানিঃসৃত রক্তের বিদ্যুৎ-ঝলক, দেবীকে পুজো করো, দেবীতে আনত হও, পুরুষার্থ স্তিমিত হয়ে আসুক।

স্তিমিত হয়ে আসে। সন্দেহ হয়, যাঁরা রাজনীতির লীলাকেলি খেলছেন, তাঁরা দুই স্তরে ভেল্‌কি সাধছেন। অনবচ্ছিন্ন দেবীসাধনার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার গহনে হয়তো আরো-এক গূঢ় অভীপ্সা নিহিত আছে। এখানেও মনোবিজ্ঞান ছায়া ফেলে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, সাংকেতিকতার সূত্রে অনেক সময় যে-প্রয়াস বিধৃত, ইশারায়-ইঙ্গিতে সে ধরনের কোনো প্রজ্ঞা আমাদের চেতনার উপর চাপিয়ে দেওয়া চলছে যেন। দেবীপুজো, মাতৃসাধনা, শক্তিআরাধনা, মহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীমহাভগবতীমহেশ্বরীকে তদ্গতচিত্তে তর্পণ : এটা প্রসাদ-ভিক্ষার ঋতু, সর্বস্বসমর্পণের ঋতু, অন্ধভক্তির ঋতু, অলৌকিকতায় বিশ্বাসের ঋতু, অন্ধ আবেশের ঋতু। যিনি এই আবেগের-প্রত্যয়ের-আবেশের-নিষ্ঠার-ভক্তির-ভয়ের-মোহাচ্ছন্নতার অভিরূপ, তিনি কে? তিনি কি শুধুই বৈদেহী দেবিকা, যাঁকে আমরা প্রতিমামৃত্তিকায়, আমাদের সংকীর্ণ পার্থিবকল্পনায় সীমিত ক'রে আনি, নাকি তিনি কোনো মানবীস্বরূপা, ঈশ্বরীর রক্তমাংসবিভূষিতা প্রতিস্ব? দেখে-শুনে মনে হয়, বড়ো জটিলকুটিল নাটকাভিনয় চলছে, ডামাডোল, ডামাডোল, মাত্র কোটি পাঁচেক টাকার সাবলীল আরতি, অথচ কী ভয়াবহ তার প্রক্রিয়া, অন্ধমত্ত দেবীপুজোই শুধু নয়, তারও গভীরে এক মানবীকে দেবীস্থানে প্রতিষ্ঠ ক'রে ক্রমায়াত হারে লাভের হিশেব কষা চলছে।

জনশ্রুতি, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, দশ কোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নাকি তাঁদের স্বতন্ত্র বিশ্বাসে প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে স্থিত থাকতে পারেন; ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা সংখ্যা-লঘু, তাঁরাও নাকি পারেন। এ-সমস্তই কিংবদন্তী। আসলে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে কারোরই হয়তো আর নিস্তার নেই, পৃথক চিন্তা বা বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে অব্যাহতি পাওয়ার আশা কম, দেবীপুজোয় সকলকেই ব্যাপৃত হ'তে হবে। জনে-জনে অভয় দেওয়া হচ্ছে, জলাতঙ্কের আশঙ্কা অমূলক, দেবীকে সবাই মিলে ভজনা করো, দেবী কামড়াবেন না। আর যদি মিথ্যে ভয় পাও, ঘাবড়ে গিয়ে দেবীর স্থান থেকে পালাতে শুরু করো, তা হ'লে, সুকুমার রায়ের ছড়ার সেই বয়ানের মতো, দেবী এবং তাঁর সন্তানসন্ততি সবাই মিলে ছুটে এসে সত্যি-সত্যি কামড়ে দেবেন।

কেউ নও

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শূন্যতার সব বোধ আমার সম্পর্কে থেকে গেছে
যেভাবে মানুষ থাকে দেয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে
কিছু দেখবে বলে নয়—এমনি, খেলার প্রতি প্রেমে
দেয়ালে দাঁড়ায় আর ছুটোছুটি করে, ভুল করে—
নিজের ছায়াকে ভাবে অন্যকেউ, অন্যবিধ কেউ
শূন্যতার সব বোধ আমার সম্পর্কে থেকে গেছে
এই থাকা, এই সর্বসমর্পণ, এই স্থায়ীভাব
দুঃখের মান প্রাণ স্পর্শ করে, গোলযোগ করে
পৃথিবীকে মনে হয় ভালোবাসা কষ্টসাধ্য নয়
প্রধান রাস্তায় ঘোরে মানুষের উজ্জ্বল মহিমা
কখনো দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো বা ঘাসে বসে চলে :
তোমার মুখশ্রী কেন এতোদিনে পুরানো হলো না !
তুমি কি মানুষ নও ? মানুষের অন্তর্গত নও ?
পূর্ণ ও শূন্যের যেন কেউ নও—এতো স্বাভাবিক ॥

চেয়ে দেখ তুমি

মানস রায়চৌধুরী

গত গ্রীষ্মে যেখানে নিদ্রিত ছিলে সেখানে আমার বাসা
নূতন, পার্থিব
পার্থিব কি বলা চলে? অথবা স্বর্গীয়?
পাতা ঝরে ঝরে হলো তোমার খোঁপার মত কৃত্রিম বিষাদ
তবু ওই কৃত্রিমতা ঘিরে নাচে আমার শোণিত
আগুনে চূড়ান্ত হয় মিলন দহন
নীল ঐ লতাগুল্মে যেন বা শিখায় কাঁপে উভয়ের আলিঙ্গন ছুঁয়ে।

বাসা ভেঙে চলে গেছো, তোমার চরণরেখা ছুঁয়ে
ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয় আমার উচ্চাশা
যেন মেঘ ধরা পড়ে জাহাজের পালে
শস্যক্ষেত্র শরীরের ভাঁজে
আমাদের অতীত আগামী সব ধরে থাকে মাননীয় সিঁথি
পরিমার্জনার ছলে চিরুনী দুভাগ ক'রে বালকের পথ
বৃদ্ধের নির্দন্ত হাসি সমুদ্রকে নিয়ে চলে মরুভূ-র দিকে
যেভাবে আকুল হয় দুই চোখ সেইভাবে সন্ধ্যা নামে
রক্তের ভিতরে।

গত গ্রীষ্মে যেখানে উদাসী ছিলে সেইখানে শুকনোপাতা
নির্মোহ শিকড় আর কান্ডের আসক্তি
আমার বসতি গড়ে, তৃষ্ণাতুর, চেয়ে দেখো তুমি।

উড়ন্ত কাঞ্চন ফুল

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথে পথে সোনালি ম্যারাপ—রাতারাতি
কখন ছড়িয়ে গেছে আতাপা দুপুর—টের পাও নি। নাগাল
পেরিয়ে ঐ তো উঁচু উঁচু ডাল—কাঞ্চন ফুলের তোড়া বাঁধা।
রাতারাতি আকাশের নিচে পেঁজা তুলোর মতন রাশি রাশি
উড়ন্ত কাঞ্চন ফুল—কখন ছড়িয়ে গেছে সারা শহরের ছাদে ছাদে...
একটা ফুলের জন্যে এত দূরে? দু-ধারি দালান
হাতড়ে ফিরছো সারাদিন
সমস্ত শহর ভরে তোমার ঠাহর। সারাদিন
শিথিল সহজ সুর ঝরে যায় জেটির পশ্চিমে।
বুক ভরে ওঠে ঢেউয়ে...ছদ্মবেশে নেমে আসে বিদেশী নাবিক—
পাটাতনে জ্বলে ওঠে নীলাভ কল্লোল—জলরোলে
মরালযূথের চুপসাঁতার...ও কি ও
কাঞ্চন ফুলের দোলা জলে জলে ভেসে যায়? তুমি তারও পিছু
নিতে গিয়ে টের পাও কালো তীক্ষ্ম নেপথ্যের ভাষা
দুলে ওঠে...
তুমিও তো নখে খুঁড়ে আনতে পারতে সিন্ধুনীল!
তুমিও তো গাজনের শিব-পার্বতীর সঙে লুকোতে পারতে! তবু, শুধু
চিনেবাদামের খোসা মাড়িয়ে হাঁটছো—লোভী হাতে
দু-ধারি দুপুর হাতড়ে নিতে যাও বিজুরি, কাঞ্চন

নগ্ননারী

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

অন্ধকার কুয়াশার বিপুল গ্রন্থির উন্মোচনে
বস্তুর আশ্রয়হীন ফুটে ওঠে দীর্ঘসূত্রী দ্যুতি,
শীতল বর্ণালী প্রভা, শূন্যমাত্রা কালের দর্পণে
এলানো মেঘের মতো একান্ত রূপের প্রতিশ্রুতি।

গোপন সুড়ঙ্গ বেয়ে অর্ধস্ফুট ছায়ার মিছিল
পরম্পর বের হয়, বিপরীতে উজ্জ্বল আভাস,
বিমূর্ত চৈতন্য থেকে আলো ও ছায়ার দ্বন্দ্ব-মিল
চতুর্দিকে খোঁজে বুঝি সুনিশ্চিত রেখার বিন্যাস।

লোহিতের হিমবাহ নীলকান্তি ধমনীর খাতে
জটিল প্রবাহে নামে, গ্রীবা বাহু কটি উরু ক্রমে
মৃদু স্পন্দে পরিস্ফুট, ইন্দ্রধনু কাঁপে নেত্রপাতে,
সংস্থানের রঙ্গমঞ্চে জ্বলে ওঠে দেহ প্রতিসমে।

উপত্যকা দীপ্ত করে যুগল পূর্ণিমা জাগে সদ্য,
কেশের মন্থনে ওঠে সমুদ্রের অতল বৈভব,
মায়াবী তোরণপ্রান্তে গভীর রাত্রির রক্তপদ্ম
উন্মীলিত পর্বে পর্বে, অধরে বৃষ্টির কলরব।

তন্মাত্র প্রেরণা আজ নগ্ননারী দেহে পরিন্যস্ত,
ধারাবাহী নিঃসরণে মূর্তি ধরে স্বচ্ছের দ্রাঘিমা,
দৃশ্যপট বাদ্যগীতি অঙ্গরাগ বাহুল্য সমস্ত,
নিজেরই প্রাচুর্য ঘিরে আবির্ভূত রহস্য-প্রতিমা।

অনাবৃত কিন্তু দেহে সৌন্দর্যই মহার্ঘ বসন,
তাতে আঁকা রোমাঞ্চিত প্রণয়ের নক্ষত্র-মণ্ডল,
সহজিয়া স্বরগ্রামে পাপের বিপুল আয়োজন,
মৃত্যুই জন্মের শর্ত, একই পাত্রে সুধা ও গরল॥

পয়ার, যতি, প্রবহমানতা

পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

পয়ারবন্ধ

সুমিত যতিস্থাপনই নিত্যকার আটপৌরে গদ্যভাষাকে পদ্যবন্ধ দান করে। কিন্তু পদ্যবন্ধ একটি অসম্পূর্ণ রচনা নয়। একটি পরিপূর্ণ ভাবগ্রন্থনই পদ্যবন্ধর মূল লক্ষ; এবং যেহেতু এটি পদ্যবন্ধ, গদ্যবন্ধ নয়, তাই সুমিত যতিপাতনের ফলে পরিপূর্ণ ভাবগ্রন্থিত পরিসরটি সুনির্দিষ্ট মাপের একাধিক অংশে ভেঙে যায়। এই নির্দিষ্ট আয়তনের বাক্যাংশ-মাপের আবর্তনজনিত যে-ধ্বনিদোলার সৃষ্টি হয়, তাই হলো ছন্দের মূল সম্বল। তাহলে ধ্বনিদোলা-জাত ছন্দসংক্রামিত ভাবগ্রন্থন বা সাদামাটা ভাষায় নির্দিষ্ট মাপের বা চালের বা আবর্তিত অংশের সমষ্টিই হ'লো পদ্যবন্ধ।

আবর্তিত অংশপরিচায়ক যতির মূল উদ্দেশ্য হ'লো পদ্যকৃতিতে একটি unit of attention (বা recognition) সৃষ্টি করা, এই মনোযোগ-আকর্ষক য়ুনিটকে বাংলায় বলতে পারি 'অভিজ্ঞাসূচক ব্যষ্টি'। আবর্তিত অংশের সমষ্টি, যা পরিপূর্ণ ভাবপরিসরের পরিচায়ক, তা হলো unit of sense (বা completion), এই ভাবপূর্ণতা-নির্ণায়ক য়ুনিটকে বাংলায় বলতে পারি 'গ্রন্থনসূচক ব্যষ্টি'। যতিকেও এইভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়: 'অভিজ্ঞাসূচক যতি', আর 'গ্রন্থনসূচক যতি'; বা যথাক্রমে শুধু **অভিজ্ঞাযতি** আর **গ্রন্থনযতি**।

উদাহরণ দিয়ে এই দুই প্রকৃতির যতিকে এবার বোঝা যাক:

[১] সমস্ত-আকাশ-ভরা { আলোর মহিমা
তৃণের শিশির-মাঝে { খোঁজে নিজ সীমা॥
("লেখন", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দুছত্রে সাজানো পদ্যবন্ধটি পূর্ণতা পেয়েছে '...সীমা'—এই অন্ত্যশব্দটির পর। দুই দাঁড়ি "॥" দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে গ্রন্থনসূচক যতিটি। প্রথম ছত্রান্তে '...মহিমা' শব্দের পর যে-যতি স্থাপন তা মূলত অভিজ্ঞাসূচক—স্বরবেষ্টিত (intervocalic) '-ম-'মণ্ডিত দ্বিদলিক (di-syllabic) ধ্বনিসাম্যের জন্য সমগ্র পদ্যবন্ধটিকে দুটি সমায়তনের ছত্রসমষ্টি বলে মনে হচ্ছে। আরেকটু লক্ষ করলে ধরা পড়বে—দুটি ছত্রই দ্বিখণ্ডিত হয়েছে আর-এক প্রকারের অভিজ্ঞাযতিস্থাপন করে। দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়ে এই দ্বিতীয় প্রকারের অভিজ্ঞাযতিটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, উদ্ধৃত পদ্যবন্ধটি 'আট-ছয়'-এর মাপে খণ্ডিত দুটি ছত্রে সম্পূর্ণ বহুপরিচিত পয়ারবন্ধ। অভিজ্ঞাসূচক ছত্রযতিটি পূর্ণযতি নামেও সুপরিচিত। কিন্তু আমার মনে হয়, 'পূর্ণ-' এই শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় ছত্রের ধারণায় ছন্দালোচনায় অনেক গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে।

মধ্যযুগীয় পয়ারবন্ধের একটি উদাহরণ নেওয়া যাক:

[২] কদাচিৎ কেহ যদি যায় গম্য আশে।
মন বন্দী তার অলকার ফাঁসে॥
(পদ্মিনীর কেশ, "পদ্মাবতী", সৈয়দ আলাওল)

এখানে একদাঁড়ি নেহাৎই ছন্দপরিচায়ক অভিজ্ঞাযতি, বাক্যপূর্তিসূচক পূর্ণচ্ছেদ নয়।

দুই দাঁড়িতে পয়ারবন্ধের পূর্ণতা বা গ্রন্থন সূচিত হচ্ছে। সে-যুগে ছেদচিহ্নের 'কমা', 'সেমি-কোলন' ইত্যাদির প্রচলন ছিলো না, নইলে একদাঁড়ির ক্ষেত্রে অন্তত উদ্ধৃত পয়ারবন্ধটিতে 'কমা'-চিহ্ন বা 'অল্পচ্ছেদ' চিহ্নও ব্যবহৃত হতে পারতো। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

[৩] হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
(অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, কাশীরাম দাস)

এখানে ভাষাবাক্য প্রথম ছত্রে সমাপ্ত হয়নি। আজকের দিনে রচিত হলে একদাঁড়ির জায়গায় কোনো ছেদচিহ্নই ব্যবহৃত হতো না। একদাঁড়ি প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যে প্রধানত অভিজ্ঞাসূচক ছন্দযতি। সেযুগে পদ্যবন্ধের অভ্যন্তরে বাক্যের ছত্রলঙ্ঘন কখনোই অপ্রতুল ছিলো না। এমনকি যাকে আমরা 'নাচনি ছন্দ' বা 'ত্রিপদী' বলি, তাতেও বাক্য যে ছত্রলঙ্ঘন করতো তার নিদর্শন মেলে। একটি অতিপরিচিত উদাহরণ নেওয়া যাক:

[৪] মরম না জানে ধরম বাখানে
এমনে আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাঁদের কথায়
বাহিরে রহুন তাঁরা॥
(চণ্ডীদাস)

স্বভাবতই প্রথম দাঁড়িটি বিরতিচিহ্নবিধির পূর্ণচ্ছেদ নয়। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর "কাব্যমঞ্জুষা" সংকলনে একদাঁড়ির বদলে অল্পচ্ছেদ বা কমা-চিহ্ন ব্যবহার করেছেন এই বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিতাটিতে।

ভাববাক্য যে প্রাগাধুনিক যুগে ছত্রসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতো না, তার যথেষ্ট নজির রয়েছে:

[৫] দ্রোণের বচন শুনি যতেক কোঙর
নিঃশব্দে রহিলা সবে না দিল উত্তর॥
(শিষ্যগৌরব, "মহাভারত", কাশীরাম দাস)

[৬] এত শুনি দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিয়া
ছাড় ছাড় বলি ধনু লইলা কাড়িয়া॥
(ঐ, কাশীরাম দাস)

[৭] হেন বেশ ভূষণ পরায় সখীগণ
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন॥
(সীতার বিবাহ, কৃত্তিবাস ওঝা)

[৮] পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়
চলেন ভরত তবে রামের আজ্ঞায়॥
(ভরতমিলন, কৃত্তিবাস ওঝা)

[৯] আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করে জগজনে
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
(ফুল্লরার বারমাসী, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

উপরের পয়ারবন্ধগুলিতে প্রথম ছত্রান্তে বিরতিচিহ্নবিধির ছেদচিহ্ন যে অপ্রয়োজনীয়, তা বলাই বাহুল্য। উক্তিমূলক বাক্য—প্রত্যক্ষোক্তি বা পরোক্ষোক্তি—হিসেবের মধ্যে ধরলে ভাব

যে ছত্রসীমায় সম্পূর্ণ হতো না, তার প্রচুর প্রমাণ মধ্যযুগের কাব্যে মেলে। একটি পয়ারবন্ধে উক্তিমূলক ভাবগ্রন্থনের উদাহরণ দেওয়া যাক:

[১০] যোড় হাতে ভরত বলেন সবিনয়,
"কেমনে রাখিব রাজ্য মম সাধ্য নয়॥"
(ভরতমিলন, কৃত্তিবাস ওঝা)

দুটি যুগ্মকে সম্পূর্ণ উক্তিমূলক ভাবগ্রন্থনের একটি নিদর্শন নিচে দেওয়া গেলো:

[১১] লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমনি,
"কেন ভাই আসিতেছ তুমি হে একাকী
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥"
(সীতাহরণে রামের বিলাপ, কৃত্তিবাস ওঝা)

প্রাগাধুনিক যুগের যে-কোনো পাঁচালিকাব্যে এই রকম পয়ারবন্ধের প্রমাণ মিলবে। উক্তিমূলক ভাবগ্রন্থনের কথা ছেড়ে দিলে, এমনকি সাধারণ ভাববাক্য যুগ্মকসীমা যে অনায়াসেই অতিক্রম করতো, তারও নজির পাই:

[১২] বিধিবিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে॥
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥

প্রথম তিনছত্রে সম্পূর্ণ ভাবগ্রন্থন, আবার শেষের দুটি মিলে অপর একটি ভাবগ্রন্থন। চতুর্থ ছত্রটি কেবল ছত্র ও বাক্য, দুই-ই।

[১৩] চিরুনীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ
কপালে তিলক আর নির্মল সিন্দুর
বালসূর্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর॥
(সীতার বিবাহ, কৃত্তিবাস ওঝা)

প্রথম তিনছত্র যে একই বাক্যের অন্তর্গত তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না; চতুর্থ ছত্রটিকে প্রথম তিনছত্রের অনুবৃত্তি মনে করলে—চারছত্রপরিসরে গ্রন্থিত ভাবপূর্তিকে প্রবহমানভূমক বলা ছাড়া উপায় থাকে না। [১০]-এর উদাহরণে প্রত্যক্ষোক্তি-অংশ দ্বিতীয় ছত্রে বিস্তৃত, আর উক্তির কর্তাংশ বিস্তৃত প্রথম ছত্রে। [১১]-এর উদাহরণে উক্তিমূলক গ্রন্থনের কর্তাংশ প্রথম যুগ্মকজুড়ে বিস্তৃত, আর প্রত্যক্ষোক্তি-অংশ বিস্তৃত রয়েছে দ্বিতীয় যুগ্মকজুড়ে। প্রত্যক্ষোক্তি-অংশকে যদি স্বতন্ত্র বাক্যের মর্যাদা দিই, তাও যে যুগ্মকসীমা অতিক্রম করতো সাধারণ বর্ণনামূলক বাক্যের মতোই (যেমন [১২] এবং [১৩]-র উদাহরণে দেখলাম), তারও নজির পাই:

[১৪] কনকের মৎস্য তার মানিক নয়ন
সেই মৎস্যচক্ষু ছেদিবেক যেই জন
সেই হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।

এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥

(অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, কাশীরাম দাস)

প্রত্যক্ষোক্তি-বাক্যটি এখানে প্রথম যুগ্মকসীমা অতিক্রম করে দ্বিতীয় যুগ্মকের প্রথম ছত্রান্তে গিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। আজকালকার রচনায় 'আমার ভগিনীর'—এই অংশের পর অনেক লেখকই পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করবেন; অর্থাৎ উদ্ধৃত কবিতাংশে চতুর্থ ছত্রটিকেও একটিমাত্র ভাববাক্যের অন্তর্ভুক্ত করে হয়তো দেখানো চলে। শেষের ছত্রটির এই রকম অন্তর্ভুক্তি তর্কসাপেক্ষ হতে পারে। কিন্তু ভাষাবিচারে, উদ্ধৃত কবিতাংশে বাক্য যে প্রথম দুটি ছত্র লঙ্ঘন করে তৃতীয় ছত্রসীমায় পৌঁচেছে—এর বিরুদ্ধে আশা করি কেউ তর্ক তুলবেন না। কাজেই উপরের [২] থেকে [১৪] পর্যন্ত এই তেরোটি নিদর্শন থেকে এই প্রমাণ পাওয়া গেল যে মধ্যকালীন বাংলা কাব্যবন্ধে পংক্তিলঙ্ঘক বা ছত্রলঙ্ঘক ছন্দের চল নিঃসন্দেহে ছিলো।

তাহলে পয়ারে প্রবহমানতা বলে যে আধুনিক যুগের ছন্দবৈশিষ্ট্যটির কথা বলা হয়, যার জনক নিঃসন্দেহে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তার প্রকৃতিটি কী?

প্রাগাধুনিক যুগের কাব্যবন্ধে, বিশেষ করে পয়ারে, ছত্রাতিশায়ী বাক্য-ব্যবহার যেমন রয়েছে, তার সীমাবদ্ধতার দিকটিও ভালো করে বুঝতে হবে। **প্রথমত**, দুই ছত্র বা অভিজ্ঞা-সূচক ব্যষ্টির সমাবেশে রচিত পদ্যবন্ধটি যে একটি পরিপূর্ণ ভাবগ্রন্থনসূচক ব্যষ্টি সে-সম্পর্কে কবিরা অবহিত ছিলেন নিশ্চয়ই; কিন্তু মিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের প্রায় নির্ভুল প্রয়োগে মূলত অভিজ্ঞাসূচক ছত্রটি এতই প্রাধান্য পেয়েছিলো যে চোদ্দ-মাত্রার আয়তনে কবিরা সহজেই সম্পূর্ণ বাক্য রচনা করে ছত্রকে ছন্দের মূল য়ুনিটে বা ব্যষ্টিতে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে চোদ্দ-মাত্রার আয়তনটি নেহাৎ হ্রস্ব নয়। সুকুমার সেন মহাশয় দেখিয়েছেন যে অন্ত্যমধ্যকালে দ্বিদলতা বা দ্ব্যক্ষরতার (bisyllabism) ফলে পয়ার-ছত্রে ধ্বনিপরিমানবহনক্ষমতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। বর্ণনামূলক বক্তব্য প্রয়োজনে চোদ্দ-মাত্রার সীমা একদিকে যেমন বাক্যকাঠামোকে সংহতি দান করেছিলো, অন্যদিকে তেমনিই—সীমাটি নেহাৎ হ্রস্ব নয় বলে—তা বাক্যস্ফূর্তিতেও সাহায্য করেছিলো। **দ্বিতীয়ত**, মূলত অভিজ্ঞাসূচক ছত্রব্যষ্টিকে কবিরা যেমন অতি সহজেই বাক্যে রূপান্তরিত করেছিলেন, তেমনি অপর অভিজ্ঞাসূচক ব্যষ্টি, যেটি পদ নামে বিশেষভাবে পরিচিত, সেটিকে কবিরা চিরকাল অবহেলিত রেখেছিলেন একান্ত যান্ত্রিকতাযুক্ত মনোযোগ-আকর্ষক ব্যষ্টি হিসেবে। ছত্রলঙ্ঘক বাক্য কখনও পদান্ত্যে সমাপ্ত হতে পারেনি। একটি ছত্র লঙ্ঘিত হলে বাক্যকে পরবর্তী ছত্রান্ত্যে সমাপ্ত হতে হতো, সেটিও যদি লঙ্ঘিত হতো—তাহলে কবি ধরে নিতেন বাক্যকে আরও চোদ্দ-মাত্রায় পরিবর্ধিত করতে হবে, অর্থাৎ সেটিকেও পরবর্তী ছত্রসীমা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে ভাবগ্রন্থনের পরিপূর্ণতার তাগিদে। ছত্রব্যষ্টিটি কবিদের কাছে একটি অনতি-ক্রমণীয় আবেশ বা obsession-এর মতো দৃঢ়নিবদ্ধ ছিলো। ভাববাক্য যে পদান্ত্যেও সমাপ্ত হতে পারে, সেদিকে কবিদের দৃষ্টিই যায়নি। ভাবগ্রন্থন মূলত ছত্রব্যষ্টির গুণিতক মাত্রই রয়ে গেল। দুই ছত্রে সমাপ্ত পয়ারবন্ধই যে একরকম সাধারণ নীতি ছিলো, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি যে গ্রন্থনযতি পয়ারবন্ধাতিশায়ী হতে কোথাও বাধা ছিলো না। মনে হয়, কবিগণ এ বিষয়ে একটু সন্ত্রস্তও থাকতেন। যেখানে গ্রন্থনযতিকে ছত্রাতিশায়ী এবং বন্ধাতিশায়ী করা সহজসাধ্য ছিলো, সেখানে তাঁরা ছত্রসীমায় এবং পয়ারবন্ধসীমায় গ্রন্থন-ব্যষ্টিকে সংযত করে রাখতেন। উদাহরণ দিই :

[১৫] করিলেন সীতা এই পৃথিবীর স্তুতি।
সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী॥
সীতা লৈতে পৃথিবী হইল আগুসার।
সপ্ত পাতাল হইতে হৈল এক দ্বার॥
(সীতার পাতালপ্রবেশ, কৃত্তিবাস ওঝা)

এখানে দ্বিতীয় ছত্রস্থ 'শুনে' ক্রিয়াপদের কর্ম যে সমগ্র প্রথম ছত্রটি, তা পাঠকদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না—যদিও দুটি ছত্রকেই কবি স্বাধীন বাক্যরূপে উপস্থাপিত করেছেন। তৃতীয় ছত্রটি কার্যকারণসূত্রে যে পরবর্তী ছত্রের সঙ্গে অন্বিত তা কিন্তু সহজেই দেখানো যেতো তৃতীয় ছত্রস্থ 'হইল'-র 'হইলে'-তে রূপান্তর করে। এ-ছাড়া এই উদাহরণে পুনরুক্ত শব্দগুলি একটু অতিরিক্ত মনে হয়—যেমন, প্রথম তিন ছত্রেই 'পৃথিবী' বা তার প্রতিশব্দ 'বসুমতী'-র ব্যবহার; বিশেষ করে তৃতীয় ছত্রে 'পৃথিবী' শব্দটি অনাবশ্যক বলবো, ঐ স্থানে ক্রিয়া-প্রসারক কোনো বিশেষণপদ ছত্রটিকে আরও সংহতি দিতে পারতো; একই বন্ধে (দ্বিতীয় যুগ্মকে) 'হইল' 'হইতে' 'হৈল' শব্দগুলির ব্যবহার। এগুলির বর্জন সম্ভব হতো যদি কবি ছত্রগুলিকে স্বাধীন বাক্যরূপে সাজাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হতেন।

[১৬] নানাবিধ বসনভূষণ পরিধান
মূর্তিমতী পৃথিবী হইল বিদ্যমান॥
কন্যা বলি পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিল সিংহাসনে॥
(সীতার পাতালপ্রবেশ, কৃত্তিবাস ওঝা)

এখানে প্রথম ছত্রটি যে দ্বিতীয় ছত্রস্থ কর্তাপদ 'পৃথিবী'-র বিশেষ 'মূর্তিমতী'র প্রসারণ সূচনা করছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু পূর্ণতাবাচক 'হইল' ক্রিয়াপদটিকে সহজেই 'হইয়ে'-তে রূপান্তরিত করলে যে তৃতীয় ছত্রটিকে প্রথম যুগ্মকটির সঙ্গে যুক্ত করে একটি দীর্ঘ বাক্য সৃজন সম্ভব হতো, সেদিকে কবি দৃষ্টি দেননি। দ্বিতীয় যুগ্মকটিকেও একটি বাক্যে পরিণত করা যেতো তৃতীয় ছত্রস্থ 'ডাকে'-শব্দটির 'ডাকি'-তে রূপান্তরণ করে। এবং শেষের তিনটি ছত্রের মধ্যে কর্তাপদ 'পৃথিবী'র দু'বার ব্যবহার এবং কর্মপদ 'সীতারে'-রও দু'বার ব্যবহার কিছুটা দুর্বলতার লক্ষণ বলতে হবে। কিন্তু এই সমালোচনা অনর্থক মনে হবে যদি আমরা কবির মূল উদ্দেশ্য ভালো করে বুঝি। মনে হয়, (১) 'পাঁচালি' বর্ণনামূলক কাব্য হলেও একাব্য প্রধানত গেয় বলে প্রতিটি ছত্র যাতে সাধারণভাবেও একটা ভাবপূর্তির ধারণা দেয়, সেদিকে কবিকে সজাগ থাকতে হতো; আর (২) একাব্যের পাঠক বা শ্রোতা ছিলো মুখ্যত জনসাধারণ, কাজেই কবি দুর্লভ কবিত্বগুণের অধিকারী হয়েও পুনরুক্তি এবং দুর্বল শব্দপ্রয়োগে স্পর্শকাতরতা বোধ করতেন না।

ছত্রলঙ্ঘক বাক্যব্যবহার প্রবহমানতার পরিচায়ক নিশ্চয়ই। এবং মধ্যযুগে দুই ছত্রবিশিষ্ট বা চারপর্বিবিশিষ্ট পয়ারবন্ধেই (বা যুগ্মকে) যে সাধারণভাবে ভাবপূর্তি ঘটতো তার নজিরও রয়েছে যথেষ্ট। নিচের ছত্রগুলিকে দেখা যাক:

[১৭] শ্রীরাম বলেন, সীতা, শুন এ বচন,
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্বজন॥
প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার,
দেবগণ জানে তাহা, না জানে সংসার॥

পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে,
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে॥
(সীতার পাতালপ্রবেশ, কৃত্তিবাস ওঝা)

এখানে তিনটি যুগ্মক-পরম্পরায় একটি ভাবই ব্যক্ত হয়েছে, যদিও ভাষাবিচারের দিক দিয়ে প্রতিটি যুগ্মকই এককেটি ভাবাবাক্য। প্রথম ছত্রের আদ্য ছ'মাত্রিক অংশ 'শ্রীরাম বলেন'—কে যদি স্বতন্ত্র বাক্যের সম্মান দেওয়া যায়, তাহলে অবশ্য বলতে হয় যে ছত্রের মধ্যেও বিরতিবিধির অচিহ্নিত প্রয়োগ অভাবিত ছিলো না সেযুগে॥

অমিত্রাক্ষর

উনিশ শতকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণের রচনায় অন্ত্যানুপ্রাস, যমক, বিভিন্ন শব্দালংকার, দেশীবিদেশী শব্দের চমকপ্রদ প্রয়োগ ইত্যাদির ইন্দ্রজালে প্রাগাধুনিককালীন পয়ারবন্ধের ছত্রলঙ্ঘনধর্মটি একেবারে অবজ্ঞাত থেকে গিয়েছিলো মনে হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পয়ারবন্ধে যে প্রবহমানতা সৃষ্টি করলেন, তার প্রাচলিক সংস্কার যে পূর্বে ছিলো এ-কথা তখন ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। মধুসূদনসৃষ্ট পদ্যবন্ধের অমিত্রাক্ষরতা বা অন্ত্যানুপ্রাসহীনতার দিকটাই সেযুগে বেশির ভাগ কবির নজর কুড়িয়েছিলো বললে বোধহয় খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য, তাঁর উদ্ভাবিত প্রবহমানতা এবং পূর্বযুগের প্রবহমানতা এক বস্তু নয়। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-ভূমক প্রবহমানতা শুধু ছত্রলঙ্ঘক নয়, ছত্রখণ্ডকও বটে। এই নতুন প্রকৃতির প্রবহমানতার দিকটা ঐ যুগে তেমন অনুসৃত হতে দেখি না। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যগুলিতে দেখবো মধ্যযুগের মতো গ্রন্থনব্যাষ্টি মূলত বহুছত্রভিত্তিক ছিলো। এ'দের রচনায় ছত্রের মধ্যস্থলে ভাবগ্রন্থনসমাপ্তি খুব অল্প ক্ষেত্রেই ঘটেছে। মধুসূদন-সৃষ্ট প্রবহমানতার মূল ভিত্তি হলো : (১) ভাবগ্রন্থনব্যাষ্টির পরিসর একটি নির্দিষ্ট মাত্রা-মাপাধীন আবর্তিত অংশের সমষ্টি নয়, (২) ভাবগ্রন্থনের পরিসরও সুপরিমিত নয়। অর্থাৎ পূর্বের পয়ারবন্ধ ছিলো ভাবপূর্তিপরিচায়ক একটি নির্দিষ্ট আয়তনপরিসীমাবন্ধ ব্যাষ্টি, এবং এই পরিসীমায়তবন্ধটি সুমিত যতিপাতনদ্বারা একাধিক নির্দিষ্ট মাত্রামাপে বিভক্ত হওয়ার দরুন একটি বিশিষ্ট চালের বা আবর্তের ধ্বনিতরঙ্গদোলায় সুমণ্ডিত ছিলো। কিন্তু মধুসূদন-সৃষ্ট প্রবহমান পয়ারবন্ধ ভাবপূর্তিপরিচায়ক একটি অনির্দিষ্ট আয়তনপরিসীমা-বন্ধ ব্যাষ্টি, এবং এই পরিসীমায়তবন্ধটি কোনো সুমিত যতিপাতনদ্বারা একাধিক নির্দিষ্ট মাত্রামাপে বিভক্ত নয়, অর্থাৎ এই বন্ধে একটি বিশিষ্ট চালের বা আবর্তের ধ্বনিতরঙ্গদোলা স্পন্দিত হতে দেখি না। এই নতুন পয়ারবন্ধে ভাবগ্রন্থনপরিসরও যেমন অনিয়মিত, তেমনি এর অভিজ্ঞাব্যাষ্টিগুলিও বিভিন্ন মাপের। তাহলে এই পয়ারবন্ধে কি ছন্দের মূল প্রকৃতিই অস্বীকৃত হলো? অভিজ্ঞাব্যাষ্টিগুলি বিভিন্ন মাপের মানে অরাজকতা স্থাপন নয়। দুই থেকে আট মাত্রার নানা মাপের অভিজ্ঞাব্যাষ্টির নানা পরম্পরায় আবর্তন ঘটিয়েও যে ছন্দবোধ জাগ্রত রাখা যায়, এই পরীক্ষাই ছিলো মধুসূদনের মূল উদ্দেশ্য। এবং এই পরীক্ষায় যে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

তাহলে এই প্রবন্ধের প্রথমেই যে উল্লিখিত হয়েছে সুমিত যতিপাতনজনিত নির্দিষ্ট মাপের আবর্তিত অংশের সমষ্টিই ছন্দবাক্য, সেটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবো?

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর কাব্যের গড়নের দিকে দৃষ্টিপাত করলে ধরা পড়বে যে তাঁর কাব্যের অধিকাংশ গ্রন্থনব্যাষ্টিই দীর্ঘায়ত—এবং সেগুলি প্রায়শই 'আট-ছয়'-মাত্রামাপের সমষ্টি,

স্থানে স্থানে 'চার'-বা 'তিন'-মাত্রামাপের পর্ব গ্রন্থনব্যাষ্টির আদ্যংশে বা অন্তাংশে স্থাপিত হয়েছে। আসলে গ্রন্থনব্যাষ্টির পরিসর এ'র কাব্যে কখনোই নির্দিষ্ট আয়তনের নয়। নানা আয়তনের অভিজ্ঞাব্যাষ্টির ব্যবহার থাকলেও, একটি নতুন অভিজ্ঞাব্যাষ্টি সৃষ্টিও মধুসূদনের অমর কীর্তি—এটি চোদ্দ-মাত্রায়ত 'ছত্র'-নামাঙ্কিত মুখ্যত মনন-ভূমক সংযমনাত্মক অভিজ্ঞা-ব্যাষ্টি। অমিত্রাক্ষরের অধিকাংশ দীর্ঘায়ত গ্রন্থনপরিসরকে চোদ্দমাত্রার ব্যাষ্টিতে ভাগ করা চলে —ঠিক যে-অর্থে পুরনো পয়ারছত্রকে আট-ছয়-এ ভাগ করা যেতো, বা দীর্ঘ ত্রিপদীকে আট-আট-দশ-এ ভাগ করা যেতো। যেহেতু চোদ্দমাত্রার এই অভিজ্ঞাব্যাষ্টি-শেষে ধ্বনিসাম্য ব্যবহৃত হয়নি, সেজন্যেই এটি যে একটি মনোযোগাকর্ষক কিন্তু বিশিষ্ট গড়নের ব্যাষ্টি—সেদিকে অনেকেরই দৃষ্টি যায়নি। এই চোদ্দমাত্রার ব্যাষ্টি—যেটি অমিত্রাক্ষর ছত্র নামে বিশেষভাবে পরিচিত—এটির আবর্তন কিন্তু সুমিত যতিস্থাপনেরই ফল, এবং এই ছত্রযতিপাতনজনিত সুনির্দিষ্ট মাত্রামাপের অন্ত্যানুপ্রাসহীন ভাগটিই মধুসূদনসৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য-পরিচায়ক—এই ভাগটি বা অভিজ্ঞাব্যাষ্টিটির নিখুঁত গড়নের দিকেই কবির মূল লক্ষ ছিলো।

এই কীর্তিটিকে অন্যভাবেও উপস্থাপিত করা যায়। পাঁচালিকাব্যের অনেকস্থলে ছত্র-লঙ্ঘনধর্ম যেমন দুর্লক্ষ ছিলো না, তেমনি তার সীমাবন্ধতাও ছিলো অতিপ্রকট—উদাহরণ-যোগে এদুটি বস্তুই পূর্বে দেখানো হয়েছে। মধুসূদনপ্রবর্তিত ছন্দে অমিত্রাক্ষরছত্রই হলো মূল অভিজ্ঞাব্যাষ্টি, কিন্তু গ্রন্থনব্যাষ্টিটি শুধু এই রকম অমিত্রাক্ষরছত্রের সমাবেশ দিয়ে নয়, ছত্রখণ্ডন ঘটিয়েও গ্রন্থনপরিসরকে কোথাও বাড়ালেন, কোথাও কমালেন। চার রকম গ্রন্থন-পরিসর এই ছন্দে পাই : (১) এক বা একাধিক মূলত অভিজ্ঞাসূচক ছত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে; (২) এইরূপ সমাবেশের আগে বা পরে বা দুইস্থলেই যুগপৎ খণ্ডীকৃত ছত্রস্থাপনা করে; (৩) ছত্রখণ্ডনজনিত এক বা একাধিক পর্বসমাবেশে; এবং (৪) এই জাতের সমাবেশে ছত্র-লঙ্ঘন ঘটিয়ে, অর্থাৎ দুটি খণ্ডীকৃত ছত্রাংশের সমাবেশ সৃষ্টি করে। প্রথমটি ছত্রলঙ্ঘন বা ছত্রসীমা মানার ফল, দ্বিতীয়টি ছত্রলঙ্ঘন ও ছত্রখণ্ডনের ফল,—এই দুটিই দীর্ঘায়ত গ্রন্থন-পরিসর। তৃতীয়টি শুধু ছত্রখণ্ডন অর্থাৎ ছত্রসীমা-না-মানার ফল; আর চতুর্থটি খণ্ডন ও লঙ্ঘন—দুইএরই ফল, কিন্তু এখানে লঙ্ঘন মাত্র একবারই ঘটে। শেষের গ্রন্থনপরিসর দুটি হ্রস্বায়ত।

তাহ'লে দেখছি, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে বর্ধিত ও অনির্দিষ্ট পরিসরের গ্রন্থন-ব্যাষ্টিসৃজন যেমন জটিল সুদীর্ঘ বাক্যস্ফূর্তির সম্ভাবনা জুগিয়েছে, তেমনি গ্রন্থনপরিসীমা না-মানার দরুন হ্রস্বায়ত গ্রন্থনগুলি বাক্যসংহতিরও সুযোগ দিয়েছে। এই দুটি গুণই এক প্রকারের স্থিতিস্থাপকতা এনেছে গ্রন্থনকাঠামোতে। আবার অন্যদিকে, দুই জাতের অভিজ্ঞা-ব্যাষ্টি—একটি পর্বের, অন্যটি ছত্রের—এই স্থিতিস্থাপকতা-মণ্ডিত অনির্দিষ্ট গ্রন্থনপরিসীমা-বন্ধকে দুই জাতের বৈশিষ্ট্য দান করেছে। পর্বায়তনের অভিজ্ঞাব্যাষ্টির নানা আয়তন বলে এই পর্বান্তিক যতিটিকে সুমিত অভিজ্ঞাযতি নয়, বরং বিচিত্রমিত অভিজ্ঞাযতি বলবো, কিন্তু ছত্রায়তনের অভিজ্ঞাব্যাষ্টি একটি নির্দিষ্ট মাত্রামাপের বলে ছত্রান্তিক এই যতিটিকে সুমিত অভিজ্ঞাযতি বলবো। উদ্ধৃতিযোগে বক্তব্যটিকে পরিষ্কার করা যাক :

[১৮] রণমদে{মত্ত সাজে{রক্ষঃ-কুলপতি ;—॥
হেমকূট-{হেমশৃঙ্গ-{সমোজ্জ্বল {তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল!॥ বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ;॥ রক্ষোধ্বজ{উড়িছে আকাশে,

অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ{নাদিছে হুঙ্কারে।॥
হেনকালে{সভাতলে{উত্তরিলা {রাণী
মন্দোদরী,{শিশুশূন্য{নীড় হেরি {যথা
আকুলা কপোতী হায়!॥ ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল।॥ রাজপদে{পড়িলা মহিষী।॥

(সপ্তম সর্গ, "মেঘনাদবধকাব্য")

সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদদুটিকে গ্রন্থনসূচক যতি বলে ধরে নিলে উদ্ধৃত নয়-ছত্রে মোট সাতটি গ্রন্থনব্যাষ্টি পাই। প্রথম গ্রন্থনযতিটি ছত্রান্তে পড়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থনযতিটি একটি পুরো ছত্রসীমা লঙ্ঘন করে তৃতীয় ছত্রটি খণ্ডন করে একটি দীর্ঘ পর্বান্তে স্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থনব্যাষ্টিটি তৃতীয় ছত্রসীমা লঙ্ঘন করে চতুর্থ ছত্রটির খণ্ডন ঘটিয়ে দুটি খণ্ডিত ছত্র-সমাবেশে গঠিত। চতুর্থ গ্রন্থনযতিটি চতুর্থ ছত্রসীমা লঙ্ঘন করে পঞ্চম ছত্রান্তে স্থাপিত হয়েছে—সমগ্র গ্রন্থনপরিসরে চারটি পর্ব, প্রথম দুটি ছত্রখণ্ডনের ফল, শেষের দুটি ছত্রশায়ী। পঞ্চম গ্রন্থনব্যাষ্টিটি ষষ্ঠ ও সপ্তম ছত্রদুটির সীমা লঙ্ঘন করে অষ্টম ছত্রটি খণ্ডিত করে দীর্ঘায়ত পরিসর লাভ করেছে; নয়টি পর্বসমাবেশে গঠিত এই গ্রন্থনব্যাষ্টিটিই উদ্ধৃত রচনায় দীর্ঘতম। ষষ্ঠ গ্রন্থনব্যাষ্টিটি তৃতীয় গ্রন্থনব্যাষ্টির মতো ছত্রসীমা লঙ্ঘন ও খণ্ডনের ফল। সপ্তম বা শেষ গ্রন্থনপরিসরটি ছত্রখণ্ডনজাত, এখানে গ্রন্থনযতিটি নবম ছত্রান্তে স্থাপিত হয়েছে। পূর্বে মধুসূদনের চারজাতের গ্রন্থনপরিসর সৃজনের যে-বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলে-ছিলাম—সেগুলি উদ্ধৃতাংশে লক্ষ করা গেল।

যতিভেদ

ছন্দযতির দুটি প্রকৃতি লক্ষ করলাম : একটি অভিজ্ঞাযতি, অর্থাৎ মনোযোগ-আকর্ষণ-কারী যতি; অপরটি গ্রন্থনযতি, অর্থাৎ একাধিক অভিজ্ঞাযতির আত্মসাৎজাত ভাবপূর্তি-পরিচায়ক যতি। অভিজ্ঞাযতির আবর্তনই গ্রন্থনপরিসরে ধ্বনিদোলাজনিত একটি বিশেষ সৌন্দর্য প্রদান করে। কিন্তু অমিত্রাক্ষরছন্দে দেখলাম, আবর্তিত অভিজ্ঞাব্যাষ্টিগুলি দুই, চার, ছয় ও আট মাত্রামাপের। এই ছন্দে তিন ও পাঁচ মাত্রামাপের অভিজ্ঞাব্যাষ্টিও প্রচুর পাওয়া যায়, যদিও উদ্ধৃত অংশে এই দুই মাপের পর্ব ব্যবহৃত হয়নি। তাহলে প্রবহমান পয়ারের গ্রন্থন-ব্যাষ্টির গঠনপ্রক্রিয়াটিকে এই ভাবেই বিবৃত করা চলে—দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় ও আট মাত্রামাপের পর্বআবর্তনজাত বিচিত্রমিত যতিপাতনই গ্রন্থনপরিসরকে এক বিশেষ ধরনের ধ্বনিদোলায় সংক্রামিত করে।

অভিজ্ঞাব্যাষ্টির আরেকটি রূপভেদও চোখে পড়েছে, এটি ছত্রব্যাষ্টি। কিন্তু এর স্বরূপটি খুঁটিয়ে দেখলে নিশ্চয়ই চোখে পড়বে যে ছত্রব্যাষ্টিটি পর্বব্যাষ্টির মতো মৌলিক নয় —অর্থাৎ পর্বব্যাষ্টিকে আর কোনো অভিজ্ঞাব্যাষ্টি দিয়ে ভাঙা যায় না, বা ভাঙবার দরকার হয় না অন্তত ছন্দসৌন্দর্য বুঝতে। দীর্ঘ পর্ব—যেমন আটমাত্রার পর্বকে তিন-তিন-দুই-এ যে ভাগ করা হয়, তা মূলত শব্দভিত্তিক ভাগ। কিন্তু ছত্রব্যাষ্টিটি এমনই এক ব্যাষ্টি যে একে একাধিক অভিজ্ঞাব্যাষ্টিতে ভাগ করতে হবেই, এবং প্রবহমান ছন্দের ছত্রব্যাষ্টিকে শুধু অভিজ্ঞা-সূচক পর্বযতি দিয়ে নয়, গ্রন্থনসূচক পূর্তিযতি দিয়েও ভাগ করা হয়। [১৮]-সংখ্যক উদাহরণে তৃতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ও নবম ছত্রগুলির মধ্যস্থলে অন্তত একটি করে পূর্তিযতি আছে; নবম ছত্রে পূর্তিযতি আছে দুটি—প্রথমটি পড়েছে চারমাত্রার পর্বান্তে, অর্থাৎ ছত্রের

মধ্যস্থলে, তারপর চার-ও-ছয়-মাত্রার দুটি পর্বশেষে বা সম্পূর্ণ ছত্রান্তে পড়েছে দ্বিতীয়টি। প্রথম ও পঞ্চম ছত্রান্তে পূর্তিযতি স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু প্রথম ছত্রে—চারমাত্রার পর্বান্তে, অপর একটি চারমাত্রার পর্বান্তেও অভিজ্ঞাযতি পড়েছে ; পঞ্চম ছত্রের মধ্যে আট-মাত্রার পর্বান্তে অভিজ্ঞাযতি পড়েছে। একমাত্র দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম ছত্রে চারটি করে পর্বযতি বা অভিজ্ঞাযতি পাই। এখানে তাহ'লে তিনজাতের ছত্র—যতিপাতনপ্রকৃতির দিকে লক্ষ করলে—পাচ্ছি : (১) পূর্তিযতিপ্রান্তিক ছত্র, যেমন প্রথম ও পঞ্চম ছত্র ; (২) অভিজ্ঞাযতিপ্রান্তিক ছত্র, যেমন দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম ছত্র ; এবং (৩) পূর্তিযতিখণ্ডিত বা/এবং পূর্তিযতিপ্রান্তিক ছত্র, যেমন তৃতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ছত্র (পূর্তিযতিখণ্ডিত)—এগুলি অভিজ্ঞাযতিপ্রান্তিক, নবম ছত্রটি পূর্তিযতিখণ্ডিতও বটে, পূর্তিযতিপ্রান্তিকও বটে।

তাহলে যে-অর্থে পর্বকে অভিজ্ঞাব্যষ্টি বলা যায়, সে-অর্থে ছত্রকে ঠিক অভিজ্ঞাব্যষ্টি বলা সঙ্গত হবে না। গ্রন্থনব্যষ্টি একাধিক মৌলিক অভিজ্ঞাব্যষ্টির যে সমষ্টি সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ছত্রব্যষ্টিটি যে এক জাতের অভিজ্ঞাসূচক বা মনোযোগ-আকর্ষণকারী ব্যষ্টি যে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। দীর্ঘ-ত্রিপদীর আট-মাত্রার কোনো পদকে যেমন চার-চার মাত্রামাপের দুটি পর্বের সমাবেশ বলা যায়, অমিত্রাক্ষরছত্রের ব্যষ্টিটি সে-রকম সমাবেশের ফলে গঠিত নয়। উপরের অনুচ্ছেদে দেখলাম, ছত্রব্যষ্টি তিন ভাবে গঠিত হতে পারে। কাজেই পর্বকে যদি মৌলিক অভিজ্ঞাব্যষ্টি বলা হয়, তাহলে ছত্রকে বলতে হয় অমৌলিক বা যৌগিক অভিজ্ঞাব্যষ্টি। কিন্তু এ-নামেও ছত্রব্যষ্টির স্বরূপ বোঝা যায় না। কেননা ছত্রভাগের একটি বৃহত্তর ভূমিকা যে রয়েছে সমগ্র অমিত্রাক্ষর-কাব্যরচনায়—সেটিকে ভালো করে বুঝলে বলতে হয়, চোদ্দমাত্রার আয়তনে গঠিত ছত্রটি একমাত্র ব্যষ্টি, যার নিখুঁত আবর্তনে এক বিশেষ চালের বা মাপের ধ্বনিদোলায় সমগ্র কাব্যটি সংক্রামিত হয়েছে—কাজেই এটি মুখ্যত মননভূমক সংযমনাত্মক অভিজ্ঞাব্যষ্টি—এই ব্যষ্টিটি একদিকে মৌলিক অভিজ্ঞাসূচক পর্বসমাবেশে, অপরদিকে ছন্দবন্ধের পূর্তিসূচক গ্রন্থনযতির স্পর্শে একটি দ্বিতয়িক গুণ লাভ করেছে—এটির উপস্থিতি ও ভূমিকা একমাত্র মননের দ্বারাই সম্ভব, শুধু ধ্বনিজাদুজালের উপলব্ধিদ্বারা নয়—কেননা গ্রন্থন এই ধ্বনিজাদুজালকে ছিন্ন করে ফেলছে। এক কথায়, প্রবহমানতাসংক্রামিত ছত্রের স্বরূপ হলো **সংযমনাত্মক** : ছত্রব্যষ্টিটি একদিকে ধ্বনিজাদুজালভূমক অভিজ্ঞাসূচনা ও অন্যদিকে ভাবপূর্তিভূমক গ্রন্থনসূচনা—এই দুইএর মধ্যে দৌত্য করে এবং এই দুই ব্যষ্টিকেই সংযমিত করে রাখে—এই অর্থে অভিজ্ঞা ও গ্রন্থনের মধ্যবর্তী ছত্রব্যষ্টিকে **যমনব্যষ্টি** বলতে পারি।

পুরনো পয়ারবন্ধের ছত্র ছিলো দুজাতের—গ্রন্থনযতিপ্রান্তিক, আর অভিজ্ঞাযতি-প্রান্তিক। গ্রন্থনসূচক পূর্তিযতিদ্বারা খণ্ডিত হতে পারতো না পয়ারছত্রগুলি। স্থানে স্থানে পূর্তিযতিপাতন যে একেবারে না ঘটেছে তা নয়। কিন্তু তা ছিলো ব্যতিক্রম। [১৭]-এর উদাহরণে প্রথম ছত্রের প্রথম পর্ব 'শ্রীরাম বলেন' যদি একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থনব্যষ্টি হয়, তাহলে নিচের বহুল-উদ্ধৃত পয়ারবন্ধেও পূর্তিযতিখণ্ডিত ছত্রের সাক্ষাৎ পাই :

[১৯] মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান॥

এখানে দ্বিতীয় ছত্রস্থ 'ভনে' ক্রিয়াপদের কর্মপদ হলো প্রথম ছত্রটি, যদিও প্রথম ছত্রটি একটি স্বাধীন বাক্য হিসেবেও গণ্য করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রের 'কাশীরাম দাস ভনে' এবং শুনে পুণ্যবান' অংশদুটিকে ভাষাবিচারের দিক দিয়ে নিশ্চয়ই দুটি পূর্ণ বাক্য বলা যায়। কিন্তু

এই ধরনের উক্তি বাক্যগুলিকে সাধারণতই বৃহৎ বাক্যের অংশ মনে করা হয়। এই জন্যেই উদ্ধৃত দ্বিতীয় ছত্রটিকে প্রাচলিক সংস্কারে একটি পূর্ণ গ্রন্থনব্যষ্টি বলে ধরে নেওয়া হয়। উক্তিবাক্যের এই কাঠামো মানলে, [১৭]-এর উদাহরণের ছয়টি ছত্রকে ছয়টি গ্রন্থনব্যষ্টি, বা আমি যেমন পূর্বে বলেছি—তিন পয়ারবন্ধে তিনটি গ্রন্থনব্যষ্টি—তা অস্বীকার করে বলতে হয়—সমগ্র রচনাটি একটিমাত্র বৃহৎ গ্রন্থনব্যষ্টি। ছত্রলঙ্ঘক ছন্দের এটি একটি অকাট্য উদাহরণ।

মধুসূদন-উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষরছত্র প্রচলিত অর্থে ছত্রের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নবীনচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিগণ এই ছত্রকে মূলত অন্ত্যানুপ্রাসহীন অভিজ্ঞাব্যষ্টি বলে ব্যবহার করেছেন তাঁদের স্ব স্ব কাব্যে। অমিত্রাক্ষরছত্রের ভূমিকা ছিলো সুদূরপ্রসারী। এটি যে একটি মননভূমক যমনব্যষ্টি তা রবীন্দ্রনাথের রচনায় আরও স্বচ্ছন্দভাবে প্রকটিত হয়েছে। 'মেঘদূত' কবিতায় ("মানসী"-ভুক্ত) কয়েক ছত্র উদ্ধার করি:

[২০] কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত-মাঝে পুঞ্জীভূত করে॥

ছয়ছত্রে গ্রথিত অংশটিতে গ্রন্থনব্যষ্টি মাত্র দুটি। প্রথমটিতে দুটি পূর্ণ ও একটি খণ্ডিত ছত্র; দ্বিতীয়টিতে একটি খণ্ডিত ও তিনটি পূর্ণ ছত্র। তৃতীয় ছাড়া বাকি পাঁচটি ছত্রই পুরোপুরি আবর্তিত হয়েছে—শুধু তাই নয়, মিলযোগে ছত্রনামাঙ্কিত যমনব্যষ্টিটি সব চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পর্বগুলি বিভিন্নায়তনের বলে অভিজ্ঞাযতিপাতন নিখুঁতভাবে সুমিত না হলেও ছত্রগুলি সমায়তনের বলে যমনযতির সুমিতিই এই কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে—মিলখণ্ডিত বলে এটি একটি ভিন্নপ্রকৃতির ব্যষ্টি বলেও সহজেই ধরা পড়ছে। প্রথম গ্রন্থটির পর্বসমাবেশ কিন্তু নিখুঁত, দ্বিতীয় গ্রন্থটির তুলনায়: ৪{৪{৬—৪{৪{৬—৪{৪॥—এখানে চার-চার-ছয়-এর একটি পরম্পরায় আবর্তন সহজেই শ্রুতিগ্রাহ্য হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থনের সমাবেশ এই রকম: ৪{২—৮{৪{২—৪{৬{৪—৮{৪{২॥—এখানে পর্বসমাবেশের পরম্পরা আবর্তিত হয়নি; প্রথম খণ্ডিত ছত্র বাদ দিলে বাকি তিন ক্ষেত্রেই চোদ্দমাত্রামাপের ছত্রের নিখুঁত আবর্তন ঘটেছে। কাজেই প্রবহমান পয়ার, সমিলই হোক, বা অমিলই হোক, শেষ পর্যন্ত তার মূল স্বরূপটি নিখুঁত রাখতে একমাত্র ছত্রনামাঙ্কিত যমনব্যষ্টিই পারে।

যতির তিনজাতের রূপভেদ লক্ষ করলাম: **অভিজ্ঞাযতি, যমনযতি,** আর **গ্রন্থনযতি**। এই তিনপ্রকারের যতির সুষ্ঠু ব্যবহারেই প্রবহমানতার স্বরূপ স্ফূর্তিলাভ করে॥

মহাপয়ার

ছত্র যতো দীর্ঘ হবে, পর্বসংখ্যা ততোই বাড়বে, বলাই বাহুল্য। আর পর্বসংখ্যার বৃদ্ধি বলার অর্থ ছত্রপরিসরে অভিজ্ঞাযতিপাতনের সংখ্যাবৃদ্ধি। দীর্ঘায়ত পয়ারছত্রে এইজন্যে বিশেষ বিশেষ মাত্রামাপাধীন পর্বের আবর্তন ঘটিয়ে একটি সুমিত ধ্বনিদোলার সম্ভাব্যতা সূচিত হয়। সুকুমার সেন মহাশয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে প্রচলিত দীর্ঘায়ত পয়ারবন্ধের

এই উদাহরণটি দিয়েছেন:

[২১] বাইশ আখড়া বাজে{তক্তরওয়া{শোভে স্থানে{স্থানে।
ব্রাহ্মণের{শিশু মৌলি{সাম গান{করিছে সঘনে॥

বলাই বাহুল্য, এটি প্রবহমান পয়ারবন্ধ নয়। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, দীর্ঘায়ত গ্রন্থনপরিসরে বিচিত্রমিত অভিজ্ঞাযতিস্থাপনের সম্ভাবনা। এখানে প্রতি ছত্রেই চারটি করে পর্ব, কিন্তু প্রথমটিতে ছয়-মাত্রার পর্ব এবং দ্বিতীয়টিতে দুই-ও-আটমাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়নি। চারমাত্রার পর্ব দুটি ছত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র সেন-অনুসরণে যতিলুপ্তির তত্ত্বটি মানলে, দুটি ছত্রকেই "৪{৪{৪{৪{২" এই মাত্রামাপাধীন পর্বপরম্পরায় ভাগ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের "প্রান্তিক" থেকে একটি প্রবহমান দীর্ঘ পয়ারের উদাহরণ নেওয়া যাক :

[২২] পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ; পিছুডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার
বাসাছাড়া মৌমাছির গুণ গুণ গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছ বিস্তীর্ণ করি অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরন্ত ধূসর পাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া।

(পশ্চাতের নিত্যসহচর)

প্রবোধচন্দ্রীয় পরিভাষায় এটিকে 'সমপংক্তিক অমিল প্রবহমান পয়ারবন্ধ'-পরিচয়ে চিহ্নিত করা চলে। উদ্ধৃত আট ছত্রে বা 'অষ্টকে' তিনটি মাত্র গ্রন্থনব্যাপ্তি পাই : (১) প্রথমটি দুটি ছত্র লঙ্ঘন করে তৃতীয় ছত্রখণ্ডনের দ্বারা গঠিত; (২) দ্বিতীয়টি—খণ্ডিত তৃতীয় ছত্র এবং পরবর্তী দুটি পূর্ণছত্র লঙ্ঘন করে ষষ্ঠ ছত্র খণ্ডন করে গঠিত হয়েছে; (৩) তৃতীয়টি—খণ্ডিত ষষ্ঠ ছত্র এবং পরবর্তী পূর্ণ ছত্র লঙ্ঘন করে অষ্টম ছত্রসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। আধুনিক আঠারোমাত্রার প্রবহমান পয়ারের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবো : এই প্রকৃতির গ্রন্থন-পরিসরে বিশেষ মাত্রামাপাধীন পর্বের আবর্তন ঘটানো সম্ভব হলেও তার প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ শব্দভিত্তিক পর্বগুলিকে দীর্ঘায়িত বা হ্রস্বায়ত মাত্রামাপাধীন করে নিয়ে, সুমিত নয়, বিচিত্রমিত অভিজ্ঞাযতিস্থাপনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এই ছন্দে। উপরে উদ্ধৃত দীর্ঘ-তম গ্রন্থনব্যাপ্তিটি আমি এইভাবে পড়েছি : ৪{৬—৮{৪{৬—৪{৪{৪{৪{২—৪{৪॥ এখানে দুটি ছয়ের ও একটি আটের পর্ব আছে। এগুলিকে চার-দুই, চার-চার—এই ভাগেও পড়া যায় কিনা, প্রশ্ন উঠবে। প্রথমে ছয়ের পর্বের আয়তন দুটিকে দেখা যাক : 'অক্লান্ত আগ্রহে' 'অস্ফুট সেতার'। বলাই বাহুল্য, এদুটিকে চার-দুই-এ ভাগ করলে এদের ধ্বনিগত রূপ দাঁড়াবে : অক্‌লান্‌ত-আগ্‌{রহে, অস্‌ফুট-সে{তার্‌। দ্বিতীয়টিতে যৌগরীতি-অনুসারে চার-দুই মাত্রামাপ পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু চার-দুই ভাগ করলে প্রথমটিতে পর্বান্তিক 'আগ্‌' আর অপ্রান্তীয় রুদ্ধদল থাকে না, যৌগরীতিসিদ্ধ মাত্রাগণনা মানলে এই রুদ্ধদলটি পর্বপ্রান্তিক বলে দুই মাত্রার মূল্য পাবে এবং পর্বটি পাঁচমাত্রার আয়ত্তাধীনে আসবে। 'অক্লান্ত আগ্রহে' পর্বটি আসলে ছয়মাত্রার পর্ব, চার-দুই-এর সমষ্টি নয়। দ্বিতীয় পর্বটিকে তত্ত্বগতভাবে চার-দুই-এ ভাঙা গেলেও, এর প্রয়োজন নেই বলবো। পয়ারের একটি

বৈশিষ্ট্য হলো সংকেতদ্যোতক শব্দকে না-ভেঙে পড়া। 'অস্ফুট সেতার' পর্বটিকে চার-দুই-এ ভাঙলে অন্ত্যপর্ব '-তার' শব্দটি কোনো সংকেত দ্যোতনা করে না। আট মাত্রার 'আবেশ আবিল সুরে' পর্বকে চার-চার—এই ধ্বনিগত ভাগে পড়তে পারা গেলেও, এরও কোনো প্রয়োজন নেই বলবো; শেষ ভাগটি '-বিল সুরে' কোনো অর্থই দ্যোতনা করে না। শব্দকে এভাবে ভাঙা পয়ারে আবশ্যিক নয়। কাজেই উদ্ধৃত কবিতাংশের দীর্ঘতম গ্রন্থনব্যাষ্টিটিকে ৪{৪{২—৪{৪{৪{৪{২—৪{৪{৪{৪{২—৪{৪॥—এইভাবে ভাগ করা সঙ্গত হবে না। অর্থাৎ অভিজ্ঞাযতির 'সুমিতি' নয়, 'বিচিত্রমিতি'-ই এই গ্রন্থনপরিসরটিকে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে বলবো।

পয়ারছন্দে, বিশেষ করে প্রবহমান পয়ারে, বিভিন্নায়তনের পর্বসমাবেশের সুযোগ রয়েছে বলেই এই ছন্দ কবিদের সব চেয়ে প্রিয়। প্রবহমান পয়ারগ্রন্থনব্যাষ্টিতে দুই, চার, ছয় ও আট —এই চার আকারের মাত্রামাপবিশিষ্ট পর্বগুলি ব্যবহৃত হতে পারে বলার অর্থই, শব্দব্যবহারে কবির যে স্বাধীনতা রয়েছে এই জাতীয় ছন্দবন্ধে, তাই স্বীকার করে নেওয়া। নিত্যব্যবহৃত বাংলা শব্দের অধিকাংশই একদলিক, দ্বিদলিক বা ত্রিদলিক। চতুর্দলিক শব্দও অনেক আছে, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই 'সাধিত শব্দ'। ত্রিদলিক শব্দেরও অনেকগুলি 'সাধিত শব্দ'। একদলিক শব্দ প্রায়শই 'আশ্রিত শব্দ'। এগুলি দ্বিদলিক বা ত্রিদলিক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পর্বের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কিছু একদলিক শব্দ দ্বিরুক্ত হয়ে একপ্রকারের 'সাধিত শব্দের' সৃষ্টি করেছে, যেগুলিকে সাধারণভাবে দ্বিত্বশব্দ বা অনুকারশব্দ বলা হয়। উদ্ধৃত কবিতাংশের 'গুণ গুণ' (পঞ্চম ছত্রে) এই জাতীয় দ্বিত্বশব্দ। পয়ারে আটমাত্রার বৃহৎ পর্বের অন্তর্ভুক্তি সহজসাধ্য বলে বাংলার প্রায় সবরকম শব্দের ব্যবহার পয়ারপর্বে সম্ভব; শুধু তাই নয়, শব্দসংকেতনাধর্ম ক্ষুণ্ণ হবারও কোনো আশঙ্কা নেই পয়ারবন্ধে।

উদ্ধৃত কবিতাংশের কয়েকটি শব্দ- ও পর্ব-গঠন খুঁটিয়ে দেখলে শব্দস্বভাব যে ক্ষুণ্ণ হয় না এবং বিচিত্রাকার শব্দসমাবেশের যে প্রচুর সুযোগ রয়েছে এই ছন্দে তা ধরা পড়বে।

প্রথম ছত্রের পর্ব চারটিকে একে একে বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথম পর্ব 'পশ্চাতের': মূল শব্দটি দ্বিদলিক 'পশ্চাৎ', -'এর' বিভক্তি লাগার ফলে এটি ত্রিদলিক শব্দে পরিণত হয়েছে; যেহেতু এটি রুদ্ধদলান্তিক, তাই এর মাত্রামাপ দাঁড়িয়েছে চার। দ্বিতীয়টি একটি পঞ্চদলিক সাধিত শব্দ 'নিত্যসহচর'; এটিও রুদ্ধদলান্তিক, তাই এর মাত্রামাপ দাঁড়িয়েছে ছয়। এর পরেরটিও একটি চতুর্দলিক সাধিত শব্দ, মুক্তদলান্তিক বলে এটির মাত্রামাপ চার। ছত্রের শেষ পর্বটি কিন্তু দুটি শব্দের সমাবেশে সৃষ্ট, 'হে' এবং 'অতীত'; এখানে একমুক্তদলিক শব্দ আর (এটি রুদ্ধ বলে তিনমাত্রার) শব্দের মিলিত মাত্রামাপ চার। এই ছত্রের চারটি পর্ব চার ভাবে গঠিত: দুটি পর্ব সাধিত শব্দে গঠিত, এর একটি 'নিত্য-সহচর'—একটু দীর্ঘায়ত পর্ব, অন্যটি 'অকৃতার্থ' (অ+কৃতার্থ) পূর্ণায়ত পর্ব। বাকি পর্ব দুটির একটি বিভক্ত্যন্ত্য শব্দ 'পশ্চাতের', অন্যটি 'সাধিত পর্ব'—অর্থাৎ দুটি শব্দের সমাবেশে গঠিত (সমাসসাধিত নয়) 'হে অতীত'। এ-দুটিই পূর্ণায়ত পর্ব। এই ছত্রটিতে শেষের পর্ব বাদ দিলে—প্রতিটি পর্বই জোড়মাত্রার সমষ্টি; কিন্তু তাই বলে এটিকে চার-চার ভাগে কিছুতেই পড়া যাবে না, আট-ছয়েও না; এরকম করলে 'নিত্যসহ{চর'—এইভাবে সাধিত শব্দটি ভেঙে যাবে। ছন্দের দাবিতে শব্দের এরকম অঙ্গচ্ছেদ পয়ারে কাম্য নয়।

দ্বিতীয় ছত্রটিতেও চারটি পর্ব। প্রথম পর্বটি আটমাত্রার: পয়ারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য —তিনমাত্রাধীন দুটি শব্দের পাশাপাশি অবস্থান—এখানে লক্ষ করবো; পর্বান্তিক শব্দটি

দুমাত্রার। পূর্বের ছত্রটিতে দেখেছি যে একমাত্রার শব্দ আর তিনমাত্রার শব্দ ('হে অতীত') পাশাপাশি বসেছে। যৌগরীতির বৈশিষ্ট্যই এই যে বিজোড়মাত্রার শব্দব্যবহার আবশ্যিক হলে, আরেকটি বিজোড়মাত্রার শব্দ তার পূর্বে বা পরে স্থাপন করতে হয়। দ্বিতীয় ছত্রের এই অতিদীর্ঘায়ত পর্বটিতে দেখছি যে তিনমাত্রার দুটি শব্দ সমাবেশের পর, আর-একটি দুমাত্রার শব্দও ঐ পর্বে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই দুমাত্রার শব্দটি যেহেতু অন্য শব্দের সঙ্গে সমাস-সূত্রে আবদ্ধ নয়, সেজন্যে এটিকে এই পর্ব থেকে ছিন্ন ক'রে নিয়ে পরবর্তী চারমাত্রার পর্বের সঙ্গেও জুড়ে দেওয়া যায়, অন্তত এমনটি করলে ছন্দের কোনো ক্ষতি হয় না, সংকেতনারও কোনো হানি হয় না। এভাবে পড়লে ছত্রটির যতিভাগ দাঁড়াবে এই রকম : ছয়-ছয়-চার-দুই অথবা ছয়-ছয়-ছয়। শেষের ভাগটি মানলে, পর্বসংখ্যা কমে গিয়ে তিনে দাঁড়ায়। এই ছত্রটির এইরকম হেরফের করা গেলেও, পরবর্তী খণ্ডিত ছত্রের পর্বটিকে কিন্তু আটমাত্রায় পড়তেই হবে : এখানে তিন-তিন-দুই-এর পরই পূর্তিসূচক গ্রন্থনযতি স্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় ছত্রে পর্বসমাবেশ অর্থাৎ অভিজ্ঞাযতিস্থাপনের যে-স্থিতিস্থাপকতা লক্ষ করলাম, তা প্রবহমান পয়ারের অন্যতম বিশিষ্ট গুণ। এখানে আরেকটু বলার আছে। প্রবহমান ছন্দে দীর্ঘায়ত গ্রন্থনব্যষ্টির যে-অংশে এইরকম স্থিতিস্থাপকতাধর্ম স্পষ্টত অনুভূত হতে দেখি—সে-অংশের পূর্ববর্তী পর্বগুলির আয়তনরূপই যে এই প্রকৃতির ধর্মসৃজনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে তা দেখা কর্তব্য বলে মনে করি। আলোচ্য গ্রন্থনব্যষ্টির গঠনটি এই রকম : ৪{৬{৪{৪—৮{৪{৪{২—৮॥ স্থিতিস্থাপকতাপ্রবণ ৮-মাত্রার পর্বটির অব্যবহিত পূর্বে চারমাত্রার দুটি পর্ব আবর্তিত হয়েছে, স্বভাবতই এই আবর্তনের প্রভাব দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম ভাগে পড়েছে, শুধু তাই নয়—বিতর্কিত পর্বটিকে আটমাত্রায় পড়লে, তার অব্যবহিত পরেই আবার দুটি চারমাত্রার পর্ব পাই, এবং তৃতীয় ছত্রে যখন পৌঁছই এই গ্রন্থনান্তিক পর্বটিও আটমাত্রার। কাজেই বলা চলে, যে পাঠক স্বভাবতই এই আটমাত্রার আবর্তনজনিত চাল-টাকে স্বীকার করে নেবে। বিজোড়মাত্রিক শব্দের পর আরেকটি বিজোড়মাত্রিক শব্দ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এই দুই বিজোড়মাত্রিক শব্দের মিলিত সমাবেশের পরেও এর মধ্যে আরও একটি জোড়মাত্রিক শব্দের স্থানসংকুলান হয় কি না তা গ্রন্থনপরিসরভুক্ত পর্বসমাবেশপদ্ধতিই নির্ধারণ করে দেয়। আমরা আরও দেখবো যে প্রবহমান পয়ারে একই কবিতায় বিভিন্ন গ্রন্থনব্যষ্টিতে বিভিন্ন পর্ব-সমাবেশের প্রাধান্য—কোথাও চারের, কোথাও ছয়ের, কোথাও আটের। মহাপয়ারে ছত্রপরিসর-দীর্ঘতার জন্যে—চারের পর্বগুলির অন্য একটি চার অথবা ছয়ের পর্বের সঙ্গে জোট বাঁধার প্রবণতাও লক্ষ করবো। আলোচ্য গ্রন্থনব্যষ্টিতে এই পর্বজোটগুলিকে দেখা যাক (জোটসূচক হাইফেন বা 'যোজনচিহ্ন' ব্যবহার করা হলো) : ৪-৬{৪-৪—৮{৪-৪-২—৮॥ এখানে পর্ব-জোটগুলির মাত্রামাপ লক্ষ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে দশ-ও-আটের দুটি জোট—দশ-আট আট-দশ আট—এই পরম্পরায় আবর্তিত হয়েছে।

উদ্ধৃত কবিতাংশটির দীর্ঘতম গ্রন্থনব্যষ্টিটিকে যদি এইরকম পর্বজোটে ভাঙি তাহলে —দশ আট-দশ আট-দশ আট—এই পরম্পরায় জোটগুলিতে পাই। শেষের গ্রন্থনব্যষ্টিতে পাই—দশ আট-দশ আট-দশ—এই পরম্পরা। অর্থাৎ আলোচ্য মহাপয়ারে এই দুটি পর্ব-জোটকে 'আট-দশ' এই পরম্পরায় আবর্তিত হতে দেখছি প্রতিটি ছত্রে। পূর্তিসূচক গ্রন্থন-যতি দুবার পড়েছে ছত্রমধ্যে—অর্থাৎ আটমাত্রার পরে, একবার পড়েছে ছত্রান্তে—দশমাত্রার পরে। কিন্তু এইরকম আট-দশের পরম্পরা প্রবহমান পয়ারে যে আবশ্যিক নয়, তা দেখানো চলে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত একটি কবিতায় কিয়দংশ উদ্ধৃত করি:

[২৩] ...কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল! কোন অন্ধ কারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়! স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া।

('এবার ফিরাও মোরে')

এখানে তিনটি গ্রন্থনব্যষ্টি আছে। চার-চার এবং চার-ছয়ের পর্বজোট ধরে এগোলে দেখবো ছত্রমধ্যভাগে স্থাপিত গ্রন্থনযতি এইরকম জোটবাঁধার অন্তরায় সৃষ্টি করছে। আলোচ্য গ্রন্থন-ব্যষ্টিগুলির পর্বসমাবেশ-ও-জোট এই রকমের : (১) ৪-৬—৪॥; (২) ৪-৪{৬—৪-৬॥; (৩) ৪-৪—৪-৪{৪-৪—৬॥ প্রবহমান মহাপয়ারে এইরকম **চার** ও **ছয়ের** পর্ব অজোটঅবস্থায় গ্রন্থনব্যষ্টির আদ্যভাগে এবং মধ্য-ও-অন্ত্যভাগে (যেমন এই উদ্ধৃত কবিতাংশে) প্রায়শই থেকে যায়। আদ্যভাগে অজোটঅবস্থায় পর্বের সাক্ষাৎ এই উদাহরণে পাচ্ছি না। অন্যত্র পাই নিচের নিদর্শনে দ্বিতীয় গ্রন্থনব্যষ্টির আদ্যভাগে জোট-ছুট পর্ব (চারমাত্রার) লক্ষ করবো:

[২৪] তবে কেন ঠেলি সে-উজান, বিশেষত যাত্রাশেষে
স্বগত প্রত্যয়ই যখন অপেক্ষমান? অধুনার
সাক্ষাৎ মাভৈ একান্তিক বটে, কিন্তু বর্তমানে
দূরে স'রে আসে স্বত সন্নিকটে, ইতিহাস প্রাণ
পায় ভাবচ্ছবিরূপে, অন্তরীক্ষে মণ্ডূকের কূপে
ঝাঁপ দেয়, আদায়ের সমে ফেরে জন্মান্তের ব্যয়।

(উপস্থাপন, "দশমী", সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

ছয় ছত্রের কবিতাংশে গ্রন্থনব্যষ্টি মাত্র দুটি। প্রথমটির পর্বসমাবেশ এই রকম :

৪{৬{৪{৪—৬{৮॥; দ্বিতীয়টির : ৪—৬{৬{২{৪— ৪{৪{৪{৪{২—২{৬{৪{ ৪{২—৪{৪{৪{৪{২॥। পর্বজোটের অংশগুলিকে এইভাবে দেখানো যেতে পারে : (১) ৪-৬{৪-৪—৬{৮॥; (২) ৪—৬{৬{৬—৪-৪{৪-২ (অথবা ৬{৬{৬)—২-৬{৪-৪-২ —৪{৪-৪{৪-২॥ এখানে লক্ষণীয় হলো, দ্বিতীয় গ্রন্থনব্যষ্টিতে অন্তত তিনটি ছত্র রয়েছে যেখানে তিনটি করে পর্বজোট পাচ্ছি, ফলে উদ্ধৃত পয়ারবন্ধে কোনো এক বা দুই পর্বজোটের আবর্তন অনুসৃত হচ্ছে না। পর্ব ধরে এগোলে দুই, চার, ছয় ও আটের পর্ব যথেচ্ছ পাচ্ছি— এগুলির সমাবেশে কোনো পরম্পরা লক্ষিত হচ্ছে না; পর্বজোটের অবস্থান লক্ষ করলেও জোট-পরম্পরা কিছু মিলছে না, কেবল দুটি ছত্রে—তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রে ছয়-ছয়-ছয়-এর পরম্পরা আবর্তিত হয়েছে—কিন্তু এক্ষেত্রেও, চতুর্থ ছত্রটিকে কেউ কেউ আট-চার-ছয়েও পড়তে পারেন। এক কথায়, পর্বজোটেরও যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ করছি এই নিদর্শনে : চার, ছয়, আট ও দশমাত্রামাপের চার-আকারের পর্বজোট বিচিত্রপরম্পরায় আবর্তিত হয়েছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতাটির এই অংশে।

নির্দিষ্ট পরিমাপহীন গ্রন্থনপরিসরে—শব্দচয়নে, ভাবস্ফূর্তিতে, ভাবসংহতিতে—এক-রকম সব দিক দিয়েই কবি অনেকটা স্বচ্ছন্দে স্বকীয় রচনাবৈশিষ্ট্য দেখাবার যথেষ্ট সুযোগ পান প্রবহমান মহাপয়ারে। পর্বভূমক বা পর্বজোটভূমক অভিজ্ঞাযতির সুমিত আবর্তন তাই প্রবহমান ছন্দে আবশ্যিক নয়। ছন্দভূমক যমনযতিই এই জাতীয় ছন্দে একটি নির্দিষ্ট চালে আবর্তিত হয়। এবং আঠারো মাত্রার ছত্রায়তনে নানা স্বভাবের শব্দযোজনা, নানা বাক্‌রীতির

ব্যবহার ইত্যাদি সুযোগগুলি রচয়িতা তাঁর প্রকাশব্যক্তিত্বপ্রতিষ্ঠায় স্বভাবতই গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সুযোগ গ্রহণ একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার নয়—এটা একান্তই কবির স্বভাবাধীন। এই অধ্যায়ে [২২]-সংখ্যক উদাহরণে দেখেছি, কবি দুটি নির্দিষ্ট মাত্রার পর্বজোটের আবর্তনকেই তাঁর গ্রন্থনব্যষ্টি গঠনের ভিত্তি করে নিয়েছেন। আবার একই কবি অন্য রচনায়, [২৩]-সংখ্যক উদাহরণে, এইরকম আবর্তনকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেননি। কিন্তু দুটি উদাহরণেই যমনব্যষ্টি অর্থাৎ ছত্রায়তনের যে আবর্তন ঘটেছে, তা লক্ষ করা গিয়েছে। এটিকেই প্রবহমান পয়ারের মূল বৈশিষ্ট্য বলবো।

পর্ব ও পদ

আগের অধ্যায়ে যাকে পর্বজোট বলেছি, তাই বাংলা ছন্দশাস্ত্রে 'পদ' নামে পরিচিত। মধুসূদন-উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনেক ছত্রেই যে এইরকম দুটি পর্বজোটের বা পদের (আট-ছয়-এর) সাক্ষাৎ পাই তা অস্বীকার করবো না। কিন্তু প্রবহমান পয়ারে এইরকম ভাগ সর্বত্র পাই না।[২০]-র উদাহরণে 'মেঘদূত' কবিতার পঞ্চম ছত্রটিকে 'চার-ছয়-চার'—এই পর্বভাগে পড়তেই হবে, পর্বজোটের ভাগ মানলেও একে দশ-চার অথবা চার-দশ ভাগে পড়া যাবে, কিন্তু আট-ছয়ের দ্বিপদীভাগ কিছুতেই পাওয়া যাবে না। চারমাত্রার পর্বকে 'অপূর্ণপদ' বলে গণ্য করে দশ-চার বা চার-দশ-এ পড়লে এই ছত্রটি দ্বিপদী হয়ে ওঠে নিশ্চয়ই, কিন্তু আট-ছয়ের পদপরম্পরা যে এই ছত্রে অনুপস্থিত তা মানতে হবে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরছত্রে আট-ছয়ের একটা ভাগ লক্ষিত হলেও, সব ছত্রকে দ্বিপদী বলা যায় না। [১৮]-র উদাহরণের শেষ ছত্রটিতে তিনটি যতি স্থাপিত হয়েছে—চারমাত্রার ও চোদ্দমাত্রার (ছত্রান্তে) পর ভাবপূর্তিসূচক দুটি গ্রন্থনযতি ও আটমাত্রার পর (অর্থাৎ প্রথম গ্রন্থনযতির পর চারমাত্রার একটি পর্বান্তে) একটি অভিজ্ঞাযতি একই ছত্রে প্রাপ্তব্য। কোনো রকম পর্বজোট সৃষ্টি করেই এই ছত্রে প্রথম যতিটির লুপ্তিসাধন ঘটানো যায় না। চারমাত্রার অপূর্ণপদ স্বীকার করলে—একই ছত্রে তিনটি পদ পাই। কাজেই অমিত্রাক্ষরছত্রও সর্বত্র দ্বিপদী নয়।

মহাপয়ারের ছত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করলেও পয়ারের দ্বিপদীধর্ম যে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকে না, তার সাক্ষাৎ পাই। [২৩]-এর উদাহরণে ('এবার ফিরাও মোরে') লক্ষ করবো যে দ্বিতীয় ছত্রটিকে কিছুতেই দুই পর্বজোটে বা পদে ভাগ করা যায় না। এই ছত্রটিতে চারমাত্রার পর্বান্তে ভাবপূর্তিসূচক গ্রন্থনযতি, এবং পরবর্তী অংশে চার-চার-ছয়ের পর্বগুলির শেষে তিনটি অভিজ্ঞাযতি স্থাপিত হয়েছে : অর্থাৎ ছত্রের চেহারা দাঁড়িয়েছে এই রকম : ৪॥৪{৪{৬। এখানে ছত্রমধ্যবর্তী চারের পর্বদুটির জোট মানলেও, প্রথম পর্বটিকে স্বতন্ত্র রাখতে হচ্ছে, অর্থাৎ পদভাগ করলেও 'চার-আট-ছয়' এই ভাগ পাই (চারমাত্রার অপূর্ণপদ, আটমাত্রার পূর্ণপদ, ছয়মাত্রার অপূর্ণপদ—এই ক্রমে)। পদভাগ মানলে, এই ছত্রটি হয়ে ওঠে ত্রিপদী। [২৪]-এর উদাহরণে (সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উপস্থাপন' কবিতা) তৃতীয় ছত্রটিতে এই ভাগ পাই 'ছয়-ছয়-ছয়' ('সাক্ষাৎ মাভৈ{একান্তিক বটে,{কিন্তু বর্তমানে')। এই ছত্রটিকে আট-দশ পর্বজোট-ভাগে বা পদভাগে কিছুতেই আনা যায় না। যদি স্বীকার করি যে ছয়-ছয় দুটি পর্বজোটে পদগঠন সম্ভব, এবং এই রকম পদগঠন মেনে নিলে—আলোচ্য ছত্রটি 'বারো-ছয়'-এর দুটি পদে গঠিত—অর্থাৎ ছত্রটি যে দ্বিপদী—তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু প্রশ্ন হবে, ছত্রকে দ্বিপদী-ধর্মে ভূষিত করবার জন্যে এই রকম যথেচ্ছ পর্বজোট বা পদভাগসৃজন আদৌ প্রয়োজনীয় কি না। প্রবহমান পয়ারের মূল ধর্মই হলো অনির্দিষ্ট মাপের গ্রন্থনব্যষ্টিসৃজন, এবং যেহেতু

ভাবপূর্তিসূচক এই ব্যষ্টিটির মাত্রামাপ একই কবিতায় বিভিন্ন আয়তনের হতে পারে, তাই এর মূল 'য়ুনিট' বা একক-সংখ্যা, অর্থাৎ অভিজ্ঞাসূচক পর্বসংখ্যা কয়টি থাকবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। এ-পর্যন্ত যতো উদাহরণ পেয়েছি, তাতে লক্ষ করা গিয়েছে যে নিম্নসীমার পর্বব্যষ্টি ও উচ্চসীমার গ্রন্থনব্যষ্টি—এই দুই সীমার মধ্যবর্তী ছত্রব্যষ্টিটির নিখুঁত গড়নের দিকেই কবিদের দৃষ্টি দৃঢ়নিবন্ধ থেকেছে। নির্দিষ্ট মাত্রামাপাধীন ছত্রের মধ্যে সংকুলান হয় এমন পর্বসংখ্যাই কবিদেরকে মেনে নিতে হয়েছে—এবং এই পর্বসংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে পর্ব-ব্যষ্টির আকৃতির দ্বারা। সুধীন্দ্রনাথের আলোচ্য ছত্রে আদ্যংশে ছয়-মাত্রার পর্বটি ('সাক্ষাৎ মাভৈ') ব্যবহৃত হওয়ার পর ছত্রের বাকি বারোমাত্রার মাপের মধ্যে সংকুলান হয় এমন পর্ব-সমাবেশ কীভাবে ঘটানো যায়, সেদিকেই কবির দৃষ্টি নিবন্ধ থেকেছে। ছত্রের দ্বিতীয় পর্বটিও ছয়মাত্রার (এটিকে চার-দুই-এর পর্বজোটও হয়তো বলা যায়)—এখানে 'কমা'-চিহ্ন বা অল্পচ্ছেদের ব্যবহার এই পর্ব-আকৃতিটিকে খর্ব করে ফেলেছে; এই পর্বটিকে যদি আগের পর্বের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়—তাহলে পর্বজোটটি দশ-দুই বা বারোমাত্রার হয়ে পড়ে। ছত্রের অবশিষ্টাংশ কত মাত্রার হবে, তা পূর্বের পর্বসমাবেশই নির্ধারিত করে দিয়েছে —তাই ছত্রশেষভাগে দুই-ও-চারের দুটি শব্দ বসিয়ে ছয়মাত্রাধীন পর্বব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই ছত্রটিতে তিনটি ছয়মাত্রার পর্বব্যবহারের ফলে একটি বিশিষ্ট ধ্বনিদোলাও অনুভূত হতে দেখি। এই বিশিষ্ট চালের ধ্বনিদোলা পরবর্তী ছত্রটিকে যে প্রভাবিত করেছে তাও লক্ষণীয়। [২৪]-এর উদাহরণে চতুর্থ ছত্রটিকে ৪{৪{৪,{৪{২ পর্বভাগে পড়া গেলেও যেহেতু প্রথম পর্বদুটি চারটি দু'মাত্রার শব্দে গঠিত, এ-জন্যে ছত্রের প্রথম চতুর্মাত্রিক পর্বতিনটিকে দুটি ষণ্মাত্রিক পর্বে রূপান্তরণ সহজ হয়েছে। পূর্ববর্তী ছত্রের ষণ্মাত্রিক পর্বের ধ্বনিদোলার প্রভাবেই এই ছত্রটিকে তিনটি ষণ্মাত্রিক পর্বে বা পর্বজোটে পড়তে পাঠক স্বভাবতই উদ্যোগী হবেন।

এখানে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে পর্বজোটের একটা ভূমিকা প্রবহমান পয়ারে রয়েছে —এবং এই জোট, কোনো ছত্রে দুটি, কোথাও তিনটি। দ্বিপদী কাঠামো চোদ্দমাত্রার বা আঠারোমাত্রার প্রবহমান পয়ারে অত্যাবশ্যকীয় নয়।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরছত্রকে মননধর্মী যমনব্যষ্টিরূপে দেখলে—এই পরিসরে আট-মাত্রার পর একটি যতি (তা অভিজ্ঞাযতিই হোক, বা গ্রন্থনযতিই হোক) যে পাই, তা আবিষ্কার করা কঠিন নয়। এই অর্থে এই জাতীয় অমিত্রাক্ষরছত্রকে দ্বিপদী বলার একটি যুক্তি থাকতে পারে। মিত্রাক্ষরছত্রে অর্থাৎ সমিল পয়ারে—প্রবহমান বা অপ্রবহমান—এইরকম আট-ছয় পদক্রম আধুনিক যুগেও লক্ষ করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের "কড়ি ও কোমল"-ভুক্ত অনেক সনেটেই সমিল অপ্রবহমান পয়ারবন্ধে রচিত (যেমন 'গীতোচ্ছ্বাস', 'বাহু' ইত্যাদি)—এবং এগুলিতে আট-ছয়ের পদক্রম-অনুসরণ বেশ সুষ্ঠু। অমিত্রাক্ষর মহাপয়ার—যেমন [২২]-এর উদাহরণটি, এখানে আট-দশের পদক্রম সুষ্ঠুভাবেই অনুসৃত হয়েছে—যদিও এটি ("প্রান্তিক"-ভুক্ত 'পশ্চাতের নিত্যসহচর') প্রবহমান ছন্দে রচিত। এই সনেটজাতীয় কবিতাটি মাত্র ছয়টি গ্রন্থনব্যষ্টিতে (১৪টি ছত্রে বা যমনব্যষ্টিতে) রচিত। গ্রন্থনযতি ছত্রান্তে, অথবা ছত্রমধ্যে আটমাত্রার পর স্থাপিত হয়েছে। ফলে সমগ্র কবিতায় ২৮-টি পর্বজোট (১৪-টি আটমাত্রার, ১৪-টি দশমাত্রার) বা পদভাগ পাই। কবি কোনো ক্ষেত্রেই ছত্রের আট-দশ এই পদক্রমটিকে ক্ষুণ্ন করেন নি। এই কবিতার প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ গ্রন্থনব্যষ্টিগুলিতে পাঁচটি করে পদ, দ্বিতীয়টিতে ছয়টি পদ ও চতুর্থটিতে দুটি পদ পাচ্ছি। এই জাতীয়

কবিতার অন্তত ছত্রব্যষ্টিকে দ্বিপদী বলার নিশ্চয়ই অর্থ হয়। কিন্তু ভাবপূর্তিসূচক গ্রন্থনব্যষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখবো—আলোচ্য ক্ষুদ্রায়ত কবিতাটিতে দীর্ঘায়ত গ্রন্থনপরিসরে ছয়টি পদ স্থান পেয়েছে। কবিতাটি সনেটজাতীয় বলে—অর্থাৎ কবিতাটি চোদ্দটি ছত্রে গঠিত বলে বাংলা ছন্দালোচনায় এটিকে দ্বিপদীছত্রগঠিত কবিতা বলা যাবে; কিন্তু ভাবগ্রন্থনব্যষ্টির দিকে লক্ষ রাখলে বলতে হয়—এই কবিতায় ভাবপংক্তির ষট্‌পদিক হতেও কোনো বাধা নেই।

প্রবহমান পয়ারে পদভাগ আছে কিনা, তার সাক্ষ্য কবিতার ছত্রগঠনপদ্ধতিতেই পাওয়া যাবে। 'পশ্চাতের নিত্যসহচর' জাতীয় কবিতাগুলি পদভূমক প্রবহমান পয়ারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোনো কোনো কবিতার ছত্রগঠনপদ্ধতিতে আট-দশ বা আট-ছয়ের ক্রমটি বিপরীত-মুখী হতে পারে, অর্থাৎ মহাপয়ারে কোনো ছত্রে আট-দশ, আবার কোনো ছত্রে দশ-আট, তেমনি সাধারণ পয়ারের কোনো ছত্রে আট-ছয়, আবার কোনো ছত্রে ছয়-আট। চোদ্দমাত্রার প্রবহমান পয়ারে এই জাতীয় আট-ছয়ের 'প্রগত ক্রম' ও ছয়-আটের 'পরাগত ক্রম' নিচের কবিতায় লক্ষ করা যাক:

[২৫] নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমি মজুর। তাহাদেরি ছোটো মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা, কত ঘষা মাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে। আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেক বার, পিত্তলকঙ্কণ
পিতলের থালি'-পরে বাজে ধন ধন।

(দিদি, "চৈতালি", রবীন্দ্রনাথ)

দ্বিতীয় ছত্র ব্যতীত সব ছত্রেই আট-ছয়ের পর্বজোট বা পদভাগ স্থাপিত হয়েছে উদ্ধৃত এই অংশটিতে; দ্বিতীয় ছত্রে ক্রমটি বিপরীতমুখী, অর্থাৎ ছয়-আট। এই সনেটটির পরবর্তী অংশে আরও দুটি 'পরাগত ক্রম' (ছয়-আটের; একাদশ ও ত্রয়োদশ ছত্রে) লক্ষিতব্য। এই জাতীয় ছত্রগঠনকেও দ্বিপদী নিশ্চয়ই বলা যায়। কিন্তু "সোনার তরী"-ভুক্ত 'যেতে নাহি দিব', "মানসী"-ভুক্ত 'মেঘদূত' ইত্যাদি কবিতার ছত্রগুলি দ্বিপদী বলা সংগত নয়, কেননা এখানে কবি ছত্রগুলিকে আট-ছয় বা ছয়-আটের প্রগত- বা পরাগত ক্রমে সাজাবার কোনো প্রযত্ন করেন নি, তাঁর মূল লক্ষ হয়েছে ছত্রগুলিকে চোদ্দমাত্রার পরিসরে আবদ্ধ রাখা—এই পরিসরে পর্বসমাবেশপদ্ধতি যাই হোক না কেন। সুধীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত কবিতাংশে ([২৪]-সংখ্যক উদাহরণ) দেখেছি পর্বজোট বা পদের কোনো বিশেষ ক্রম কবি মানেন নি, তাঁরও মূল লক্ষ কবিতাছত্রকে আঠারোমাত্রার পরিসরে আবদ্ধ রাখা। প্রবহমান পয়ারে পর্বব্যষ্টি হলো নিম্ন-সীমা, আর গ্রন্থনব্যষ্টি হলো উচ্চসীমা—এই দুই-এর মধ্যবর্তী সীমায় পাই যমনব্যষ্টি, যার সাধারণ নাম ছত্র; এই ছত্রগঠনেই যদি কবির লক্ষ দৃঢ়নিবদ্ধ থাকে এবং পর্বজোট- বা পদ-ভাগ অবহেলিত থেকে যায়, সেখানে পদব্যষ্টির 'আবিষ্কার' ব্যর্থ প্রতিপন্ন হবে, কিন্তু পদভাগের নিখুঁত গড়নের প্রতি কবি যদি যথেষ্ট যত্নবান হন—এবং এইরকম ভাগ যদি ছত্রে ছত্রে আবর্তিত হয়—তা প্রগত ক্রমেই হোক বা পরাগত ক্রমেই হোক, তাহলে পদব্যষ্টির প্রতি ছন্দসমালোচকের দৃষ্টিপাত অবশ্য কর্তব্য।

ত্রিপদী চৌপদী ছন্দবন্ধে পর্বজোট বা পদভাগ যেমন একটি মূল অভিজ্ঞাব্যষ্টি, প্রবহ-মান পয়ারে তেমন নয়। সাম্প্রতিককালীন কবিদের হাতে প্রবহমান পয়ার যে পর্বজোট বা

পর্বভিত্তিক নয়, মূলত ছত্রভিত্তিক বা মননমূলক যমনভিত্তিক তা প্রমাণিত হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় এর সাক্ষ্য মিলেছে।

পর্বভিত্তিক প্রবহমান পয়াররচনা যে একেবারে স্তব্ধ হয়নি তারও নজির সাম্প্রতিক কালে যথেষ্ট রয়েছে। চল্লিশ দশকের এক কবির রচনা থেকে একটু উদ্ধৃত করি:

[২৬] ও হাওয়া, পাগল হাওয়া, কল্পনা উধাও,
উজ্জ্বল রৌদ্রের সঙ্গে হেমন্ত দুপুরে,
কার স্বপ্ন বীজধান্য দুহাতে ছড়াও
আকাঙ্ক্ষা-আচ্ছন্ন ঘুমে দূর থেকে দূরে।

(রিখিয়ায়/দ্বিতীয় স্তবক) :
অরুণকুমার সরকার

এখানে তৃতীয় ছত্রে দুটি চারমাত্রার পর্ব যে জোট বেঁধে আছে অর্থাৎ পদভাগ যে এখানে পাচ্ছি তা সহজেই লক্ষগোচর হয়। চতুষ্কবন্ধে রচিত বলে কবিতাটিতে প্রবহমানতা খুব স্ফূর্তিলাভ করেনি। কিন্তু আট-ছত্রের পদভাগ যে এই কবিতার ছত্রগঠনে কবির প্রযত্ন লাভ করেছে—এবং বিশছত্রের সমগ্র কবিতাটিতেই এই পদক্রম যে কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি, সেটির দিকেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এঁর মহাপয়ারে রচিত 'অন্য অন্ধকার' (২৪ ছত্রের) এবং 'সাবেক সমালোচকের দৃষ্টিতে' (১৮ ছত্রের) কবিতাদুটিতেও আট-দশের পদক্রম কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এইজাতীয় পয়ারকে দ্বিপদী বলতে কোনো বাধা নেই।

বিষ্ণু দে-র 'আইসায়ার খেদ'-শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতায় (৪১ ছত্রের) মাত্র দুটি ছত্র ব্যতীত বাকি ৩৯-টি ছত্রেই আট-দশের পদক্রম খুব সুষ্ঠু। ৩১-এর ছত্রে ছয়-ছয়-ছয়ের ত্রিপদ-ক্রম, ও ৩৮-এর ছত্রে ৬॥ ৬{৪—এই ক্রমটিকে ছয়-দশের পদক্রম বললে (এই ছত্রে দুটি মাত্রা কম আছে) অবশ্যই মনে করতে হয় যে কবি একটি নির্দিষ্ট পদক্রমের বিন্যাসকে ৩৯টি ছত্রে মেনে নিয়ে—অন্তত দুটি ছত্রে সচেতনভাবে একে অস্বীকার করেছেন। এই রকম সামান্য ব্যতিক্রম অন্যান্য কবিদের রচনায়ও যথেষ্ট চোখে পড়ে : শামসুর রাহমানের 'পিতা'-শীর্ষক সনেটটি—একটি ছত্র ব্যতীত—আগাগোড়া আট-দশের পদক্রমে গঠিত। ব্যতিক্রম ত্রয়োদশ ছত্রটি—এখানে চার-আট-ছয়ের ক্রম লক্ষিত হয়। (নিচে [৩১]-সংখ্যক উদাহরণ দ্রষ্টব্য) আটের পর্বটিকে ছয়-দুই-এ ভাগ করে সমগ্র ছত্রটিকে কেউ কেউ দশ-আটের পদক্রমেও পড়তে পারেন, এমনটি হলে একে আর ব্যতিক্রম বলা চলে না--এটিকে বরং বলবো 'পরাগত ক্রম'। এভাবে ছন্দনিরূপণ করলে, পূর্বে যেমন দেখেছি, শামসুর রাহমানের কবিতাটিকেও বলবো দ্বিপদী-ছত্রিক। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'নির্বাচনিক'-নামাঙ্কিত তেরো-ছত্রের মহাপয়ারটিও আট-দশের পদক্রমযুক্ত দ্বিপদীছত্রিক; একমাত্র ব্যতিক্রম একাদশছত্রের প্রান্তীয় দুমাত্রার বিস্ময়সূচক পর্ব ('অহো!')। (এই কবিতাটিকে প্রবহমান বলাও ঠিক হবে না।) বুদ্ধদেব বসুর ১৮-ছত্রের যুগ্মকসজ্জিত 'ব্যাং' কবিতাটিতে আট-দশের পদক্রম কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি; এর প্রতি ছত্রেই আটমাত্রার পর একটি অভিজ্ঞাযতি বা গ্রন্থনযতি-স্থাপন সম্ভব, এজন্যেই এটিকে দ্বিপদী মহাপয়ার বলা চলে। এমনি উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়।

কিন্তু আধুনিক যুগে প্রবহমান পয়ারে পদক্রম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অস্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ([২০]-র উদাহরণ দ্রষ্টব্য) ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ([২৪]-র উদাহরণ দ্রষ্টব্য) রচনাংশ উদ্ধার করে পূর্বেই পদক্রম-না-মানার প্রবণতা আগেই দেখানো হয়েছে। আরও কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক :

[২৭ক] আকাশে আষাঢ় এলো; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেল-সারি
বৃষ্টিতে ধূমল; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।
(ইলিশ : বুদ্ধদেব বসু)

এখানে তৃতীয় ছত্র ব্যতীত অন্য তিনটি ছত্রে আট-দশ পদক্রম মেলে; কিন্তু ছয়-মাত্রার পর গ্রন্থনযতির ফলে তৃতীয় ছত্রের অবশিষ্টাংশ বারোমাত্রার দীর্ঘ আয়তনটিকে পদ বলা যাবে? তিনটি চতুর্মাত্রিক পর্বজোট-কে যদি পদ বলি, তাহলে অনেক প্রবহমান পয়ারছত্রই যে দ্বিপদী তা প্রমাণ করা সহজসাধ্য হয়। কিন্তু এই উদ্ধৃতাংশের পরবর্তী স্তবকটি গোল বাধায় :

[২৭খ] মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উজ্জ্বল
আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকোগুলি; প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

এই অংশের প্রথম ছত্রে ৪॥৪{৪॥৬—এই পর্বক্রমকে বড় জোর ৪॥৮॥৬ এই পর্বজোট-ক্রমে বা পদক্রমে রূপান্তর করা যায়। 'মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন/অন্ধকার; দুরন্ত উজ্জ্বল'—এভাবে পড়লে স্বভাবতই কবিউদ্দিষ্ট পর্বসমাবেশের ধর্মনাশ ও এর ফলে অর্থনাশও ঘটে। বলাই বাহুল্য, এমনটি করলে কবিতাটির সংকেতনাস্বভাবের উপর জুলুম করা হবে। যদি পদভাগ করতেই হয়, তাহলে অন্তত এই ছত্রটিকে 'চার-আট-ছয়'-এর ত্রিপদী বলতে হয়। তৃতীয় ছত্রেও ছয়মাত্রার পর্বের পর গ্রন্থনযতি পড়েছে; ফলে এই ছত্রটি [২৭ক]-এর উদাহরণস্থিত তৃতীয় ছত্রের মতো ছয়-বারোতে ভাগ হয়ে গিয়েছে। চতুর্থ ছত্রে ছয়-ছয়-ছয়ের সমাবেশ লক্ষ করবো। প্রথম ছত্রের অনুসরণে এটিকেও ত্রিপদী বলা ছাড়া উপায় থাকে না—কেননা তিনটি পদের (এক্ষেত্রে তিনটিই অপূর্ণ বা ছয়মাত্রার পদ) সমাবেশকল্পনা এখানে অসাধ্য নয়। (এই প্রসঙ্গে [২৪]-এর উদাহরণস্থিত তৃতীয় ছত্রটি তুলনীয়।)

আসলে এই কবিতাটিতে কবির মূল লক্ষ নিবদ্ধ হয়েছে মননধর্মাত্মক যমনব্যাপ্তি অর্থাৎ ছত্রপরিসর-গঠনের প্রতি। বিভিন্নাকারের পর্বসমাবেশ ঘটিয়ে একুনে আঠারোমাত্রার নিখুঁত ছত্রগঠনই এই কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ছত্র আট-দশে ভাঙবে, বা দশ-আটে ভাঙবে, এ-প্রশ্ন এই জাতীয় প্রবহমান পয়ারে মোটেই আমল পায়নি—অর্থাৎ পর্বজোট বা পদভাগ এই জাতীয় পয়ারবন্ধের বৈশিষ্ট্যপরিচায়ক নয়।

পয়ারপ্রবহমানতায় পদগঠন যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে না, তা মধুসূদনের যুগেই ধরা পড়েছিলো। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ধর্মপ্রয়াণ" থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করি :

[২৮] যাহা শুনি' {অশান্ত নিতান্ত{যে বালক{—খেলা ত্যজি'
সে-ও বসে শান্ত হয়ে! সে-ও তার ভাব-রসে মজি'
আপন কাজল-আঁখি {করয়ে সজল। যেইরূপ
নীল-সরসিজ-দলে হিম-বিন্দু ঝরে টুপ্‌টুপ্‌
যখন যামিনী-মাতা মনে পেয়ে যাতনা দুঃসহ
বিদায়-চুম্বন দেন তাহারে সজল-আঁখি সহ।
হলে সুখী, {প্রভাত ডাকিয়া আন {আঁধার নিশীথে
কোকিলে ডাকাও আর কুহু-কুহু কণ-কণি শীতে!

প্রকৃতিরে{এমন করেছ বশ{—হৃদয়ের {ধন
ঢালি' দিয়া{হেলায় করিতে পার{অসাধ্য-সাধন!

এটি আঠারোমাত্রার মহাপয়ার। কিন্তু উদ্ধৃত দশছত্রের অন্তত পাঁচছত্রে আট-দশের পদক্রম অনুসৃত হয়নি। প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, নবম ও দশম ছত্রে (এগুলিতে অভিজ্ঞাযতিচিহ্ন দেখানো হয়েছে) দশমাত্রার পর একটু কষ্টসাধ্য হলেও যতিস্থাপন সম্ভব, এবং এমনটি করলে বলা যায় যে উদ্ধৃতাংশের অর্ধেক ছত্র আট-দশ আর বাকি অর্ধেক ছত্র দশ-আট পদক্রমে গঠিত, অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত প্রগত ক্রম ও পরাগত ক্রম-এর নীতিটিকে মানলে কবিতাংশটিকে আট-দশের মাত্রাভাগে দুই প্রণালীর পদক্রমে রচিত বলা চলে—কিন্তু এটিকে আমি কষ্টকল্পনাই বলবো। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে বাক্‌রীতি ও সংকেতধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে যতিস্থাপনই প্রবহমান পয়ারের বিশিষ্ট গুণ—এই গুণটির মর্যাদা যদি না দিই তাহ'লে প্রবহমানতার কোনো অর্থই হয় না। উদ্ধৃত কবিতাংশটির যে-পাঁচটি ছত্রকে পর্বজোটক্রমে বা পদক্রমে পড়লে আট-দশ-বা দশ-আট-ক্রমের ব্যতিক্রম ঘটে সেগুলিকে "/" এই চিহ্ন দিয়ে নিচে উপস্থাপিত করি :

১. প্রথম ছত্র : যাহা শুনি'/অশান্ত নিতান্ত যে বালক/—খেলা ত্যজি'
২. তৃতীয় ছত্র : আপন কাজল-আঁখি/করয়ে সজল।/যেইরূপ
৩. সপ্তম ছত্র : হলে সুখী,/প্রভাত ডাকিয়া আন/আঁধার নিশীথে
৪. নবম ছত্র : প্রকৃতিরে/এমন করেছ বশ/—হৃদয়ের ধন
৫. দশম ছত্র : ঢালি' দিয়া/হেলায় করিতে পার/অসাধ্য সাধন!

প্রবহমান পয়ারে পর্ব ও ছত্রের মধ্যবর্তী 'পদ' নামে একটি ব্যষ্টি যদি একান্তই অপরিহার্য হয়, তাহলে এই পাঁচটি ছত্রকে হয় ত্রিপদী বলতে হয়, নয় পদ-পরিসরকে দশমাত্রা থেকে বারো- ও চোদ্দ-মাত্রায় নিয়ে গিয়ে উল্লিখিত প্রতি ছত্রের দুটি অভিজ্ঞাযতির একটিকে "অর্ধযতি"-রূপে গণ্য করলে তবেই ছত্রগুলিকে দ্বিপদীধর্মে ভূষিত করা যায়।

পয়ারের রূপভেদ

সমায়তনের ছত্রে সাজানো প্রবহমান পয়ার ও মহাপয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্বের অধ্যায়গুলিতে দেখলাম। বৈশিষ্ট্যগুলির সাধারণীকরণ করে পয়ারের রূপটিকে এইভাবে বিবৃত করা যায় :

। ক. প্রাগাধুনিক পয়ার ।

প্রবহমানতা বাংলায় নতুন জিনিস নয়। প্রাগাধুনিক যুগে প্রবহমানতার যে-রূপ দেখি তা ছিলো মূলত ছত্রলঙ্ঘনভিত্তিক; একছত্রে বাক্য সম্পূর্ণ না হলে তা ডিঙিয়ে পরবর্তী ছত্র-সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হতো, যুগ্মকসীমা লঙ্ঘন করলে তা পরবর্তী যুগ্মকের প্রথম বা দ্বিতীয় ছত্রসীমা পর্যন্তও বিস্তৃত হতে পারতো; ছত্রখণ্ডিত করে ছত্রমধ্যস্থলে বাক্য পূর্তি-লাভ করতো না।

। খ. অমিত্রাক্ষর পয়ার ।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ মূলত ছত্রখণ্ডনভিত্তিক। বাক্যপরিসরে একটি অনির্দিষ্ট আয়তন সৃজন ছত্রখণ্ডনেরই ফল। ছত্রান্তিক ধ্বনিসাম্যহীনতা এই ছন্দের স্বরূপনির্ণায়ক নয়। পূর্বে ছত্র ছিলো, হয় অভিজ্ঞাসূচক, নয় গ্রন্থনসূচক। অভিজ্ঞা ও গ্রন্থন—দুইএর মিলিত স্পর্শে ছত্র একটি নতুন মূল্য লাভ করেছে মধুসূদনের হাতে। অভিজ্ঞা ও গ্রন্থন—এই দুইএর মধ্যবর্তী প্রধানত মননধর্মী ও সংযমনাত্মক একটি নতুন ব্যষ্টিসৃজনই মধু-

সূদনের বৃহত্তম কীর্তি : এই ব্যষ্টিটি অমিত্রাক্ষর ছত্র নামে পরিচিত, যদিও এর মিত্রাক্ষর-রূপ—অর্থাৎ সমিল প্রবহমান রূপ—সনেটে বা চতুর্দশপদাবলীতে উনি ব্যবহার করেছেন। এই ব্যষ্টিটিকেই আমি পূর্বের অধ্যায়গুলিতে বলেছি যমনব্যষ্টি।

। গ. আধুনিক পয়ারের দুই প্রকৃতি ।

প্রবহমানতার ধ্বনিদোলাজাত দুটি রূপ লক্ষিত হয়। নিম্নসীমায় অভিজ্ঞাসূচক পর্বব্যষ্টি ও উচ্চসীমায় পূর্তিসূচক গ্রন্থনব্যষ্টির মধ্যবর্তী যমনাত্মক ছত্রসীমার নির্দিষ্ট আয়তনে পর্ব ও ছত্রের মধ্যবর্তী আরেকটি মূলত অভিজ্ঞাসূচক স্তর এক-প্রকৃতির পয়ারবন্ধে দুর্লক্ষ নয়, ছত্রায়তনে একটি বিশেষ ক্রমে আবর্তিত হয়ে সমগ্র কবিতা-অবয়বে ঐ ক্রমজনিত একটি বিশেষ ধ্বনিদোলাসৃজনই যে এই স্তরটির মূল ভূমিকা তাতে সন্দেহ নেই। পর্বজোট বা পদ নামে এই স্তরটিকে অভিহিত করা যায়। এই পদভাগ অভিজ্ঞাযতিপ্রান্তিক হতে পারে, গ্রন্থনযতি-প্রান্তিকও হতে পারে। এই প্রকৃতির প্রবহমান পয়ারকে পদভূমক বা **পদিত পয়ার** বলা যায়। "কড়ি ও কোমল"-এর 'গীতোচ্ছ্বাস' প্রভৃতি সনেটগুলি, "প্রান্তিক"-এর 'পশ্চাতের নিত্যসহচর' কবিতাটি পদিত পয়ারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর এক প্রকৃতির প্রবহমান পয়ার-ছত্রকে এইভাবে কোনো নির্দিষ্ট ক্রমে পদভাগে ভাগ করা যায় না; ছত্র বা যমনব্যষ্টিই এই জাতীয় পয়ারের মূল ভিত্তি, যদিও অনেক ছত্রকে একাধিক পর্বজোটে ভাগ করায় কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু যেহেতু এই জাতীয় ছত্র নির্দিষ্ট পদক্রমে বিভক্ত নয়, সেজন্যে কোনো নির্দিষ্ট ধ্বনিদোলাও ছত্রে বা ছত্রের মধ্য দিয়ে সমগ্র কবিতা-অবয়বে অনুভূত হয় না, যে নির্দিষ্ট ধ্বনিদোলা অনুভূত হয়—তা ছত্রভিত্তিক বা যমনভিত্তিক। এই জাতীয় পয়ারকে **যমিত পয়ার** বলা যায়। "মানসী"-ভুক্ত 'মেঘদূত', সুধীন্দ্রনাথের "দশমী"ভুক্ত 'উপস্থাপন' এই জাতীয় পয়ারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

। ঘ. অর্ধযতি ও পদিত পয়ার ।

পদপ্রান্তীয় যতিটি অর্ধযতি নামে বাংলা ছন্দশাস্ত্রে পরিচিত। চোদ্দমাত্রার পদিত আটমাত্রার পর অর্ধযতি পাই। যেমন :

[২৯] বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি,/সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে/মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।/
(মুক্তি, "নৈবেদ্য")

আট-ছয়ের পদক্রম বিপরীতমুখী হলেও পদিত পয়ারের ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে, যেমন :

[৩০] যদিও বেকার তবু/বেপরোয়া চাল,
অহিংসায় ব্রতী।/গান্ধীনামে মূর্ছা যান
বীরবৃন্দ যত।/বুঝি এই সোজাসুজি
চোর গোলামেই আজো/অবতার খুঁজি।
(পঞ্চতপা, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়)

এখানে প্রথম ও চতুর্থ ছত্রে আট-ছয়ের পদক্রম ও দ্বিতীয়-তৃতীয়-ছত্রে ছয়-আটের পদক্রম লক্ষিত হয়। পদের এই রকম প্রগত ক্রম ও পরাগত ক্রমের ব্যবহার পদিত পয়ারে সহজলভ্য। [২৫] ও [২৬]-সংখ্যক উদাহরণ দুটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

আঠারোমাত্রার পদিত পয়ারে আট-দশের প্রগত ক্রম ও দশ-আটের পরাগত ক্রম পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণ দিই :

[৩১] তিনি নন বিধাতা অথচ/ব্যাপ্ত সত্তার পরাগে
তবে কি উপমা তাঁর/চৈতন্যের ভাস্বর নীলিমা?
(পিতা, শামসুর রাহমান)

সনেটের শেষ দুছত্র উদ্ধৃত হলো। প্রথম ছত্রে দশ-আটের পরাগত ক্রম ও শেষ ছত্রে আট-দশের প্রগত ক্রম লক্ষণীয়।

। **ঙ. অর্ধযতি ও যমিত পয়ার** ।

যমিত পয়ারের বৈশিষ্ট্যবিশ্লেষণ পূর্বেই করা হয়েছে। চোদ্দমাত্রার যমিত পয়ারের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরেকটু পরিস্ফুট করা যাক :

[৩২] ...ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হ'তে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা এত স্পর্ধাভরে
'যেতে আমি দিব না তোমায়!/চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনি,/সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্তক্ষুদ্রদেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ!
(যেতে নাহি দিব, "সোনার তরী")

এখানে প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ ছত্র ব্যতীত বাকি ছত্রগুলিতে আট-ছয়ের পদক্রম পাই। প্রথম ছত্রে ছিলো ছয়-আটের বিপরীত ক্রম, এখানে দ্বিতীয় পদটিই সুদীর্ঘ কবিতার একটি নতুন অনুচ্ছেদ সূচনা করেছে। চতুর্থ ও ষষ্ঠ ছত্রে আট-ছয়ের প্রগত ও পরাগত ক্রম পাই না, পাই তিনটি পর্বজোট বা পদভাগ : চার-ছয়-চারের। এই দুই ছত্রকে যদি একটি অর্ধযতি দিয়ে ভাগ করতেই হয়, তাহলে চতুর্থ ছত্রে দশ-চার ও ষষ্ঠ ছত্রে চার-দশের পদক্রম পাই। (এই দুই ছত্রকে অর্ধযতি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।) এই প্রসঙ্গে [২০]-সংখ্যক উদাহরণটি স্মর্তব্য। এই প্রকৃতির পয়ারে মুখ্যত ছত্রপরিসরই কবির লক্ষ্যগ্রাহ্য, কোনো বিশেষ ক্রমের পদবিন্যাসের দিকে কবির দৃষ্টি যায় না। যমিত মহাপয়ারের উদাহরণ দিই :

[৩৩] ...ভরেছিনু আসক্তির ডালি
কাঙালের মতো/—অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি,
পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
ভিক্ষামুষ্টি ধূলায় ফিরায়ে লও,/যাত্রাতরী বেয়ে
জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে॥
(জন্মদিন, "সেঁজুতি")

প্রথম ও শেষ ছত্রদুটি অসম্পূর্ণ। প্রথম ছত্রের দ্বিতীয় পদটি (দশমাত্রার) উদ্ধৃত হয়েছে শুধু। আট-দশের চালে রচিত মহাপয়ারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছত্র দুটিতে যথাক্রমে ছয়-আট-চার ও চার-আট-ছয়ের ক্রম স্থাপিত হয়েছে। 'যেতে নাহি দিব' প্রসঙ্গে যার আভাস দিয়েছি —সেই ভাবে এদুটি ছত্রকে ছয়-বারো ও বারো-ছয়ের ক্রমেও পড়া যায় (অর্ধযতি দিয়ে এদুই ছত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে)। কিন্তু বলাই বাহুল্য, ছত্রকে দ্বিপদী করবার তাড়নায় ছত্রপরিসরকে এখানে বারোতে নিয়ে যেতে হচ্ছে॥

। চ. দ্বিভাজ্যতা ও পয়ারের আরও দুই আকৃতিভেদ ।

অর্ধযতি প্রসঙ্গে আর একটি আলোচনা জরুরি বলে মনে হচ্ছে। মধ্যবর্তী স্থলে যতিস্থাপন করে সব ছত্রকেই একরকম দু'ভাগে ভেঙে পড়া যেতে পারে—একথা ক্ষুদ্রতম ছত্র থেকে দীর্ঘতম ছত্র পর্যন্ত সব আকৃতির ছত্র সম্পর্কে খাটে। 'বাইনারি' ভাগ বা দ্বিভাজ্যতা মানুষের উচ্চারণ-পদ্ধতির একটা সাধারণ লক্ষণ। পদপরিসর যদি চার থেকে বারো পর্যন্ত হতে পারে তাহলে আমরা যাকে একপদী বলি, তাকেই বা ছোট পয়ার বলবো না কেন? ছয়-চার বা চার-ছয়ের ক্রমে রচিত ছত্রবন্ধকে হ্রস্বপয়ার বলা যাবে?

[৩৪] কৈশোরের মঞ্জুল মুখোশ
ঢেকে রাখে জরার আক্রোশ;
প্রগতির দৃপ্ত পাহারায়
অবিরাম চলে অধঃপাত।

('স্মৃতির প্রতি (৩)', বুদ্ধদেব বসু

একটি চতুর্দশপদী কবিতার ষষ্ঠ থেকে নবম—এই চার ছত্র এখানে উদ্ধৃত হলো। বলাই বাহুল্য—প্রতি ছত্রে দুটি ভাগ সকলেই লক্ষ করবেন। চারমাত্রার পর যতিটিকে কি অর্ধযতি বলা যাবে? বুদ্ধদেব বসু এই জাতীয় হ্রস্ব ছত্রব্যাপ্তিকে সনেট-কাঠামোতে যে সচেতনভাবে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এটিকে যদি একজাতীয় হ্রস্বপয়ার বলা যায়, তাহলে কি আঠারোর বেশি—ধরা যাক কুড়ি বা বাইশ মাত্রার ছত্রসজ্জিত কবিতাবন্ধকে এক-জাতীয় মহাপয়ার বলা যেতে পারবে? নিচের উদাহরণটি লক্ষ করা যাক :

[৩৫] বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে ওঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের করে আছে চুপ

(বাংলার মুখ, জীবনানন্দ দাশ)

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "রূপসী বাংলা"-ভুক্ত একটি পরিচিত সনেটের প্রথম পাঁচ ছত্র উদ্ধার করা হলো। তৃতীয় ছত্র ব্যতীত বাকি অন্য ছত্রগুলিকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আট-আট-ছয়ের পদক্রমে সজ্জিত ত্রিপদী বলা অন্যায় হবে না। কিন্তু তৃতীয় ছত্রটিকে ৪{৮{৪{৪{২—এই পর্বভাগে সাজানো আছে বলে একে কিছুতেই আট-আট-ছয়ে রূপান্তরিত করা যায় না। শুধু তাই নয়—এই কবিতায় তৃতীয় ছত্রটি ভিন্ন-প্রকৃতির পর্বসমাবেশে গঠিত বলে বেমানান তো লাগছেই না, বরং বলবো সমগ্র কবিতায় অন্য দুই ছত্র আবার (দশম ও একাদশ ছত্র) এমন পর্বসমাবেশে গঠিত যে সেদুটিকে তিনভাগে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না। এই সনেটটির অষ্টকের শেষ ছত্র ও ষট্‌কের শেষ ছত্র—দুটিই ছাব্বিশমাত্রায় গঠিত। এবং এই দুটি ছত্রকে বারো-চোদ্দর ভাগে চমৎকার পড়া যায়। ছত্রের সার্বজনীন দ্বিভাজ্যতা মানলে, অর্থাৎ একটি অর্ধযতি ছত্রের মধ্যস্থলে স্থাপিত করলে—এই কবিতাটির দশম-একাদশ ও অষ্টম-চতুর্দশ—ছত্রচারটি ব্যতীত বাকি দশটি ছত্রেই বারো-দশের ভাগ খুব সুস্থ; অষ্টম-চতুর্দশ ছত্রে বারো-চোদ্দর ভাগ ও দশম-একাদশ ছত্রে আট-চোদ্দর ভাগও খুব স্বচ্ছন্দ বলবো। ত্রিপদী গঠন যে কবির অন্বিষ্ট নয় তা তৃতীয় ছত্রটির গড়ন দেখলেই বোঝা যায়। এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অভিজ্ঞাসূচক পর্বব্যাপ্তি ও ভাবপূর্তিসূচক গ্রন্থন-

ব্যাপ্টির মধ্যবর্তী একটি মননাত্মক সংযমনধর্মী ব্যাপ্টি, যা অভিজ্ঞতা ও গ্রন্থনের মিলিত রূপে সৃষ্ট—সেই যমনব্যাপ্টি বা ছত্রকেই কবি মূল য়ুনিট হিসেবে গ্রহণ করেছেন—ছত্রান্তর্গত পদ-গঠনের প্রতি কবির দৃষ্টি যায় নি। কাজেই এটিকেও যমিত মহাপয়ার নিশ্চয়ই বলা যায়। দুটি ছত্রে একটি করে অতিরিক্ত পর্বস্থাপনও কবির যমনব্যাপ্টির প্রতি মমতা প্রমাণ করে, কেননা ঐ দুটি ছত্রই অষ্টক ও ষট্কের সমাপ্তিসূচনা করছে।

সামান্য প্রবহমানতা প্রাগাধুনিক যুগের পয়ারে ছিলো লক্ষ করেছি। মনে হয়, পয়ার-বন্ধের বৈশিষ্ট্যই হলো প্রবহমানতা; ছত্রলঙ্ঘন ও ছত্রখণ্ডন এই ছন্দবন্ধের স্বভাবান্তর্গত দুটি গুণ।

রাজনগর

অমিয়ভূষণ মজুমদার

শেষ হেমন্তের দুপুর দেখতে দেখতে শেষ হ'য়ে যায়, হয়েছেও তা। এখন সব কিছুই কাছের হ'লে বাদামী আর দূরের হ'লে কালচে।

জয়নালের বয়স হয়েছে। তাকে যৌবনবতী রামপিয়ারীর মতো দাম্ভিক দেখায় না। তার গায়েও চকখড়ি এবং সিঁদুরের আলপনা করা হয়, কিন্তু যেটুকু সকালে দেখা গিয়েছিলো এখন যেন তাও চোখে পড়ছে না, বনজঙ্গলের ডালপালায় ঘষে উঠে গিয়ে থাকবে। কিংবা বাতাসে এখন রং থাকায় সেই মন্দা আর লাল এখন অস্পষ্ট। জয়নালের শুঁড়ে জড়ানো বেশ মোটা কিন্তু খাটো একটা কলাগাছের ডুমো, যার রং এখন বাদামী মনে হচ্ছে। তার হাঁটা দেখে মনে হয় যেন সে ভাবছে কতক্ষণে হাওদা খুলবে, আর সে সেই নরম ডুমোটাকে সদ্ব্যবহার করবে। সে জন্য তার চলার মধ্যে যেন একটা খুশীর ভাব।

হাওদায় রাজু, রাজকুমার রাজচন্দ্র। হাওদার পিছনে হাতির পিঠে হলুদ হলুদ রঙের কিছু বাঁধা, কিংবা আরও ভালো ক'রে বলতে বেশ খানিকটা মেটে রঙের ছোপযুক্ত হলুদ। আকৃতিতে হরিণই মনে হ'লো।

সামনে দুটো রাস্তা মিশেছে, কিংবা বড় রাস্তা থেকে যেন শাখা বেরিয়েছে। শাখাটা ফিরে গিয়েছে ফরাসডাঙায়। সন্ধ্যার কিছু দেরি আছে বটে, কিন্তু তা কি রং নিয়ে আসবে তার যেন আভাস পাওয়া যায় পথের শেষপ্রান্তের আকাশে।

রাজুর সকালের কথা মনে হ'লো। শিবমন্দিরটা অনেকটা উঁচুই হবে। মাটি থেকে অন্তত বিশবাইশ হাত উঁচুতে থাকবে চূড়া। রাজবাড়ির চূড়া শোনা যায় মাটি থেকে পঁচিশ হাত। কিন্তু রাজবাড়ির চূড়াটা গম্বুজের মতো, একটু ছ্যাতরানো বা। মন্দিরের চূড়া অন্য রকমের হবে।

গোটা মন্দির কি রকম হবে তার ছবি রাজু দেখেছে। রানী নিজেই একদিন দেখিয়েছিলেন। জয়পুরী সেই মিস্ত্রীর নকশা।

হঠাৎ মনে হ'লো রাজুর হাওয়াঘরটা তখন থাকবে না। বলতে পারো এখনই নেই। কিছুদিন আগেই তো টেনে নামানো হয়েছে খড়ের সেই পুরু ছাদ, লোহা আর কাঠের তির বরগা। এখন যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে শূন্য হ'য়ে গেলো তার মন।

ওখানেই, ওই হাওয়াঘরেই প্রথম বন্দুক চালাতে শিখেছিলো সে। শিখিয়েছিলো বুজরুক। কত তাড়াতাড়ি অতীত হ'য়ে যায় বর্তমান।

আর অতীত এমন বিষয় যে বর্তমানে পৌঁছে সবকিছু যেমন ক'রে ঘটেছিলো পরপর তেমন ক'রে দেখবার উপায় থাকে না। একই কাগজে যদি পরপর ছবি আঁকা যায়; আগেকার ছবির রং জলে ধুয়ে ধুয়ে, তাহ'লে শেষ ছবিটির উজ্জ্বল রংএর আশেপাশে নিচে থেকে পুরনো ছবির আভাস যেমন তেমন যেন দেখায় অতীতকে। প্রায়, গেরুয়া রঙের ছোপ লাগা আকাশটাকে দেখলো রাজু চোখ মেলে।

শাখা-পথটার কাছে জয়নাল দাঁড়ালো না।

আর এই শাখা-পথের উপরেই কিছুদূরে এগিয়ে গিয়ে সেই ঘটনাটা ঘটেছিলো।

পালকি-বেহারার হুমহাম শব্দে তার ঘোড়া বারবার পিছ্‌পায়ে দাঁড়াচ্ছে। ঘোড়ার উপর থেকে সে যেমন, পালকির ভিতর থেকেও তেমন বিরক্ত বুজরুক কে যায় ব'লে ঝেঁঝে উঠেছিলো। সারাক্ষণ বুজরুকের কথাই ছিলো মনের কাছে, ইংরেজের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরছে বুজরুক। অথচ তখন সেই পালকিতেই বুজরুক তা সে ভাবতেও পারেনি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো রাজুর। তখন দেখা হ'য়ে গেলে কিনা কৌতুকের হ'তো! সন্ধ্যার ম্লানভাবটা রাজু অনুভব করলো তার মনে। আসলে বোঝা যায় না। একই পথের উপরে মুখোমুখী অবস্থান করলেও চেনা যায় না, জানাও যায় না কি কার পরিণতি হবে। কেউ কি জানে পিয়েত্রো ঠিক কি আশা করেছিলো? তা কি ইংরেজদের প্রতি ফরাসীর মিথ্যা অর্থহীন আক্রোশ? একবার বলেছিলেন বটে একহাজার লোক নিয়ে শুরু করে এক রাজ্য স্থাপন করা যায়—ভাগ্য সহায়তা করলে এবং অশেষ কষ্ট সহ্য করার উৎসাহ থাকলে। ভাগ্য বৈ কি। গুণাবলীর দিকে দুজনে সমান হ'লেও ইতিহাস ভাগ্যবানের কথাই লিখে রাখে।

হাওয়াঘরের কথাটাই আবার ঘুরে এলো মনে। সে অনুভব করলো ছাদ টেনে নামানোর পরেও সে দিকে চাইলে যেন হাওয়াঘরটার ছায়া সেখানে এতদিন দেখা যেতো। এরপর সেদিকে চাইলে নিরেট বিপুল শিবমন্দিরটাই চোখে পড়বে। অতীত থেকে উঠে আসা ছায়া সে কি বর্তমানের বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গে পারে? এরপর পিয়েত্রোর বলা কোন কথার প্রতি-ধ্বনি মনে আসতে আসতে হয়তো মন্দিরের ঘণ্টাশব্দে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাবে।

হাতের উপরে চিবুক রেখে সামনের দিকে চাইলো রাজু। তাহ'লে শব্দটা উঠছে জয়-নালের গলায় ঝুলানো ঘণ্টা থেকেই? আর তার অর্থ এই যে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে হাতি। শিকারের হাতির ঘণ্টা বাজালে চলে না। গ্রামে ঢুকেই সোভান দড়ির বাঁধনটা ছাড়িয়ে দিতেই বড় পিতলের ঘণ্টাটা হাতির গলার ডোর থেকে দোল খেয়ে খেয়ে বাজছে।

আর জয়নাল এখন গতিও বাড়িয়েছে যেন। বাড়ি ফেরার পথ, মাহুতকে অঙ্কুশ ব্যবহার করতে হচ্ছে না। কানের পিছনে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু অঙ্কুশটাও হাতে আছে। গ্রামে ঢুকে পিলখানার দিকে ছুটতে পারে, রাজবাড়ির দিকে না গিয়ে।

হ্যাঁ গ্রামেই তো। খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নামছে এখন। তাহ'লেও পথ চেনা আছে। লোকজন আছে পথে। তারা স'রে স'রে যাচ্ছে হাতি বাঁচিয়ে।

হাওদায় ব'সে দুলুনিটা ডাইনে বাঁয়ে লাগে ঠিকই, কিন্তু কাঁধের কাছে বসা মাহুত অনবরত উঠছে আর নামছে।

পিয়েত্রোর হাতিটা একা একা এক গাছতলায় সামনে পিছনে দোলে। শুঁড় তোলে। কি ধরতে চায়? কিছু যেন শুঁড়ে টেনে পায়ে ফেলছে মনে হবে। মিথ্যা কিংবা উদ্দেশ্যহীন আক্রোশ।

পিয়েত্রোর হাতিটা ছোট। তার পিঠে হাওদা, হাওদায় পিয়েত্রো। অন্য হাতিতে ছিলো বুজরুক।

রাজু ভাবলো সে শিকারের তুলনায় অন্য কোনদিনের কোন শিকারকেই সে নাম দেয়া যায় না। অথবা তাকে কি শিকার বলা হবে? আহত বাঘের দিকে বুজরুক যেভাবে খোলা কিরিচ হাতে ছুটে গিয়েছিলো? সেটা হয়তো তার পক্ষে শিকার খেলার অংশমাত্র ছিলো। কিন্তু তা যেন রাজুকে বলতে পারে দেখো পুরুষের কত সাহস হ'তে পারে, নিজের হাতের কিরিচে কত বিশ্বাস রাখতে হয়।

আজকের হরিণটা কিছুমাত্র খেলোনি। পাকা ধানখেতে বনের ধার ঘেঁষা ধানক্ষেতে ঢুকেছিলো। বেশি খেয়ে যেন ছুটতেও পারছিলো না।

হরিণ, অবশ্য, ক্বচিৎ মেলে জঙ্গলে। গ্রামে প্রচলিত গল্প মানতে হ'লে বলতে হবে রাজুর বৃদ্ধপিতামহের সময়ে পুরনো বাড়িতে বন্যার জল পৌঁছালে হাডার চিড়িয়াখানার হরিণগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। এ হরিণ তাদেরই জ্ঞাতগুষ্টি হবে।

রাজু ভাবলো, বনে বুনো মোষও আছে। বিলমহলে তাই প্রবাদ। বাঘও আসে হরিণের লোভে। তারপর বনের ধারে গ্রামে গোরুবলদের উপরেও হামলা করে।

হরিণ যদি তেমনভাবে এসে থাকে বুনোমোষও কি তবে গৃহস্থের হারিয়ে যাওয়া মোষ থেকেই এ অঞ্চলের বনে তৈরি হয়েছে? কিন্তু তা কি সত্যি হয়—পুরনো ঝাড় থেকে একেবারে নতুন কিছু? ভারি আশ্চর্য ব্যাপার হয় তাহ'লে—গৃহপালিত পোষমানা প্রাণী থেকে একেবারে নতুন বেপরোয়া এক বংশ। তা কি হ'তে পারে? খানিকটা সময় যেন এই চিন্তাটায় তার মন আটকে রইলো। বন্য থেকে পোষমানা হ'য়ে আবার বন্য স্বাধীন? শিবজীর কথা বলবে?

এখন গ্রামের প্রধানপথে উঠেছে হাতি। তাই এ সন্ধ্যাতেও লোকচলাচল একটু বেশী এখানে তাদের কারো কারো কাঁধে অথবা মাথায় ধামা। ওদিকের কাঠুরেপাড়ার হাট ছিলো তবে। দু-একজন এগলি ওগলি থেকে বেরিয়ে হনহন ক'রে হেঁটে হাতির পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে উল্টো দিকে। শেষ হাটে কিছু কিনতে আশা রাখে। তাদের কেউ কেউ আবার দাঁড়িয়ে পড়ে হাতি ও হাতির পিঠের শিকার করা জানোয়ারটাকে দেখে নিচ্ছে। এমন অস্পষ্ট আলোয় তা কি ঠাহর হবে?

প্রধান পথ, তাই গ্রামের অপেক্ষাকৃত বড় বাড়িগুলো এই পথের ধারেই যেন। এখান থেকেই সার্বভৌমপাড়া শুরু। কাঠুরেপাড়াটা বরং সাহেবপাড়ার পিছনে। নাম সার্বভৌম-পাড়া। তার অর্থ এই নয় এ পাড়ায় একাধিক সার্বভৌম থাকেন। একজনই ছিলেন। তাতেই এই নাম। ব্রাহ্মণপ্রধান পল্লী এখনও।

কিন্তু সবসময়ে তাও হয় না। যেমন কাঠুরেপাড়াটা খুব পুরনো হলেও সেখানে এখন যারা থাকে তাদের অধিকাংশ রাজকাছারির আমলা। আর সাহেবপাড়া তো এখনও কাগজপত্রে ওঠেনি, মুখে মুখে চলছে। আগে নাম ছিলো গঞ্জ। রাজার গ্রামের প্রধান হাট বসতো। সুতোর হাট, কাপড়ের হাট। এদিক ওদিকে এখনও কয়েকজন মহাজনের স্থায়ী আড়ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওখানে স্কুল—হরদয়ালের। স্কুলের হেডমাস্টার বাগচী সাহেবের বাসা। তা থেকেই লোকে সাহেবপাড়া বলে। এটা একটা নতুন হওয়ার ঘটনা বইকি।

ইতিমধ্যে রাজবাড়ির দোতলার কোন কোন জানলার আলো চোখে পড়ছে। রাজু দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললো, কিন্তু সোজা হয়েও বসলো। প্রায় সারাটা দিন কেটেছে হাতির পিঠে এবার নামতে হবে। আসল কথা, এই অত্যন্ত পুরনো কথাটাকে টানাসুরে ভাবলো যে, বদলে যায়, পুরনোকে ধরে রাখা যায় না।

মাহুত বললো,—হুজুর।

—কিছু বলবে?

—হাতি নিয়ে কইবেন বলেছিলেন।

—ও, হ্যাঁ। ওর বাঁ কানটার কথা।

সোভান মাহুত যা বললো: তিন চার বছর আগে জয়নাল সেই যে একটু খ্যাপাটে হয় তখন তাকে বাগে আনতে গিয়েই তার উপরে অত্যাচার করতে হয়েছিলো। বাঁ কানের নিচে

চার পাঁচ আঙুল চেরা তা সে সময়ের বল্লমের চিহ্ন। আর দাঁত দুটোর ডগা গোল নয়, সে দুটো মাপেও ছোট-বড়। সেও খ্যাপামির ফল। সে সময়ে একটা দাঁতের আগা বেশ খানিকটা ফেটে গিয়েছিলো। আসাম থেকে লোক আনিয়ে সমান ক'রে কাটিয়ে নিতে হয়েছে। একবার কথা উঠেছিলো দাঁত দুটোয় সোনার রিং পরানো হবে। এখনও কিন্তু খুব ছুটতে পারে জয়নাল, বয়স হ'লেও।

কারণটা মনে পড়লো রাজুরও। রিং পরানোর কথা হয়েছিলো, পরে কিছু আর করা হয়নি। কে ব্যবহার করবে জয়নালকে? কিছুদিন জয়নালের একমাত্র কাজ ছিলো বিলমহলে যাওয়ার জন্য কর্মচারীদের বাহন হওয়া। বলা যায় রাজু ইদানীং তাকে তুলে এনে নতুন ক'রে কাজে লাগাচ্ছে। এমন শিকারী হাতি হয় না, যদিও কানের ক্ষতচিহ্ন আর মুছবে না, দাঁতের গোল ডগাটা আর ফিরে পাবে না। আর হয়তো খ্যাপামিও করবে না। দেখো এতদিন পরেও কি বনের কথাই খেপিয়ে তোলে নাকি? রাজু বললো, সোভান,—হাতিটার গায়ে রং দিতে হয়।

—জী, তাই দেবো।

—পুরনো রং বেশ রগড়ে ঘষে তুলে দিও। রামপিয়ারী বা চন্দনের গায়ে যেমন অবিকল তেমন কোরো না। নকশাটা ভিন্ন কোরো। নতুন কিছু ভেবে নিও। এখন তো জয়নাল আমার কাজেই লাগছে। ও আর খেপবে না দেখো।

—জী, হুজুর।

একটু পরে আবার বললো রাজু,—আচ্ছা, পিয়েত্রোর হাতিটার কি অবস্থা, সোভান?

—ওর মাহুতই ওকে দেখে, হুজুর।

—সে কি? তার বেতন তন্‌খা?

—শুনি শেষমেস অনেককে চাকরান দিয়ে গিয়েছে পিয়েত্রো।

—আচ্ছা, সোভান, তোমাদের পিলখানাতে পিয়েত্রোর হাতিটাকে এনে রাখলে হয়, কাজে আর কি লাগবে, এনে রাখো।

—তা হয়, হুজুর।

—আমার তো মনে হয়, একা একা থাকা প্রাণীরাও বোঝে।

—হাতি তা বুঝবে, হুজুর।

রাজু ভাবলো, হ্যাঁ, কি আর কাজে লাগবে। তার নিজের হাতি তো নয়। কোথায় যেন পথের ধারের ঘাস ঝোপ থেকে ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠলো। ঝিঁঝিঁ'র ডাকের এই এক কৌতুক, তাতে যেন একটা ইশারা থাকে। যদিও বোঝা যায় না, কিন্তু যেন টানে, যেন দূরে নিতে চায়। আর তখন মন উদাস হয়।

রাজবাড়ির দরজায় হাতি বসছে, ভিতরে যেতে পারছে না, সদরদরজার খিলানটাকে আরও উঁচু করার চেষ্টা হচ্ছে। ইদানীং ভারা বেঁধে কাজ করছে মিস্ত্রিরা। যদিও আগেরটাই যথেষ্ট সুন্দর এবং উঁচু ছিলো। রাজু হাওদা থেকে লক্ষ্য করলো কয়েকজন কর্মচারী বেরিয়ে আসছে কাজ শেষ করে। তাদের মধ্যে সোনাউল্লা কাজীকে চিনতে পারলো সে। হাতির উপর থেকে সে বললো,—আমিন সাহেব, শোন।

আমলারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, এখন তটস্থ হ'লো।

হাতি থেকে নেমে রাজু বললো,—হাতির উপরে হরিণ আছে।

সোনাউল্লা বললো,—জী মেহেরবান্।

—ওটার সদ্গতি কোরো তোমরা। চামড়াটা শুধু—

—জী, রাজবাড়িতে পাঠাবো ?

—না। একটু ভেবে রাজু বললো,—শিবমন্দিরের পুরোহিতকে বরং পাঠিয়ে দিও। যদি তাঁর কাজে লাগে। কেউ কেউ নাকি অজিন আসন পছন্দ করে।

—বহোৎ খুব, হুজুর।

রাজবাড়িতে মশালচিরা তখনও আলো জ্বালিয়ে ফিরছে। সামনে দরদালানের সিঁড়ির গোড়ায় বেশ ধোঁয়া। ওখানে দাসীরা ধুনুচি ঠিক করছে তাহ'লে। সব ঘরে ধূপ দেয়া শেষ করতে পারেনি।

রাজু তার মহলের সিঁড়ির কাছে পৌঁছাতেই রূপচাঁদের সঙ্গে দেখা হ'লো। হাত বাড়িয়ে বন্দুক নিলো সে, গুলির বেলট্‌ও। পিছন পিছন যেতে যেতে সে বললো,—মাসী বললেন—

—তোমার মাসী ? কে ? নয়নতারা ? আজ দেখলাম বটে। কবে ফিরেছে রে ?

—বললেন তিনি রাজবাড়িতেই আছেন।

কয়েক ধাপ উঠে বললো রাজু,—রূপচাঁদ, স্নানের ব্যবস্থা কর।

—গরম জল তো ?

—আ, রূপচাঁদ, এখন আমি বেশ বড়ই হয়েছি। তা ছাড়া সাতদিন আগে যে ঠাণ্ডা লেগেছিলো—না, না, থাক, গরম জলই দাও স্নানের ঘরে। এখন আর মাকে বিরক্ত ক'রে মত আনতে যেতে হবে না। মা কোথায় রে, রূপচাঁদ ?

—জেনে আসি, হুজুর।

—না। শেষ কি করতে দেখেছিলে ? রাজু হাসলো রূপচাঁদের চালাকিতে।

—আজ্ঞে, রানীমা বোধহয় মহাভারত শুনছিলেন।

—আর তোমার মাসীই পড়ছিলেন নিশ্চয়।

হ্যাঁ, না, কোনটা ভালো হবে তা ঠাহর করতে পারলো না রূপচাঁদ। মহাভারত পড়ার সব ব্যাপারটাই তার অনুমান।

এক মশালচি দোতলার সিঁড়ির দেয়ালে দেয়ালগিরি জ্বালছে। বেশ খানিকটা কসরত সেটা। এপাশের রেলিংএ উঠে দাঁড়িয়ে মশালবাঁধা লাঠি দিয়ে দেয়ালগিরির উপরেই যেন ভর রাখতে হয়। যেন একটা পতঙ্গ, মশাললাঠিটা যার একটা শুঁড়ো। আসলে নিশ্চিতই তা নয়। তাহ'লে দেয়ালগিরির করবী ফুলের মতো চেহারার লাল কাচের ডোমটা যা নাকি পিতলের কয়েক প্যাঁচে মাত্র বসানো খানখান হ'য়ে ভেঙে পড়তো।

একটু দাঁড়াতে হ'লো রাজুকে।

মশালচি আলো জেবলে নেমে দাঁড়িয়ে সেলাম করলো।

রাজু নিজের ঘরের দিকে চললো।

এ ঘরের আসবাব খুব কম, কিংবা এমন হ'তে পারে ঘরখানি বিশেষ বড় ব'লেই তেমন দেখায়। দেয়ালে বসানো আলমারিটা বেশ বড়। অপরিচিত লোকের কাছে আর একটা দরজা মনে হবে। শুধু তার পাল্লাগুলোর মেহগিন রং দরজার পালিশের চাইতে উজ্জ্বল এবং গভীর। বরং তা রঙের দিক দিয়ে খাট, চেয়ার, দেরাজদার ডেস্কটার সঙ্গে মেলে। কিন্তু গাঢ় রং দেখতে গেলে মস্ত পিআনোটাকে লক্ষ্যে আনতে হবে যা উল্টো দিকের দেয়াল ঘেঁষে।

ঘরের মাঝামাঝি থেকে কিছু পিছিয়ে রাজুর খাট। স্বভাবতই তাতে নেটের মশারি এবং

দুধে-সাদা চাদর। খাট থেকে স'রে বাঁদিকে দেয়াল আলমারি। দেয়াল আলমারি থেকে কিছু দূরে একটা ছোট র‍্যাক। রূপচাঁদ তাতে বন্দুকটা রাখলো। আরও বন্দুক সেখানে। ডেস্কের সামনে খান দু-তিন চেয়ার। পিআনোর সামনে গদিদার টুল। ডেস্কের উপরে হিংকসের বড় টেবল ল্যাম্পটা জ্বালানো হয়নি। ঘরের ঠিক মাঝখানে ছাত থেকে ঝোলানো ঝাড়টাও জ্বলছে না, যদিও দেয়ালের দেয়ালগিরির আলোয় ঝাড়ের ত্রিশিরা কাচগুলো ঝিকমিক করছে। ঝাড়টার ঠিক নিচে গালিচা।

হেঁটে গিয়ে ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসতে বসতে ডেস্কের উপরে আখরোট কাঠের বারকোশটায় চোখ পড়লো রাজুর। ধারগুলো কারুকার্য করা। দু-তিনটি হাতি, একটা গাছ, গাছে মানুষ, মানুষের সমান বড়বড় ফল, আবার দু-তিনটে হাতি। কাঠের, অথচ স্বর্ণকারের কাজ মনে হয়। কিন্তু বারকোশে ফলও। রাজু কয়েকটা আখরোট তুলে মুখে দিলো।

খেতে খেতে জুতো খুলতে গেলো রাজু। রূপচাঁদ তখন হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো। নিচু হয়ে ব'সে জুতো খুলতে খুলতে বললো—জুতোয় হাত দেবেন, হুজুর, খাচ্ছেন যে।

—তুমি বুঝি হাট থেকে এনেছো? বেশ তো।

—না, হুজুর, পিয়েত্রো কুঠির লাণ্ডোর জন্য সদর থেকে এসেছিলো।

জুতো খুলে, চটিজোড়া পায়ের কাছে এগিয়ে দিয়ে রূপচাঁদ উঠে দাঁড়ালো। বললো—স্নানের জল তৈরিই থাকবে, দিতে বলি। আর এখন কি খাবারঘরে যাবেন? সারাটা দুপুর না খেয়ে কাটলো হুজুর।

—তাই তো দেখছি। স্নানটাই এখন দরকার।

ফিতে কষা জুতো মোজা খুলে ঢিলে চটি পড়ার একটা সুখ আছে। শিরশির করে রক্ত ব'য়ে যায় যেন আরাম দিয়ে দিয়ে পায়ের আঙুলগুলোতে। রূপচাঁদ চ'লে গেলে একটু পায়চারি করলো রাজু, বিছানার পাশ দিয়ে গিয়ে ওদিকের গরাদদার একটা জানলা খুললো। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এলো ঘরে। জানলা দিয়ে বাইরে চেয়েও খানিকটা সময় কাটলো। সে কি কিছু প্রত্যাশা করছে?

দরজার কাছে মৃদু শব্দ হ'লো।

একজন কে ঢুকছে। অল্পবয়সী, মুখটা ভরাভরা, চোখ দুটো বড়, ছোট নাক, তাতে ঝুটা মুক্তার নোলক। চুল টেনে বাঁধা, সম্ভবত বেশি তেল দেয়ায় আলোয় চকচক করছে। দুহাতে সাদা শাঁখার বালা। গায়ের উপর দিয়ে টেনে কোমরে এনে জড়ানো রাজবাড়ির ধোসা। কাজ করছে বলে হাত দুখানা প্রায় কাঁধ থেকেই আবরণের বাইরে। তার হাতে ধুনুচি, ধোঁয়াচ্ছে। রাজুকে দেখে সে শশব্যস্ত ফিরে যাচ্ছিলো। রাজু বললো,—ধূপ দেবে? দাও, আমি স্নানে যাচ্ছি। সে বেরিয়ে গেলো।

বিধান এই, ঝি-রা রাজপরিবারের পুরুষদের সামনে চলতে ভয় পায়। বিধানও এই, যে ঘরে তাঁরা থাকবেন না ডাকলে সেখানে যাবে না। বিধানটা নতুন। পুরুষ ভৃত্যদের বেলায় এ বিধানটা খানিকটা শিথিল, কারণ তাদের সংবাদ আদান-প্রদান করতে হয়।

ঝিটি এখানে ওখানে ধূপ দিলো ধুনুচি দুলিয়ে। কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে তার। সে কি বেআইনী কিছু ক'রে ফেলেছে।

তবু কর্তব্য তো করতে হবে। ডেস্কের কাছে এলো সে ধূপ দিতে দিতে। ডেস্কের চারপাশে, তার উপরে দেয়ালের গায়ে ধূপ দিতে দিতে সে যেন সৌন্দর্যে অবাক হ'য়ে গেলো। বারকোশটা আর বারকোশে সাজানো ফল। ধুনুচি দোলাতে দোলাতে সে স'রে গেলো। এখন

সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে পিআনোর দিকে ধূপ দেয়া শেষ হ'লে। কিন্তু পিআনোর দিকে না গিয়ে বরং সে ডেস্কের কাছে স'রে এসেই আবার ধুনুচি দোলালো। আর সেই সুযোগে বারকোশ এবং বারকোশের উপরে রাখা ফলগুলোকে আবার দেখলো। ধূপ দেয়া কি আর হয়নি? দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে এদিক-ওদিক দেখলো। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ধুনুচিটা মেঝেতে রাখলো। বারকোশের উপর থেকে একমুঠ যা উঠলো একবারে তুলে নিয়ে আঁচলে বাঁধলো। আঁচল কোমরে জড়িয়ে ধোসা দিয়ে ঢাকলো। তার মনে হ'লো এগুলোকেই কাবুলী মেওয়া বলে। না জানি কি অমর্ত সোয়াদ। কিন্তু ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতে কিছু যেন তার বুক চেপে ধরলো। রক্তচলাচলের অভাবে তার হাত-পা বিবশ হ'য়ে আসছে, মুখ বিবর্ণ।

দুড়দাড় ক'রে সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো। সেখানে প্রাচীনা একজন অন্য ঝিদের দিয়ে এদিক-ওদিক ধূপ দেয়াচ্ছে। প্রাচীনা বললো,—কি রে, হাঁপাচ্ছিস কেন?

—রাজকুমার ঘরে ছিলেন? তার পেটের কাছে বাঁধা মেওয়াগুলো লোহার দলার মতো ভার আর শক্ত বোধ হ'লো।

—তা রাজকুমার ঘরে থাকলে, প্রাচীনা বললো,—কিন্তু, আমি কিন্তু দরজার বাইরে পর্যন্ত গিয়েছিলাম তোর সঙ্গে, তাই না?

—ছাই গিয়েছিলে।

—এবার প্রাচীনার মুখও বিবর্ণ হ'লো। সে ভাবতে লাগলো রানীমাকে কি বলা উচিত সে যায়নি? ব'লে কি ক্ষমা পাওয়া যাবে? রানীমার হুকুমই এই নতুন নতুন ঝিয়েরা যখন কাজ করবে পুরনো বিশ্বাসী ঝিয়েরা তখন সঙ্গে থাকবে।

তাদের সে অবস্থায় দেখে কিছু একটা ঘটেছে আন্দাজ ক'রে অন্য ঝিয়েরা এগিয়ে আসছিলো কৌতূহলের টানে। প্রাচীনা ঝেঁজে উঠে বললো,—যা যা, কাজ শেষ কর। আমি কটাকে সামলাই বল। এটাকে বললাম দাঁড়া, তো ওটা একাই ছুটলো রাজকুমারের ঘরের দিকে।

অন্য ঝিয়েরা নিজের গালে হাত দিয়ে এদিক-ওদিক মুখ ফিরালো যেন ঘটনাটায় কি না বিস্ময়কর অভাবনীয়তা আছে।

নতুন ঝিটি যেন প্রাচীনার এই বিড়ম্বনার পিছনেই নিজের বিবশতাকে আড়াল করতে পারলো। পরামর্শ করার ভঙ্গিতে বললো,—তা দিদি, তুমি তো ছিলেই দরজার কাছে। ধোঁয়ায় আমরা ঠাহর করতে পারিনি রাজকুমার ছিলেন ঘরে।

—তাই বল। তুই যে কখন কি ভয় দেখাস না!

কিন্তু তার গা তখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে একবার ভাবলো, কিন্তু বারকোশটা কি বেশি খালি হ'য়ে যায়নি! প্রাচীনা তার মুখের দিকে চাইলো আবার। জিজ্ঞাসা করলো,—তোর শরীরটা কি খারাপ নাকি লো?

—মাথাটা ধরেছে খুব।

—তা হ'লে বাড়ি যাবি? সেই ভালো। প্রাচীনা এই ব'লে ভাবলো একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছে। দূরে দূরে থাকে এখন তাই ভালো। সামলে নেয়ার সময় পাওয়া যাবে। নবীনা ধুনুচি নামিয়ে রেখে বাড়ির দিকে চললো।

পথে এখনও বেশ অন্ধকার, যদিও সন্ধ্যার ঘোর কেটে এখন বরং আলো ফুটছে। কেই বা তাকে দেখছে যে তার পেটের কাছে ধোসাটা একটু উঁচু হয়ে আছে তা লক্ষ্য করবে?

রাজবাড়িতে যারা কাজ করে তাদের সকলের ছুটি একসঙ্গে হয় না। এবং বর্তমানে ঝি বলতে যা বোঝায় সকলেই সে স্তরের ছিলো না। ঝি এবং কন্যায় যে কোথাও কোথাও

মিলের আভাস আছে তা তখন অযৌক্তিক ছিলো না।

প্রথম পরিচারিকা পথে বেরিয়ে একজন সঙ্গী পেলো। এই দ্বিতীয়ার নাম সুন্দরী বামনি, এবং প্রকৃতপক্ষে তাকে সুন্দরীই বলা যায়। প্রথমার চাইতেও সে কিছু বয়সে বড়। সে জন্যই হয়তো সে সাহসিকা এবং হয়তো বা সেজন্যই তার সৌন্দর্য লোকের চোখে লাগে। টানা চোখ, নাকে ঝুটা পান্নার ফুল, কানে মাকড়ি। সব সময়েই সে পরিচ্ছন্ন কিন্তু অনেক সময়ে যেন ক্লান্ত দেখায় তাকে।

একই রাস্তায় যাবে তারা, আগে সুন্দরীর বাড়ি পড়বে।

খানিকটা দূরে গিয়ে সুন্দরী খুব ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলো,—সৌভাগ্য নাকি লো?

প্রথমা ঝি অবাক হ'লো।—কিসের? কি সৌভাগ্য দিদি?

—রাজকুমারের ঘর থেকে এসে অমন হাঁপাচ্ছিলে। সুখের আভাস পেলেও তো অনেক সময়ে মানুষ হাঁপায়?

—সুখ? ও? আ—ছি ছি! তুমি একমুঠ ছাই ধরেছো সুন্দরীদি।

দুজনে আর কথা না ব'লে হাঁটতে লাগলো। সুন্দরীকে যেন বিবর্ণ দেখালো। সুন্দরী বামনির বাড়ি এসে পড়েছিলো। বাড়ির দরজায় তার ফুটফুটে ছেলেটি আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে। বোঝা যায় স্বামীও আছে কাছাকাছি। সুন্দরী তাড়াতাড়ি এগিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলো। একটু বেশি জোরে। তার মনের ভিতরে যেন একটা কবিতা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে।

প্রথমা ঝি ভাবলো—না তার ছেলে খেতে পারে না। তার দাঁত ওঠেনি। অন্যান্যেরা প্রায়ই লোভের জিনিস এটা ওটা ছেলেমেয়ের নাম ক'রে চেয়ে নেয়। আঁটকুড়ি ব্রজবালার কথা সকলেই জানে। স্বামীর অসুখ বলে তো সে রানীমার মঞ্জুরীই নিয়ে রেখেছে—মাছটা, দুধটা, ভালো খাবারের একটু বেশি বাড়িতে নিয়ে যাবেই। কিন্তু, না, তার স্বামীকেও সে দিতে পারবে না এই কাবুলী মেওয়া। স্বামী তাকে কি ভাববে? চোখে জল এসে গেলো তার। না, শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে একাই খেতে হবে, এখানে অন্ধকার হ'লেও ফেলে দেয়া যায় না। কারো চোখে পড়বে কাল। আর সোয়াদে অমর্ত্য।

কিন্তু তা কি পাপ, যা তার মনে আসছে। সুন্দরীর জিভে পাপ আছে। পরিচারিকা বিবাহিতা। সে জানে পুরুষের কামনা কখনও কখনও একটা কোমল স্নিগ্ধ প্রার্থনার মতো হ'তে পারে। সুকুমার মৃদুভাষী সুবেশ রাজকুমারের যদি তেমন নিঃশব্দ অনুরোধ—পরিচারিকা হাঁপাতে লাগলো। আ—ছি, কিন্তু সে তো পাপ! ছি—ছি, না।

রাজু যখন স্নান ক'রে ফিরলো অন্ধকার গাঢ় হয়েছে বলেই যেন ঘরের দেয়ালগিরিগুলোকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

এখন আলগা জামার উপরে শাল। এখনই স্নান ক'রে এসেছে ঠান্ডায়, মুখটা লালচে দেখাচ্ছে জুলফি দাড়ি সত্ত্বেও। এখন তাকে কি একটু অন্য রকমই দেখায় আটদশ মাস আগে যারা দেখেছে তাদের চোখেও। রগ থেকে চিবুকে নেমে আসা সরু ক'রে কাটা রেশমের মতো দাড়ি যাকে ইম্পিরিয়াল বলে।

রূপচাঁদ এসে জিজ্ঞাসা করলো ডেস্কর আলোটা জেবলে দেবে কি না।

না, বলে রাজু খাটের দিকে এগিয়ে গেলো। বললো—আর কিছু দরকার নেই এখন।

রূপচাঁদ চলে গেলে সে ভাবলো কিংবা আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হ'লে তার এই কথাটা মনে হলো 'নয়নতারা ফিরেছে।' কথাটার আগে এবং পরে যেন আর কিছু নেই।

ডেস্কের সামনে চেয়ার টেনে সে বসলো। মনে হ'লো তার ভ্রূকুটি চিন্তায় কুটিল হবে, কিন্তু সে হাসলো। দুএক মিনিটেই উঠে গিয়ে পিআনোর ডালা খুলে টুলের উপর বসলো। ডানার ভিতর দিকে বসানো একটা থাপে স্বরলিপি। কয়েকখানা পাতা বার ক'রে কোলের উপর রেখে উল্টেপাল্টে দেখলো। ভাব দেখে মনে হ'লো কোনটাই যেন তার পছন্দ হচ্ছে না। অথচ এগুলো তার খুবই পছন্দের জিনিস।

ব্যাপারটা যেন এই রকম : সদ্যস্নান শেষে শরীর থেকে যে সারাদিনটাকে সে সরিয়ে দিতে পেরেছে সেটাই তার বন, রৌদ্র, জনতা, উত্তাপ, ক্লান্তি, মৃত-হরিণ সব নিয়ে যেন তার শরীরের বাইরে অথচ মনের সামনে এসে পড়েছে। বাজানো যায় পিআনোতে সেই অনুভূতি? এদিকে ওদিকে এ ঘাট ও ঘাটে ঘা দিয়ে দিয়ে সে অন্যমনস্কের মতো শব্দঝঙ্কার তুললো, যার সবটুকু তার নিজের কানেও ধরা দিলো কিনা বলা কঠিন।

তারপর সে কিছু ভেবে স্থির ক'রে নিলো। বেশ কিছুদিন আগে নয়নতারা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, সে বোধ হয় তার কাশী না কোথায় যাওয়ারও কিছুদিন আগে, তারও মাস তিনেক আগে হ'তে পারে। সে তখন বাজাচ্ছিলো। স্বরলিপির পাতাগুলো আবার কোলের উপরে নামালো সে। উল্টে উল্টে দেখতে দেখতে সেই ঝঙ্কারগুলো যেন স্মৃতিতে ফিরলো, পাতাখানাও খুঁজে পেলো সে। ডালার খাঁজে পাতাখানাকে বসালো ডাইনে থেকে বাঁয়ে চেয়ে যেন সবগুলি ঘাট দেখে নিলো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত।

বাজাতে শুরু করলে অবশ্য সমস্ত মনটাই বাজনাতে রাখতে হয়। প্রায় মুখস্থই পাতাখানা, তা হ'লেও পিয়েত্রো যা বলেছিলো তাও মনে আছে : 'এ'দের সম্বন্ধে কখনই অতি-সাহস দেখাবে না; তা হেন্ডেল, অথবা ব্যাখ্ যেই হোন। নোটেশন সামনে রাখা চাই।'

চারদিক স্তব্ধ। পিআনোর সুর সে স্তব্ধতায় অনেকটা দূরে দূরে ছড়ায়। কেউ যদি অনুমান করে রাজবাড়ির বাইরে দেওয়ানের কুঠিতে ব'সে হরদয়ালও তা শুনতে পাবে কিংবা পাচ্ছে তা হ'লে সে অনুমান অন্তত অযৌক্তিক হবে না।

রূপচাঁদ রাজকুমারের ঘর থেকে বেরিয়ে রানীর মহলের দিকে চললো। ঠিক এখন আর তার কোন কাজ নেই। তা ছাড়া কেউ তাকে কিছু করতেও বলেনি। তবু পায়ে পায়ে সে রানীর ঘরের দিকে এগোলো। চলতে চলতে তার মনে হ'লো একটা কাজ সে করতে পারে—নয়নঠাকরুনের সঙ্গে দেখা হ'লে তাঁকে খবর দিতে পারে রাজকুমার শিকার থেকে নিরাপদে ফিরে এসেছেন।

দুটো অলিন্দ যেখানে মিশেছে সেখানে তাকে থেমে দাঁড়াতে হ'লো। রানীমার ঘরের থেকে একটা আলোর বৃত্ত দরজার বাইরে এসে পড়েছে। এদিকে পাশে সিঁড়ির উপরে বড় হিংক্‌সের লণ্ঠন। সে আলোও একটা বৃত্ত তৈরি করেছে। বৃত্ত দুটি যেখানে পরস্পরকে ছেদ করেছে সেখানে একটু আগে পিছে তিনজোড়া পা লক্ষ্য করলো সে। আলো বড়জোর হাঁটু পর্যন্ত উজ্জ্বল। উপরের দিকে তিনজনেরই প্রায় একই রকম চাদরমোড়া ঘোমটাদেয়া আকৃতি। কিছু যেন রঙের তফাত চাদরে—তার কোনটি কাশ্মীরি শাল, কোনটি আলোয়ান তা ধরা যায় না।

রানী বললেন, (অনেক দূরে থেকেই এই গলা রাজবাড়ির লোকেরা ঠাহর করতে পারে, যদিও তা কখনই উঁচু নয়।)—নয়ন, ইচ্ছা তো একটা শক্তি, তোমার কি মনে হয় যে অন্যের যা আছে তার উপরে লোভ থেকেই ইচ্ছার জন্ম, আর অন্যের যা আছে তা না দেখলে লোভ

জন্মায় না?

রানীমা বোধ হয় হাসলেন নিঃশব্দে। রূপচাঁদ আন্দাজ করলো, নতুবা নয়নঠাকরুনের হাসি শোনা যেতো না। উঁচু গলার না হ'লেও কথায় হাসি জড়িয়ে থাকলে তা বোঝা যায় বৈ কি।

—আমি কিন্তু সব ইচ্ছাকেই পরশ্রীকাতরতা বলি নি। তা ছাড়া সদর দরজার পুরনো চেহারা ভেঙে নতুন নকশায় যা হচ্ছে তাতে অন্য কারো মিনারওয়ালা সিংহশোয়া দরজা দেখে আপনার লোভ এমন নাও হতে পারে। কবি-কল্পনা বলে কিছু আছে। যদিও দুপুরের খাওয়ার যে বর্ণনা শুনলাম হয়তো একদিন আমাদের সেসব নানাবিধ মদ্য ও খাদ্যে লোভ হ'তে পারে।

রানী হেসে বললেন,—দুষ্টু মেয়ে, তোমার কথায় মনে হবে লোভ যখন অসমর্থ তখন তা পরশ্রীকাতর হ'য়ে পড়তে পারে। কিন্তু নয়ন, সত্যি ভেবে দেখো কথাটা—কতটা আমাদের সত্যিকারের অভাব আর কতটুকু তা বণিকের তৈরি।

—রানীমা, হিংক্‌সের হারিকেন দেখা দেবার আগেও আলোর অভাব ছিলো। তা হয়তো প্রদীপ মশালে মিটতো। কিন্তু হিংক্‌সের হারিকেনে যদি তার চাইতে ভালো মেটে তা হ'লে বণিককে দোষ দেবো কেন?

রানী বলতে শুরু করলেন,—সত্যিকারের অভাবটা হবে সত্যিকারের মানুষটার। তাঁর তেমন চোখ নেই যে প্রদীপ আর লণ্ঠনে তফাত বোঝে। কিন্তু হঠাৎ এক কৌতুকবোধে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন,—জানো, নয়ন, কায়েতবাড়িতে নাকি নকল পাথুরে তৈজস ব্যবহার হবে। নাকি চীনামাটি বলে। বিলেতে নাকি তৈরি। শুনে নায়েবমশাই খোঁজ করেছিলেন রুপোর কিছু তৈজস দরকার হ'য়ে থাকে। দূর করো। রুপোর দামেই নাকি সেসব চীনামাটি।

রানীর অন্য সঙ্গিনী বললো,—আপনি তো হাসতে হাসতেই মঞ্জুরি দিলেন।—ওটা আমরা আলোচনা করি না, ব'লে রানী আবার হাসলেন। বললেন আবার,—যাক্‌গে, খুব কথা তুলেছো, নয়ন, পারো তো দু-একদিনের মধ্যে আবার এসো। তোমার বিদেশবাসের গল্পই শোনা হয়নি। সাবি, তুমি কি একা পারবে নয়নকে পেঁ'ছে দিতে? আচ্ছা, না হয়, রূপচাঁদকে দেখো। আমরা এখানে দাঁড়াই।

রূপচাঁদ খুক ক'রে কাশলো। সাড়া দিলো সে এসে পড়েছে। হিংক্‌সের লণ্ঠনটা যে নয়নতারাকে বাড়ি পেঁ'ছে দিতে তা বোঝা গেলো।

রূপচাঁদ আগে আগে চললো। এই সময়ে কথাটা তার অনুভূতিতে এসেছিলো। একটু পরিবর্তন হয়েছে। আগেও নয়নঠাকরুন ঠাকুরানীদের মতোই ছিলেন। কিন্তু যেন ঘরোয়া, লক্ষ্মীঠাকরুন যেন। আসলে হয়তো এখনও তেমনি মিষ্টি ক'রে হাসেন। কিন্তুক চেহারা হাল্কা হ'লে কি হয় যেন চালির মধ্যে দুর্গা হেন ভারিক্কী। হয়তো এ কয়েক মাস ছিলেন না ব'লেই ধরা পড়ছে। কতকটা যেন রানীমার মতো হ'য়ে উঠতে লেগেছেন।

রাজচন্দ্র বললো,—কেট, ডার্লিং, রবিবার কথাটা শিখলাম তোমরা গ্রামে আসার পরেই। জানলাম সেটা সপ্তাহের প্রথমে না এসে শেষে আসে বিশ্রামের দিন হয়ে। কিন্তু হায়, দেখো, রবিবারেই তোমার কর্তা কর্মব্যস্ত।

—আপনার কি কাজ ছিলো, রাজকুমার? কেট বললো।

—রাজকুমারের কাজ থাকে এ সংবাদ তোমাকে কে দিয়েছে মনস্বিনী?

গড়ানে ডেস্কের উপরে একগোছা খবরের কাগজ। রাজচন্দ্র কাগজের গোছাটাকে কোলের

উপরে তুলে নিয়ে এবার ডেস্কের উপরে জুতো সমেত পা তুলে দিয়ে বসলো।

স্থানটা হেডমাস্টার চন্দ্রকান্ত এন্ড্রুজ বাগচীর বসবার ঘর। তখন রবিবারের সকাল আটটা হবে।

কেট বললো হেসে,—ওটা কি সম্বোধন হলো?

—কোনটা? মনস্বিনী? ওর মানে তুমি এক মনের অধিকারিণী। রূপসী বলে সম্বোধন করলে কেউ আপত্তি করতে পারে, তাই মনকে সম্বোধন। কিন্তু এই কাগজগুলো কি? কিই বা লেখে তা বলো বরং।

কেট সেলাইএর ঝুড়িতে উল কাঁটা রেখে রাজুর দিকে চাইলো। সে উঠে রাজকুমারের কাছে এসে দাঁড়ালো। ঠিক এই সময়ে সদরদরজায় বাঁধা রাজকুমারের ঘোড়া হ্‌'উই করে নাক ঝাড়লো। তার সাজ-লাগামের মৃদু শব্দ উঠলো।

তা শুনে হাসিমুখে বললো কেট, কি চঞ্চল।

রাজকুমারের দিকে চেয়ে তার কিন্তু একটু অবাক লাগলো। মাস ছয়েক পরে সে আবার রাজচন্দ্রকে দেখছে কাছে। ইতিমধ্যে বোধহয় সে আর একদিনই দেখেছিলো তাকে জানলায়। পথের ধার ঘেঁসে কি যেন ভাবনা নিয়ে চলেছিলো রাজকুমার। অন্যদিকে, রাজচন্দ্র নিজে কেটদের বাড়িতে না এলেও বাগচী এ ছ-মাসে অনেকদিনই রাজবাড়িতে গিয়েছে সন্ধ্যায়। তার অনেকগুলিই রাজকুমারের বৈঠকখানায় কেটেছে তা কেট জানে। কথাটা এখানে এই: কিছু সময়ের ব্যবধানে দেখে অবাক লাগছে আজ। পাহাড়ী শহরে হাওয়া বদলে এলে পরিচিত লোককে এমন দেখায় নাকি? গাঢ় হয়েছে রংটা। সরু জুলফি দাড়ি চিবুকের নিচে ছোট এক ইম্পিরিয়ালে মিশেছে। অনুমান মানুষটিও বেশ কিছুটা উচ্চতায় যেন বেড়েছে। এ সবেরই এই কারণ হতে পারে, যেমন বাগচী বলেছে, যে দিনের বেশির ভাগ সময় রাজকুমারের মাঠে জঙ্গলে কাটে শীকারের খোঁজে অথবা নিছক ঘোড়া ছুটিয়ে।

—কিন্তু এগুলো তো পুরনো কাগজ। বললো কেট,—রাজবাড়ি থেকেই এসেছে।

—তা হ'ক না। কিংবা বলো কি ভাবছো অমন গাল লাল করে?

—কই কোথায়? কিংবা যদি বলি মাস ছয়েক পরে দেখছি, এখন রাজকুমারকে আরও সুন্দর দেখায়। কিন্তু এখন কাগজ থাক। তার চাইতে বলুন কর্তার খোঁজ কেন?

—এই দেখ, পুরুষের কত দরকারী কথা থাকে। বললো রাজকুমার। একটু পরেই আবার হেসে বললো, তাই বলে তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এখন এখানে নিছক আড্ডা।

—সে তো রোজ সন্ধ্যাতেই হয়।

—রোজ নয়, সুভগে, মাঝে মাঝে বলতে পারো।

—রোজ হলেও আপত্তি নেই। কর্তা যদি আপনার সঙ্গে সন্ধ্যা কাটান। কিন্তু আমার খুব জানতে ইচ্ছা হয় কি করেন আপনারা আড্ডায়।

রাজু হাসলো,—তবে বলতে পারো খুব ভালো ক্লারাট আর সত্যিকারের টার্কিশ। অথবা তোমার জানাই ভালো কর্তাকে তোমার বিপথে নিচ্ছি না। আপাতত পিয়েত্রোর স্বজাতি অর্থাৎ ফরাসীদের সম্বন্ধে কিছু জানার চেষ্টা চলছে। ভারি কৌতুকের, জানো? পিয়েত্রো ফরাসীদের সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে বলতেন কিন্তু যাকে ফরাসীদের বিদ্রোহ বলে সে সম্বন্ধে দেখছি বিশেষ কিছুই বলেননি।

—আপনার কি সে সব গল্প ভালো লাগতো? অত রক্ত আর শানানো গিলোটিন?

—তা জানতে পারলে গল্পটা অত করে শোনার দরকার হতো না। আমার তো মনে

হয়েছে ওটা এক ধরনের ব্যর্থতা। কিছু পুরনো ধারণা বদলেছে। রাজাকে বরতরফ করে ওরা বুঝতে চেয়েছিলো রাজা আর ঈশ্বর এক নয়। কিন্তু তা বুঝতে অত নরহত্যা দরকার ছিলো না। পিয়েত্রো এজন্যই বোধহয় আলাপে আনতো না ওটাকে।

একটু ভেবে আবার বললো রাজচন্দ্র,—কার কোন গল্প ভালো লাগবে তা কি আগে বলা যায়? বেশ লাগে তোমাদের রাজা চার্লসকে। তোমাদের রাজা চার্লস আর ফরাসীদের সেই সব মার্কুইস, কাউন্ট কেউ মৃত্যুভয়ে কাঁদেনি বলেই ভালো লেগে থাকবে আমার।

কথাটা শুনে কেট অবাক হয়ে গেলো।

রাজু বললো,—তুমি নিশ্চয়ই জানো রানী মারিকে ওরা যখন নিয়ে যাবে গিলোটিনে তখনও কিন্তু তিনি তাঁর সাজপোশাকে ত্রুটি করেন নি। তাঁরা কেউ কিন্তু বলেন নি যা করেছি ভুল করেছি। সূর্য-ডোবার মতো ব্যাপার নয়? তেমনি ম্লান হয়ে যাওয়া অনেক রঙের মধ্যে। কোন অনুতাপ নেই।

—আজকাল কি এসবই আড্ডার বিষয় নাকি আপনাদের?

—বিষয়টা দুপক্ষের জানা না থাকলে কি আলোচনা হয়? বাগচী বলেন, আমি শুনি। এলোপাথাড়ি প্রশ্ন করে কখনো তাঁর অসুবিধা ঘটাই। ভেবেছো তাঁর সঙ্গে আমার মত মেলে? তাঁর কাছে সব ব্যাপারটাই খারাপ। মানুষকে সমাজের চাপে বিকলাঙ্গ করে দেয়া হয়েছিলো তারা যখন চাপ থেকে বেরিয়ে এলো তখন তাদের স্বভাবতই বিকলাঙ্গ সুতরাং কুৎসিতই দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু ভেবে দেখো তোমাদের রাজা চার্লস ফরাসীদের রাজা লুই আর এদেশের রাজা বাহাদুর শা'য়ে মধ্যে কত তফাৎ। শুনেছি সে বুড়ো। জীবনভোগ করার কোন ক্ষমতাই আর নেই। কিন্তু মরতে জানলো না, ছি।

কেট বললো,—তিনি কি কৌশলে আবার ক্ষমতা ফিরে পাবেন এমন আশা করেছিলেন?

—অবশ্য একা বাহাদুর শা নয়। অনেক নকল নবাব, অনেক নকল রাজা কেউ এ শহরে, কেউ অন্য শহরে বৃত্তিভোগ করছে।

—যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই। হেরে গেলে কি করা যায়?

—ও হরি, কেট, তুমি রীতিমত মেয়েমানুষ। রাজু হেসে উঠলো, রাজা সন্ধি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে বন্দী করতে দেবে কেন? তাও ব্যবসাদারদের বেনিয়ানের মতো বৃত্তিভোগ করতে?

কেট বললো,—বুঝতে পারছি বাহাদুর শায়ের উপরে আপনার ভয়ানক রাগ।

—যথেষ্ট, যথেষ্ট, হাসি হাসি মুখে বললো রাজু,—মাঝে মাঝে বরং মনে হয়, অনেকদিন থেকেই মোমভরা নকল মোতির মতো নকল বাদশা ছিলেন দিল্লীর ভদ্রলোকেরা। যেমন অন্য কেউ নকল রাজকুমার থাকতে পারে।

কেট রাজুর মুখের দিকে চাইলো। শেষ কথাটায় কি গলার স্বরও বদলালো রাজুর।

কিন্তু তখনই আবার বললো রাজকুমার,—অয়ি স্বর্ণলোচনে, কিন্তু গৃহকর্তা যখন আসছেন না তোমার হাতের সেবা নিয়েই তুষ্ট থাকবো। রাজকুমার তো বটি। এসো এই কাগজটা পড়ো, নয় পিআনোর টুলে যাও, অথবা কি যেন সেই উষ্ণ পানীয়, কফি নয়?

কেট হেসে বললো,—সবই হবে রাজকুমার, এই বলে সে ত্বরায় কফি আনতে গেলো।

কেট যতক্ষণ কফি করে আনতে গেলো রাজু উঠে পায়চারি করছিলো। বাগচীর টেবলে এবং শেল্ফে অনেক বই। রাজু হাত দিয়ে না ছুঁয়ে দেখলো। বাংলা হরফের বইও আছে। তার একবার ইচ্ছা হলো উল্টেপাল্টে দেখে কি আছে এসব বইএ। এতসব লেখা একি বর্ণনাই শুধু,

শুধু সংবেদন না অন্যের মতামত। অন্যের মত বললেই কি বাসী মনে হয় না? কলকাতায় যে নানা মতের প্রচার চলেছে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিলো—তখন হঠাৎ মনে হয়েছিলো রাজুর —কি আশ্চর্য সকলেই যেন নিজের মত দিয়ে সত্যটাকে ঢাকতে চায়।

সে সব মত দিয়ে জীবনের কোন গূঢ় সূত্র খুঁজে পাওয়া দূরের কথা, নিজের চার-পাশটাকেও চেনা যায় না। তার ভাবতে ইচ্ছা করে, গভীর ভাবে অনুভব করতে ইচ্ছা করে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজকুমারের জন্য কফিসেট সাজিয়ে আনলো কেট।

রাজু চেয়ারে বসলে কফি করতে করতে সে ভাবলো ভাগ্যে কফিটা সকালেই ভাজা হয়ে-ছিলো। বললো,—আপনি বাহাদুর শা হলে কি করতেন, রাজকুমার? আচ্ছা, এখন এত সকাল, আপনার ছোট হাজিরা হয়েছে তো? কিংবা রাজকুমার বাহাদুর শা একা কেন? নেপোলিওন কি বন্দী-দশা স্বীকার করেননি?

—যা প্রমাণ করা যায় না বলে লাভ নেই। আমি হয়তো বাহাদুর শায়ের চাইতেও নিরেস কিছু করতাম।

—কিন্তু এরকম প্রবাদ আছে বাঁচতে সবাই চায়। যুদ্ধক্ষেত্রে যার বুকে গুলি লেগেছে সেও। কেট হাসিমুখে আলাপটা চালিয়ে গেলো।

পেয়ালা হাতে নিয়ে রাজু বললো,—প্রবন্ধটা শুনলাম, কিন্তু তার যুক্তিতে আমার সন্দেহ আছে কেট। আঘাতটা যার সত্যি ভয়ংকর তার সেই অবস্থায় সে বোধ হয় বাঁচা-মরার কথা ভাবে না। হয়তো জল চায় সেটা শরীর; হয়তো বলে শীত লাগছে, সেটা শরীর। বর্তমানটাই তখন তার কাছে প্রবল যদি তার চিন্তা করার ক্ষমতা থাকেই। কেট বললো,—রাজাও তো মানুষ। তারও শরীর আছে। তারও তো ব্যথা লাগে।

—ও হরি! এতদিন তুমি তাই জেনেছো? রাজা একটা ধারণামাত্র, তার শরীর কোথায়? সব রাজা জানে না, কিন্তু জানা তো উচিত যে অনেকগুলি মানুষের স্বাধীনতার ধারণা; শক্তির ধারণা। সেটা গেলে রাজাই বা কোথায়? শরীরটা? তোমাকে একটা খুব গোপন কথা বলে দিই। তরকারি কাটতে কখনও আঙুল কেটেছো? কিংবা রান্না করতে আঙুল পুড়িয়েছো? গলা কেটে গেলে তার চাইতে বেশি যন্ত্রণা হয় না। বরং তখন যন্ত্রণার নিবৃত্তি। আসলে সবার জন্যও প্রস্তুত এমন মন তৈরি হওয়াই কথা। কিন্তু তাই বা কেন? সকলে কি চায়, আর রাজা কি চায় তার মধ্যে পার্থক্য থাকবে না? সারা জীবন সকলের থেকে পৃথক আর মৃত্যুর সম্মুখে একাকার তা হয় না, হলে অন্যায় হবে।

রাজুর হাতে কফির কাপ, সামনে কেট, রবিবারের আবহাওয়াই। তবু মুখটা এমন দেখালো রাজুর যে অনুমান হবে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

কেট বললো,—এটা একটু খেয়ে দেখবেন? এই বলে সে নিজে হাতে একটা প্যাস্ট্রি তুলে রাজকুমারের হাতে দিলো।

বললো আবার,—শুনেছি লুই-এর রাজত্বে প্রজার কষ্টের সীমা ছিলো না। জনসাধারণ অত্যাচারী রাজার বদলে নিজেদের শাসন চাইছিলো।

—তোমারও তাই মত? কিন্তু বলো তো আবার নেপোলিওন অত সহজে সম্রাট হলেন কি করে? তাঁর অধীনে যুদ্ধ করতে গর্ববোধ করেছিলো তারাই যারা ব্যাস্টিল ভেঙে-ছিলো। সেই প্রজাদের অত্যাচারী একদলকে সরানোর ইচ্ছা ছিলো। তাদের দোষ দেয়ার কিছু নেই। তাদের নিশ্চয় নিজের ইচ্ছাকে কাজে লাগানোর অধিকার আছে। অত্যাচার তাদের অমানুষের স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলো তাদের ঘৃণায় হিংসায় রাক্ষুসে চেহারা ধরা পড়েছিলো।

কিন্তু সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। অন্যপক্ষ কি করেছিলো, যা করলে তাদের মানায় তা করেছিলো কি না আমরা এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম। রাজা চার্লস মরতে জেনেছিলো তা মনে করো আবার।

—তা হলে কি বলবো নেপোলিওন চার্লসের চাইতে ছোট ছিলেন?

—দেখো একটা খটকা আছে। তিনি একবার যেমন নির্বাসন থেকে প্যারিসে ফিরেছিলেন শেষ পর্যন্ত আবার তেমন ফেরার আশা করেছিলেন হয়তো। ওদিকে ইংরেজরা যে তাঁকে সেঁকো বিষ দিচ্ছে তা জানতে পারেন নি। আমার মনে হয় ইংল্যান্ডে তখন রানী না থেকে রাজা থাকলে এমন কান্ডটা ঘটতো না।

—কি সর্বনাশ!

—কোনটি? সেঁকো বিষ, না মেয়েলি চক্রান্ত? দেখো সেঁকো বিষের কথা বাগচী বিশ্বাস করেন না। আমি করি কারণ পিয়েত্রো বলেছে বলেও বটে। রাজু হাসলো। বললো, আবার,—দূর করো ইতিহাস। তুমি কি মনে করো আড্ডাটা আমাদের পাঠশালা? সেখানে ক্লারাট নেই? আর এখানে তুমি ক্লারাট-গ্লাসের চাইতেও মনোহরা, তোমার কফি এবং পিঠেও। তুমি বোধ হয় পিঠে খাওনি। এই শীতকাল, নয়নতারার এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। তুমিও তাকে কফির প্রণালী শিখিয়ে দিতে পারো। শুনেছো কি তিনি গ্রামে ফিরেছেন?

—এসেছিলেন। দেখা পেয়েছি। আর একটু কফি দিই?

—অবশ্যই নয়। বরং ডেস্কে চলো। তোমরা কি ভেবে দেখো না, কারোই দৃষ্টি নেই যে। কিছুদিনের মধ্যেই এ গ্রামের বইপড়া লোকেরা তোমার স্বামীর স্কুলের কল্যাণে অনায়াসে আমাকে মূর্খ বলতে পারবে। কাগজ পড়তে না চাও, তোমাদের সেই লাঞ্চোর গল্প বলো। বুঝতে পারছি তুমি আমার প্রেমিকা নও।

—তা আমি জানি। কেট বললো,—নতুবা নয়নঠাকরুন যতদিন ছিলেন না তখন অন্তত একবারও দেখা পেতাম। বরং উল্টো। তিনি এসেছেন তাই।

কেট হাসলো। হাসতে গিয়ে কি তার গালে রং লাগলো। আর সে জন্যই যেন এক মুহূর্ত আগে সে যা ভাবছিলো তা মিথ্যা হয়ে গেলো। সাধারণত চিন্তাটা মাতৃভাষাতেই হয়। হঠাৎ কথাটা মনে এসেছিলো কেটের নিজের ভাষাতেই—সিড্ অব ডেথ। এখন আবার রাজকুমারের মুখের দিকে চেয়ে তার মনে হলো তা কি হয়—মৃত্যুর বীজ কি এমন একজনে লুকিয়ে থাকে?

রাজচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্কের দিকে গেলো।

কেট তখন ভাবলো পরের ভাবনাটা। এই যে রাজকুমার বললেন লেখাপড়ার কথা—এর মধ্যে সত্যি কি গ্লানি আছে? গ্রামের কথাই নয়। কলকাতা সমেত গোটা দেশটাকে একটা সমাজ মনে করলে আধুনিক মানুষদের বই পড়াটাই একটা লক্ষণ। রাজকুমার পড়েন না।

—আচ্ছা, রাজকুমার, এই বলে সে থামলো। কথাটা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলো, সুতরাং একটু চেষ্টা করে হেসে বললো, আর কি বলবে আমার স্বামীর ছাত্রেরা?

ডেস্কের সামনে দুখানা চেয়ারে বসলো দুজনে।

—তুমিই বলো কি বলতে পারে তারা?

—কি বলবে, রাজকুমার, জমিদার।

রাজচন্দ্র ভাবলো কেটের জানার কথা নয় জমিদার, জাগীরদারে কি তফাৎ থাকতে পারে,

আর এখন তফাৎও নেই। এ ভাবটাকে বরং তাড়াতাড়ি অন্য কথার আড়ালে ফেলে দেয়া ভালো।

সে বললো,—বেশ, বলুক। এখন তুমি বলো লাণ্ডো কাকে বলে।

—আ, রাজকুমার!

—ঠিক বলি নি তবে? আমার কি হবে? ওদিকে শুনছি কলকাতায় যেতে হবে যেখানে নাকি ওসবই ব্যবস্থা। আমার অবস্থাও দেখছি তা হলে ডানকানের মতোই। সে শুনেছি মনোহরকে মানোআর, কালীমাঈকে কুল্লিমাদার, বাঈকে পাই বলে।

—কিন্তু ঠিক শিখলেই বা দোষ কি? কথাটা লাণ্ড আর এটা ডেস্কো নয় ডেস্ক।

—আর এই কাগজটা টাইমেস্ নয় টাইমস্। অগ্রসর হও। কিংবা থাক। লাণ্ডোর বয়ান আমাকে শুনতেই হবে, আর তা রানীমার পাশে বসেই। দু-দুবার বড্ড বেশি হবে। কাগজটাই পড়ো।

—কিন্তু কাগজটা তো অনেক পুরনো।

—হায়, বরাননে!

কাগজটা টাইমসই বটে। কেটের বাড়িতে নতুন। হরদয়ালের কাছে থেকে কালই মাত্র সংগ্রহ করেছে বাগচী। এবং তার মূলে লাণ্ডে কীবলের আলাপ। অন্যদিকে কাগজের তারিখটা ছ মাসের পুরনো। ইংল্যান্ড থেকে আসতেই তো সময় নিয়েছে।

এখানে একটা চমৎকার যোগাযোগের ব্যাপার ঘটে গেলো। কাগজের প্রথম পাতার ডানদিকে বিশেষ টাইপে একটা সংবাদ। রাজচন্দ্র আঙুল দিয়ে সেটাকে দেখিয়ে বললো,—এখানে নিশ্চয় কিছু মজার খবর থাকবে। ফ্লোরেন্সের খবর নাকি? বাগচী বলছিলেন ফ্লোরেন্স নাকি ভাস্কর্যের পীঠস্থান। সেটা কি ইংল্যান্ডের কাছে? নাকি নাইট্ইনজেল। দেখো দেখো ঠিক পড়লাম নাকি।

কেট রাজুর কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে কাগজ দেখতে সুরু করলো। সংবাদটা পড়তে গিয়ে সে অবাক হলো। নামটা সেও এই সেদিনমাত্র শুনেছে কীবলের মুখে। কাগজ খুলে তারই সংবাদ পাওয়া যাবে ভাবতে অবাক লাগে না? ফ্লোরেন্সের খবর নয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের। অন্যদিকে এতে বিস্ময়ের কি বা আছে। প্রায় ছ মাসের কাগজ একত্রে। তখনকার ইংল্যান্ডে দুমাসে একবারও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সম্বন্ধে ছোট বড় কোন সংবাদ থাকবে না এমন সম্ভব ছিলো না।

—লও, পড়ো বলে রাজু কাগজটা কেটের হাতে দিলো।

কেট কাগজ নিয়ে চেয়ারে বসে পড়লো। অবাক হলে যেমন হয়, মনে মনে পড়তে ভুলে গেলো। প্রাপোজ্যাল ফর অপনিং এ ট্রেনিং স্কুল ফর নার্সেস অ্যাট সেন্ট টমাসেস হসপিট্যাল। (সেন্ট টমাসের হসপিট্যালে নার্সদের জন্য ট্রেনিং স্কুল খোলার প্রস্তাব।)

বাংলায় বলো। বললো রাজু।

কেট পড়ে বাংলায় অর্থ করে সংবাদটাকে এই রকম দাঁড় করালো। ক্রিমিয়ার অভিজ্ঞতার পর এই ধরনের প্রস্তাব যা মিস নাইটিঙ্গেলের দূরদৃষ্টি ও সাহসিকতার পরিচয় এবং একমাত্র তার কাছে থেকেই আশা করা যায়, তাকে ইতিমধ্যে কার্যকরী হয়েছে মনে করতে হবে। এ বিষয়ে এ রকম মনে করা হচ্ছে স্যার সিডনি হার্বার্টের সহানুভূতি পাওয়া যাবে। কবি আর্থার ক্লাপ্ এ বিষয়ে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সেন্ট টমাসের এই ট্রেনিং স্কুল যে গোটা পাশ্চাত্য জগতের হসপিট্যালে নারসিং-এর ব্যাপারে আমূল পরিবর্তন আনবে তাতে সন্দেহ নেই। মে ফেয়ারের এই মহিলার অন্যান্য ব্যাপারে যেমন দেখা গিয়েছে নার্স ট্রেনিং-এর

ব্যাপারেও নিশ্চয়ই অনেক সম্বংশজা কুমারী এগিয়ে আসবেন।

কেট ভাবলো তাহলে কীবল এমন একটা সংবাদই দিয়েছিলো যা একেবারে টাটকা। এবং হয়তো কাল রাত্রিতে বাগচী নিজেই পড়েছে এই কাগজে আর তাকে বলতে ভুলেছে।

রাজু বললো,—কি রকম হলো ব্যাপারটা? নার্স কারে কয়? খুলে বলো।

সংবাদটা কেটকেও ভাবিয়ে তুলেছিলো, সে বললো,—নার্স মানে জানি, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে হতভম্ব করেছে। এসব ব্যাপার ভাবাও যায় না। নার্স মানে শুশ্রূষা করে যে। সম্বংশের এক মহিলার পক্ষে কেন, কোন সৎ মহিলার পক্ষেই কি নিজের বাবা ভাই স্বামী ছাড়া আর কাউকে সেবা করা সম্ভব? বলুন তা যায়? আর তিনি কি না মে ফেয়ারের মহিলা।

—তুমি হয়তো ভুল করছো, কেট, এরা বাবা ভাই ইত্যাদির সেবার জন্যই শিক্ষা নিচ্ছে। কিন্তু মে ফেয়ার কি বিষয়।

—মে ফেয়ার হচ্ছে লন্ডনের সেই পল্লী যেখানে ধনবান ও অভিজাতদের পক্ষেই থাকা সম্ভব। এবং তারা একেবারে ফ্যাশান প্রবর্তক বলা যায়। কিন্তু স্বামিপুত্রকে সেবাই যদি হবে তাহলে যুদ্ধ দপ্তরের কর্তা সিডনি হার্বার্ট কেন এখানে? আর হসপিট্যাল নার্সিং-এর কথাই বা কেন।

কেট কতকটা প্রকাশ্যে চিন্তা করলো যেন। সে ভাবলো আবার কীবল তাহলে উল্লেখ-যোগ্য খবর হিসাবেই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম করে থাকবে। কিন্তু এ বিষয়ে আলাপ এগোলো না কারণ রাজু হসপিট্যাল দেখে নি, নার্স দূরের কথা। কেট রাজচন্দ্রকে বোঝানোর জন্য তুলনা দিলো,—মনে করুন মিস নাইটিঙ্গেল নয়নতারার মতোই একজন রুচিবতী সুন্দরী মহিলা, যাঁর স্যার সিডনি হার্বার্টের মতো একজন শক্তিশালী বন্ধু আছেন।

রাজু হোহো করে হেসে উঠলো। বললো,—তাহলে আমাকেও তো একটা হসপিট্যাল করে দিতে হয়। সেখানে একা ফ্লোরেন্স এখানে তুমি আর নয়ন।

কেট যেন শিউরে উঠলো। তা কি নিজেকে কোন হসপিট্যালে সেবারতা দেখে? সে চিন্তা করলো : দশ বছর আগে যখন সে কনভেন্টে পড়তো তখন মে ফেয়ারের মহিলাদের ফ্যাশনের কথাই আলোচনার বিষয় ছিলো। তাদেরই একজন বিশেষ করে স্যার সিডনি হার্বার্টের মতো একজন যার সহায়তা করে সে কিনা ময়লা সৈনিকদের সেবা করে বেড়াচ্ছে। গুড্ স্যামারিটান বললেই কি সব বোঝা যাবে? ব্যাপারটাকে কীবলের মুখে শুনেও সে এতটা গুরুত্ব দেয় নি। বাগচীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবে এই স্থির করলো সে। কীবল, দেখা যাচ্ছে, একেবারে হালের ইংল্যান্ডের মানুষ।

রাজু বললো,—দেখো আর কি খবর আছে। কি যেন বললে, স্যার সিডনি হার্বার্ট নাকি? তা তিনি আবার কিসের কারবারী? তুলো, না কয়লা?

—সিডনি হার্বার্ট বোঝা যাচ্ছে মন্ত্রী। তা ছাড়া তিনি নাইট; জানেন রাজকুমার আমাদের দেশে নাইটদের কিন্তু খুব সম্মান।

—বটে? আমি শুনছিলাম তোমাদের দেশে কলওয়ালারাও আজকাল নাইট, লর্ড এসব হচ্ছেন।

—বাঃ কলওয়ালা কি মানুষ নয়?

রাজচন্দ্র দুষ্টুমি করে চোখ সংকীর্ণ করলো, বললো,—নিশ্চয়ই, আমারই ভুল। নেপোলিওনও তো একজন সৈনিক ছিলেন মাত্র। তা ছাড়া আমাদের দেশেও এখন অনেক নুনের বেনিয়ান রাজা হচ্ছেন। কলকাতা আর লন্ডনে একই রীতি দেখো। সেখানেও কি

দশশালা হয়েছে?

খবরের কাগজ পড়া আর হলো না। রাজুর কিছু মনে পড়লো যেন। কারে ঝোলানো ঘড়িটাকে বার করে সময় দেখে আবার তা জেবে ঢোকালো। এটা নিশ্চয়ই আগেকার আলাপে একটা ছেদ।

কেট বললো,—আচ্ছা, রাজকুমার, নয়ন ঠাকরুন কি সত্যি কবরেজি শিখতে গিয়েছিলেন?

সে কি নয়নের এই চিকিৎসা-ব্রতকে ফ্লোরেন্সের আধুনিকতার সঙ্গে তুলনা করলো মনে মনে?

রাজু হেসে বললো,—জানি না। হয়তো সটীক অখিল মহাভারত সংগ্রহের চেষ্টাও হতে পারে। তিনি এতদিন যে কোথায় কাটালেন তাও তো কৌতূহলের।

রাজচন্দ্র উঠে দাঁড়ালো। বললো,—ওটা আমারই ভুল, কেট। তুমিই ঠিক বলেছো। বেঁচে থাকতেই হয়। নেপোলিওনও অনেকদিন তাঁর সেই মেঘে অন্ধকার দ্বীপে বেঁচেছিলেন, বন্দী হয়েও, সেঁকো বিষ সত্ত্বেও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াতেও।

আপাতত আমি বিদায় নিচ্ছি, স্বর্ণময়ী, হেডমাস্টারকে বলো আজ যে আড্ডায় কথা ছিলো সন্ধ্যায় তা হবে না। তাই সকালেই মিটিয়ে নিতে এসেছিলাম।

দরজার কাছে কেট বললো—এখন কোথায় যাবেন?

—বিলপাড় থেকে ওদের আসবার কথা। গোটা কয়েক কুমীর নাকি ভারি উপদ্রব করছে। শিউরে উঠলে তো? যদি পাই চামড়াটা তোমাকে উপহার দেবো। এতদিন তো ক্রোকোডাইল নামটাই শুনেছো।

—রাজকুমার, ক্রোকোডাইল মানুষের অপকার করে না?

রাজু হেসে বললো,—শক্ত চোয়ালে দুসারি ছুরির ফলা। সেই চোয়ালে মানুষকে ধরে জলের তলায় নিয়ে গিয়ে শুধু কি চুম্বন করে ভেবেছো?

—বিপদ নয়? বিপজ্জনক নয় কুমীর শীকার?

সদর দরজার আড়কাঠে বাঁধা লাগাম খুলে ঘোড়াটাকে সড়ক অবধি হাঁটিয়ে নিলো রাজু। ঘোড়াটা নতুন। গাঢ় খয়ের রং। আর বেশ উঁচু।

রাজু রাস্তা বরাবর চেয়ে হাসিমুখে ভাবলো, ও ব্যাপারে সে কেটের কাছে ঠকেছে। নির্জন, সবসময়ে মেঘ আর স্যাতসেঁতে আবহাওয়ার একটা দ্বীপের কথাই মনে হলো। নিঃসঙ্গ নয়? খুবই নিঃসঙ্গ নিকটজন কয়েকজন থাকা সত্ত্বেও। কেন ঠিক বলা যায় না বটে কিন্তু বেঁচে থাকতেই হয়। আমাদের চিন্তা ভাবনা সত্ত্বেও, জীবনের যেন নিজস্ব একটা টান আছে। মনে হয় যার জীবন আর যে ভাবে তারা এক নয়।

তার মুখের হাসিটা সরে গেলো।

কেট রাজকুমারের পাশে পথের উপরে এসে দাঁড়িয়েছিলো। এমনটা সে বাগচীর জন্যও পারতো না। (সে অবশ্য এটাকে চিন্তাতেও আনলো না।) ঠিক এ সময়ে সে নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল বোধ করলো। সে রাজকুমারকে কিছুতেই বিপজ্জনক কুমীরগুলো থেকে দূরে রাখতে পারে না। কোন জোরই নেই।

সামনের দিকে চাইতেই সে দেখতে পেলো একজন তাদের দিকে হন্‌হন্‌ করে আসছে। দূর থেকে তাকে ইউরোপীয় পোশাক পরেছে মনে হয়। কারো কারো হাঁটায় এমন বৈশিষ্ট্য থাকে যে তাই তাকে চিনিয়ে দেয়।

কেট বললো,—রাজকুমার, স্কুলের নতুন ইংরেজি মাস্টারমশায় কি আপনাকে শ্রদ্ধা

জানাতে গিয়েছিলো?

রাজুও সামনের দিকে চেয়েছিলো। বললো,—তিনিই তো আসছেন মনে হচ্ছে। এবং যথারীতি খুবই ব্যস্ত।

কেট বললো,—ভদ্রলোক যেন সব সময়েই সময়ের অভাবে বিব্রত।

রাজু হেসে বললো,—দুষ্টু মেয়ে, তা তুমি ওঁকে বলতে পারো—আমার এত সময় আছে, তা থেকে ওঁকে আমি বেশ কিছুটা দান করতে পারি।

রাজচন্দ্র সওয়ার হতেই ঘোড়া চলতে শুরু করলো।

কেট ততক্ষণই দাঁড়িয়ে রইলো যতক্ষণ ঘোড়া এবং সওয়ার অদৃশ্য না হলো। তারপর সে আবার বসবার ঘরেই ফিরলো। এখন তার কাজ আছে বটে—লাঞ্চের যোগাড় করতে হবে। তা হলেও একটু বসে নিতে পারে। উলকাঁটার ঝুড়িটাকে সে কাছে টেনে নিলো। ঠিক তখনই তার মনে হলো কালো নরম কিছু যেন কোথাও লুকনো আছে; কালো নরম কিন্তু ভয়ের। ঠিক কি তা মনে হলো না। অথচ (কেটের ঠোঁট দুটো যেন হাসলো) আজ রাজকুমারকে দেখে চেঞ্জ থেকে ফেরার কথা মনে হলো। ভারি সুন্দর দেখালো না?

মিস নাইটিঙ্গেলের কথাই কি সে ভাবছিলো? সে আর কোনদিনই হয়তো ইংল্যান্ডে যাবে না কিন্তু মে ফেয়ারের এই মহিলার ব্যাপারটা কিন্তু ভারি কৌতূহলের।

আর ওটাও কৌতূহলের—নয়নতারার কবরেজি শিখতে বিদেশে কাটিয়ে আসা। ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য হয় না। মহাভারত পড়া শিখতে? আরও কম বিশ্বাসযোগ্য।

কিন্তু রাজকুমার? (যেন সে ঘোড়া এবং তার সওয়ারকে আবার দেখতে পেলো।) তাঁর কথাগুলো কি আজকের সকালের মেজাজই মাত্র?

এবার তার মনে এলো যা সে যেন মনে মনে খুঁজছিলো। বিষণ্ণ হলো তার চোখ দুটি। সত্যি কি তা মৃত্যুর বীজ হতে পারে? সিড্ অব ডেথ যার ইংরেজি হবে?

কেটের এখন মনে হলো রাজকুমার এখন ঘোড়াতেই চলেছেন বটে, তা কিন্তু পথের পাশ দিয়ে, আর অমন ঘোড়াটাও যেন ধীরে চলেছে।

সেদিন শীকার হয়নি, দিন সাতেক পরের এক সকালে দেউড়িতে বিমলের লোকেরা রাজচন্দ্রর জন্য অপেক্ষা করছিলো।

কিন্তু তার আগে আর একদিন সেই একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক এসেছিলো রাজবাড়িতে।

দুপুরের কিছু আগে পিলখানা তদারক করে রাজু তখন সবেমাত্র ঘরে এসেছে। কি করি কি করি ভাবতে গিয়ে সে নতুন পাইপটাকে দেখতে পেয়ে যখন সেটাকেই অবলম্বন করবে ভাবছে—এমন সময়ে রানী তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

নিজের বসবার ঘরে ছিলেন রানী। রাজচন্দ্র যেতেই তিনি একটু সরে বসে নিজের সোফাতেই পাশের জায়গাটাকে দেখিয়ে বলেছিলেন,—বসো, রাজু।

রানীমার আসনের কিছুদূরে গালিচার উপরে একজন বর্ষীয়সী। রানীমা বলেছিলেন—এই আমার ছেলে রাজচন্দ্র, আমাদের গ্রামের ভাষায় রাজকুমার। কেমন, দেখবার মতো হয়ে ওঠেনি?

অথবা এমন কিছুই বলেছিলেন যদি রাজুর স্মৃতিকে আমরা অনুসরণ করি। রাজু তখন লক্ষ্য করেছিলো রানীর এই আসনটা নতুন। বিঘৎ পরিমাণ সিংহথাবা পায়ার উপরে

নিচু চওড়া সোফা। চাঁপা রঙের উপরে সবুজ তুলোর পাতা ও ফুল আঁকা ছিটে মোড়া। এসব নিয়েই ব্যস্ত হলো রাজচন্দ্রের মন, এবং তখনই যেন এই গুরুতর সিদ্ধান্ত করলো সে এটাও সেই বুড়ো চীনাটার কাজ। কিন্তু ততটা নিচু আসনে রাজুর প্যান্ট পরে বসতে অসুবিধা হচ্ছিলো মনে আছে।

এও রাজুর মনে আছে যে সেই বর্ষীয়সী কপালের উপরে ঘোমটার বাইরে চুলগুলি ধবধবে সাদা, এবং সেই সাদার মধ্যে মোটা করে দেয়া সিঁদুর। আর সে সাধারণের তুলনায় স্থূলাঙ্গী হওয়ায় তার চিবুক বোধ হয় যাকে জোড়া চিবুক বলে তেমন ছিলো। কতকটা ধানরঙের ত্বক্।

সে ঘরে আরও স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলো। তারা বসেছিলো একটু দূরে বরং দেয়াল ঘেঁষে, গালিচার উপরেই, কিন্তু রাজকুমারের দিকে পাশ দিয়ে। ঘোমটায় মুখগুলি আধা-আধি ঢাকা, গায়ে চাদর। স্ত্রীলোক কয়েকটি সুরূপা, তাদের নানা বয়স সত্ত্বেও। বিশেষ করে লক্ষ্য না করলেও তাদের কারো কানের গহনার উজ্জ্বল পাথর, কারো বা কপালের উপরে লতানো চুলের ঝাঁপটা, কারো চিবুকের তিল চোখে পড়া স্বাভাবিক। এরা রাজ-বাড়িতেই থাকে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গণনীয়।

রাজু লক্ষ্য করেছিলো যেন রামধনুরই একটা টুকরো, যা তার জুতোর উপরে, পাইপধরা হাতের উপর দিয়ে সোফায় গিয়ে পড়েছে। সেই বর্ষীয়সী এবং রানী আলাপ শুরু করলেন। রাজু তখন রামধনুর উৎস খোঁজ করলো। এই সিদ্ধান্ত হলো তার, শিলং-এর বেলদার ঝাড়ের কাচে সূর্যের আলো পড়েই এমন হয়েছে।

বোধ হয় রানী বলেছিলেন,—রাজু, তোমাদের স্কুলের নতুন মাস্টারমশাই নিয়োগীর বোন উনি।

রাজু নিজের হাতের পাইপের বউল থেকে ওঠা অলস ধোঁয়াটাকে লক্ষ্য রাখছিলো। আর কি কথা হয়েছিলে সেখানে?

রানী কি বলছিলেন?—ইনি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন একটি। বোধ হয় এমন কিছু বলে থাকবেন। তারপর তিনি বললেন,—তোমার স্নান হয়নি রাজু? হৈম তুমি একটু দেখো তো।

রাজু উঠে এসেছিলো সে ঘর থেকে। তার পিছনে একজন স্ত্রীলোক, নিশ্চয়ই সে হৈম হবে।

নিজের মহলে যাওয়ার অলিন্দ দিয়ে চলতে চলতে রাজু একবার পিছন ফিরে চেয়ে-ছিলো। সে দেখেছিলো স্ত্রীলোকটি পিছন পিছন আসছে। তা হলে এই কি কিছুদিন যাবৎ রূপচাঁদের পিছনে থেকে তার স্নানাহারাদির ব্যাপারে তদারক করছে? সম্ভবত আত্মীয়াদের কেউ। বিধবা নাকি? আচ্ছা সুন্দরী তো!

রাজচন্দ্র স্নানে গেলে সেই দরবার আরও কিছুক্ষণ চলেছিলো। তারই একসময়ে মহিলাদের একজন বলেছিলো, কনের গড়ন কি রকম? বয়স তো ষোল বললেন। আমাদের হৈম, কিংবা নয়নতারা এদের পাশে কি দাঁড় করানো যাবে?

নিয়োগীর বোন বললো একটু ভেবে,—যে বয়সের যা। ষোল বছরের মেয়ের গড়ন হাল্কা হবে এঁদের চাইতে। কলি আর ফুল এক নয়।

—খুব ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ দেখাবে না তো?

—বিদ্যাপতির সেই অল্পবয়সী বালা শুনেছেন তো? রূপ বয়সে বাড়বে।

—রানী বললেন,—আচ্ছা, এখন এই পর্যন্ত। তিনি উঠলেন। বললেন,—নয়ন, তুমি একটু কষ্ট করো, বাছা। এ'র জন্য পালকি যোগাড় করে দাও। আর তারপর আজ তুমি আমার ঘরে খেয়ো। দুপুরে তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রানী চলে গেলে ঘটকীকে নিয়ে নয়নতারা বার হলো ঘর থেকে। দোতলা থেকে এক-তলায় পৌঁছনোর আগেই একজন পরিচারিকাকে দেখতে পেয়ে পালকির ব্যবস্থা করে ফেললো। বলে দিলো, আমরা নিচের হলঘরে দাঁড়াই। পালকি এলে খবর দিও।

পালকি আসার আগে ঘটকী বললো,—দেখুন তো কি কথা। ষোল বছরের মেয়ে যত সুন্দরীই হ'ক, আর এ মেয়ে সুন্দরী কিনা তা আপনারা যাচাই করুন, কিন্তু ষোল বছরে কখনও পঁচিশের রূপ হয়? কথায় বলে কড়ি আর ফুল।

নয়নতারা হেসে বললো, তাতে আর কি হয়েছে? বিয়েতে লাখ কথা খরচ হয় শুনেছি। রানীমার সঙ্গে আপনার পাঁচশ কথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ।

ঘটকী বললো,—আসল ব্যাপার কি টক্‌টকে একটা লাল গোলাপ সব পুরুষের চোখেই পড়ে, তার পাশের ছোট কলিটা তখন নজরে আসে না। কিন্তু আমাদের রাজকুমার তো বছর বাইশ হবেন। ষোলর বেশী কি করে মানাবে তাঁর সঙ্গে? পুরুষের বাইশ আর স্ত্রীলোকের পঁচিশ ছাব্বিশে তেমন তফাৎ থাকে না। কিন্তু পুরুষের ত্রিশ আর স্ত্রীলোকের তেত্রিশ চৌত্রিশ? তখন তফাৎটা আগের চাইতে বেশি মনে হয় না? তারপরেও পুরুষের যখন চল্লিশ তখন চুয়াল্লিশ বছরে স্ত্রীলোক তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সে কি চল্লিশ বছরের পুরুষের কাছে বোঝা হয়ে পড়ে না?

নয়নতারা বললো, এসব আমি ঠিক বুঝি না।

ঘটকী হেসে বললো,—তা হলেও, রানীমা, আপনার কথাকেই মূল্য দেন আমার মনে হয়েছে। কথাটা ভেবে দেখুন। এই হৈম, সুন্দরী, খুব সুন্দরী, আহা বেচারা বিধবা। এমন রূপ রাজকুমারদের পাশেই মানাতো। আমি শুধু মানানোর অর্থে বলছি। কিন্তু এখন থেকে বিশ বছর বাদে চল্লিশ বেয়াল্লিশের আমাদের এই রাজকুমার তো যুবকই থাকবেন কিন্তু হৈমর মতো একজন কি তখন পাঁপড়ি ঝরে যাওয়া ফুলের মতো হবেন না?

যেন নয়নতারার মুখই শুকিয়ে উঠেছিলো। এমন অনুভব করেই সে বললো,—আমি তো বললুম আমি বুঝি না। আর রানীমার কাছে আপনার এসব যুক্তিও আমি বলতে পারি না। এ বাড়িতে তেমন প্রথা নেই।

ঘটকীর কথাগুলি অত্যন্ত হিসাবী, যেন বা দোকানে শোনা যাবে এমন। কিছুদিন আগেও, সেসব গল্প যদি সত্য হয়, ক্রীতদাসী বিক্রি হতো। সেই বাজারে যাদের আনাগোনা ছিলো তারা এমন সব হিসাব করতো কিনা বলা সহজ হচ্ছে না। কিন্তু নয়নতারার মনে কথাগুলি ফিরে এসেছিলো একসময়ে সত্য যেমন রূঢ় হতে পারে তেমন রূঢ় হয়ে। সত্যর মতো এমন রূঢ় আর কি?

সে যাই হ'ক, আমরা রাজকুমারের কুমীর শীকারের গল্প বলতে যাচ্ছিলাম। কেটকে এক রবিবারে যা সে বলে এসেছিলো।

সংবাদটায় ভুল নেই। কাল ডুবো বেলায় বড় কোন মাছকে ধরতেই হোক কিংবা গোরু-বাছুর তাড়া করেই হোক, বিলের একেবারে ধারে এসে পড়েছিলো। বেশ বড় একটা কুমীরই। বিলে মানুষ নামে জলের জন্য, স্নান করতেও; মাছ না ধরলে চলে না; তা ছাড়া গোরুবাছুর

বিলের মাঝে মাঝে জেগে থাকা ডাঙায় চরে যে ঘাস তার লোভে জল পেরিয়ে যাওয়া আসা করে। যা রটেছে তা সত্য হলে পাঁচ-সাতটি গোরুবাছুর খোয়া গিয়েছে ইতিমধ্যে এবং একজন মানুষ।

রাজচন্দ্র কর্মচারীটিকে বললো,—এদের যেতে বলে দাও, জলযোগ করিয়ে দিও। পিলখানায়, পিয়েত্রোর হাতিটাকে দিতে বলো তার মাহুতকে। কাল এসেছে, আজই কাজে লেগে যাক।

রাজচন্দ্র যখন নিজের মহলে ঢুকছে তখন দেউড়ির পেটা ঘড়িতে এগারোটা বাজতে শুরু করলো। শব্দ তার উৎসর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে; কিন্তু ততক্ষণে রাজু যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে দেউড়ি চোখে পড়ার কথা নয়, বরং শব্দটা খুঁজতে গিয়ে একটা টুকরো গোলাপি দেয়াল চোখে পড়লো তার। এটার প্রয়োজনীয়তা কি? এটা ছাড়া কি এতদিন ল্যান্ডিংটাকে ন্যাড়া মনে হতো—এই চৌকোন খাড়া দেয়ালটা ছাড়া? এটা নতুন।

শোবার ঘরে ঢুকলো সে। পেটাঘড়ির শব্দ তাকে অন্যমনস্ক করেছিলো। সম্ভবত সেজন্যই ব্যাপারটা ঘটলো। সে যখন দেয়াল-আলমারি খুলে গুলির বেল্ট একটা বেছে নিয়েছে তখন তার চোখে পড়লো পালঙ্কের ওপারে ফ্রেঞ্চ উইনডোটা খোলা, তার ওপারে ঝুলবারান্দায় কেউ যেন দুহাতে কান চেপে ধ'রে ঘরের দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন ঝি কি? কিংবা হৈম এসেছিলো? এই ভেবে সে চোখ সরিয়ে নিতে গেলো কিন্তু মস্ত এলোখোঁপা, এবং খোঁপার নিচে সাদা ঘাড় তাকে আকৃষ্ট করলো।

রাজু আলমারির পাল্লা বন্ধ করলো। বললো, ও, তা শব্দটা কি এখনও লাগছে কানে?

যে মুখ ফিরালো সে নয়নতারা।

হাসি হাসি মুখে সে বললো, তোমাকে দেউড়িতে দেখেই এসেছিলাম, রাজকুমার। ঝুলবারান্দায় এসে পুকুরে মাছধরা চোখে পড়লো। ঘড়ির ওই রাক্ষুসে শব্দ না হলে পায়ের শব্দ কানে যেতো।

রাজচন্দ্র ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। নিচে খিড়কির পুকুরের জলে নৌকো, জাল টানছে জেলেরা। তীরের গাছগুলোর ফাঁকে রোদ। চিল ও বক উড়ছে, মাছ চমকাচ্ছে, মাছরাঙা ঝুপ্ করে জলে নেমেই উড়ে যাচ্ছে আবার।

সেদিকে পিঠ দিয়ে নয়নতারা রাজুর দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।

সে বললো,—অনেক বেলা হলো। এ পোশাকগুলো এখন পাল্টালে হয় না? তার ভ্রু কুটিল হলো।

—অহো, বিস্ময়! তুমি কি আমার খানসামাকে বরতরফ করেছো, ললনা? কিংবা এই জানলাম সেদিন হৈম নাকি তদারক করে। ইতিমধ্যে সে কোথায় গেলো?

—এটা কি রকম হলো? ডানকানের কাছে গিয়েছিলে নাকি সকালে?

—তার কাছে যাবো কেন? রাজু বিস্মিতই হলো। পরক্ষণেই ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে সে বরং হাসিমুখেই বললো,—তোমার কি ধারণা একজন রাজকুমারকে সেজন্য তার নিজের ঘরের বাইরে যেতে হয়। রূপচাঁদ পর্যন্ত জানে ডানকানটা হুইস্কি আর রম্ ছাড়া কিছু চেনে না।

—তুমি বলতে চাও এমন ভাষাই তোমার আজকাল স্বাভাবিক?

—এই দেখো। রাজকুমারের ভাষা একটু পৃথক হবে না?

রাজু ঝুলবারান্দা থেকে ঘরে ফিরলো। দেয়াল-আলমারিটা খুললো। র‍্যাকের গায়ে

রাখা বন্দুকগুলোর বাড়তি আরও দু-একটা সেখানে। কাগজে কাঠের বাক্সে গুলি। রাজু চামড়ার বেল্টটাকে নিয়ে কিছু গুলি বসিয়ে নিলো তাতে।

পিছন পিছন এসে নয়নতারা রাজচন্দ্রকে লক্ষ্য করছিলো। বললো,—সময়মতো স্নানাহার করাটাকে কি আজকাল অন্যায় মনে হয়?

রাজু বললো, রূপচাঁদ নালিশ করেছে বুঝি? হতভাগাটার বাড় হয়েছে বিশেষ। ভেবেছিলাম ও সঙ্গে যাবে। ওকে না-নিয়ে শাস্তি দিতে হচ্ছে।

নয়নতারা বললো,—তুমি কি শীকারে যাবে এখন? তা হলে কথা ছিলো।

—শীকার থেকে ফিরে এসে তা হয় না?

নয়নতারা ভাবলো। তার হাসি হাসি ঠোঁটের একটা কোণ দাঁতের ডগায় চাপা।

সে বললো,—অনেকদিনের কথা তো, তোমার হয়তো প্রতিশ্রুতিটা মনে নেই।

রাজু একটা বন্দুক বাছাই করে র‍্যাকের কাছে থেকে সরে এসে বললো,—বলো কেকয়-কন্যা কে বনবাসে যাবে?

—সে রুমাল দিয়ে বন্দুকের চোং মুছলো। তেলকালিতে রুমালটা বিশ্রী হতেই এহে বলে রুমালটাকে মেঝেতে ফেলে দিলো।

—নয়নতারা বললো,—আজ আমি শীকারে যাবো।

—তুমি? রাজু হাসিমুখে বললো,—হ্যাঁ, অনেকদিন আগে এমন কথা ছিলো বটে।—হোহো করে হেসে উঠলো সে। সেই পুরনো পরিস্থিতিটাকে মনে এনেই যেন। বললো,—কিন্তু, না আজ হয় না, অন্তত।

—এতে আর এমন চিন্তার কি আছে? টোপর-হাওদা দিতে বলো। আমি রানীমাকে বলে আসি।

রাজচন্দ্র উঠে দাঁড়ালো।

—কিন্তু স্নানাহারও হলো না।

রাজচন্দ্র দরজা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললো,—স্নান সকালেই হয়। আর মাঝে মাঝে একবেলা না-খেলে মানুষের ক্ষতির চাইতে লাভই বেশী হয়ে থাকে।

হঠাৎ একেবারে ঘরটা শূন্য হয়ে গেলো এই অনুভূতি নিয়ে নয়নতারা ধীরে ধীরে রানীর মহলের দিকে চলে গেলো।

পিয়েত্রোর বেঁটে হাতিটাকে ওরা হাওদায় সাজিয়ে এনেছিলো। কিন্তু পাইপ ধরানোর অজুহাতে রাজু খানিকটা সময় অপেক্ষা করলো প্রথমে গাড়িবারান্ডায়, তারপর হাতি যেখানে দাঁড়িয়েছে সেই চবুতরায়। কিংবা রোদটাই কি ভালো লাগলো? অবশেষে সে নয়নতারার চমকে দেয়া শীকারে যাওয়ার রসিকতাটাকে মনে করে হাসিমুখে হাতিকে বসতে বলার ইঙ্গিত করলো। কিন্তু এবার হাতিকেই একটু দেরি করতে হলো, কারণ তখনই অন্দর-মহলের থেকে একটা ছোট পালকি বেরিয়ে হাতির সম্মুখ দিয়ে আড়াআড়ি পার হচ্ছে। এটা সাধারণ পালকি। সাধারণত কোন পরস্ত্রী রাজবাড়ির বাইরে যেতে ব্যবহার করে থাকে। পরে হাতি যখন নিজের পথ নিয়েছে সে ভাবলো একবার এটা কেমন হয়ে গেলো না। নয়ন-তারাকে কুশলপ্রশ্নই করা হলো না। আজই তো প্রথম দেখা হলো কতদিন পরে। কতদিন হবে? গোটা বর্ষাকালটাই নয় কি? এবং শরৎও।

গ্রামের বাইরে এখন ক্রোশটাক পথ চলে এসেছে হাতি। পথটা এখানে ঘুরে গিয়েছে একটা ফলের বাগানকে বেষ্টন করে। বাঁশের অনেক কাণ্ড এদিকে এমন যে হাওদায় লাগছে।

রাজচন্দ্র মাথা নিচু করে চললো। মাহুত ধারালো দা দিয়ে কখনও কখনও পথের উপরে ঝুঁকে পড়া বেয়াড়া কঞ্চি কেটেও দিচ্ছে। ফলের বাগানের বাঁশের বেড়া সব সময়ে রাখা যায় না। গাছ বড় হয়ে গেলে সেটাকে নতুন করে দেয়ার চেষ্টাও থাকে না। বাগানের গাছগুলোর নিচে নিচে বরং পায়ে চলা পথ।

একটা হুঁই হাঁই শব্দ শোনা গেলো একবার। হাতি এগিয়ে চললো। হঠাৎ দেখতে পেলো রাজু বাগানটার পাশ ঘেঁষে রাস্তা যেখানে মোড় নিচ্ছে সেদিকে একটা পালকি বাগানের গাছগুলোর ফাঁক থেকে বেরোচ্ছে। সেই পালকিটাই বটে। ভাবলো রাজু, হয়তো রাজবাড়ি থেকে কেউ ফরাসডাঙায় যাচ্ছে পালকিতে। হয়তো তা রানীর শিবমন্দিরের সংগে যুক্ত কোন ব্যাপারে। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই হাতিকেই থামতে হলো। কি মুশকিল! পালকিটা পথের উপরে নামানো। এমন ছুটে চলেছিলো সেটা যে ইতিমধ্যে শীতের দিনেও গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে বেহারা। একজন তাদেরই পথের ঠিক মাঝখানে হাতিকে দেখামাত্র হাত তুলে দাঁড়ালো।

—কি ব্যাপার? বললো রাজু, যেন বাঘ দেখেছে!

কাছাকাছি এসে মাহুত জিজ্ঞাসা করলো বেহারাটি কিছু বলবে কিনা।

বেহারা বললো,—হুজুরের খাবার আর জল।

—খাবার? কি দরকার ছিলো! রাজু বললো।

বেহারাটির মুখ শুকিয়ে গেলো। মাহুত দ্বিধা করতে লাগলো। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই এরকম ভংগিতে রাজু বললো,—তুলে লও। বেহারা ভয়ে ভয়ে পালকির দিকে এগোলো। আর ঠিক তখনই পালকির দরজাটাও খুললো।

মোটা একটা রেশমের চাদরেই বটে, মাথা, মুখ শরীর ঘিরে ঘেরাটোপের মতোই। কিন্তু নামতে দেখে, দাঁড়াতে দেখে রাজুর সন্দেহ রইলো না। রাজু কিছু বলার আগেই নয়নতারা বললো,—মই আনো নি তো? এখন? নাকি হাত ধরবে?

—কিন্তু

নয়নতারা হাতির গা ঘেঁষে হাত উঁচু করে দাঁড়ালো।

একটু টানাটানি করেই তুলতে হলো। হাতির পিছনের পায়ের উপরে উঠে দাঁড়াতে হলো নয়নতারাকে। পালকি ফিরে গেলো। হাওদার আসনে বসে অবগুণ্ঠন একটু সরালো নয়নতারা। হাসলো। বললো,—বাব্বা, কি ভয় লেগেছিলো!

রাজচন্দ্র বললো,—কিন্তু, নয়ন—

নয়নতারা তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে মাহুতকে দেখালে। যেন সে বলতে চায় লোকটির কান আছে, তা ছাড়াও কৌতূহল সে কানকে বরং সজাগ রাখবে। কিন্তু তখনকার দিনে এমন একটা প্রসিদ্ধি ছিলো যে যখন এরা তাড়াতাড়ি নিজেদের মধ্যে একটু বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে তার সবটুকু বেহারা বা মাহুতরা বোঝে না। আন্দাজ কি করে না? করে, এবং তাতেই তো নানা কাহিনীর সৃষ্টি।

—কিন্তু কিসের? আমি কি এর আগে কোনদিন হাতির দশ হাতের মধ্যেও গিয়েছি? আর এ একেবারে তার গায়ের উপরে দাঁড়ানো।

কথাটা কি সত্য হলো নয়নঠাকরুনের? একবার অন্তত আমরা সেদিনই দেখেছি তাঁকে হাওদায় রানীমার পাশে।

রাজচন্দ্র কিছু ভাবলো।

নয়নতারা বললো,—গল্পটা বলবো? টেনে তুলতে পারবে ভাবি নি।

—তার আবার গল্প কি?

—নয়নতারা একটু হাঁপাচ্ছে। সেজন্য ঠোঁটের ফাঁকেও নিঃশ্বাস নিচ্ছে, দাঁতের নিচে জিভের লাল ডগার আভাস যেন চোখে পড়বে। নয়নতারা বললো,—ঠাকুমাদের মুখে.শোনা। বাল্যবিবাহ খুব খারাপ জিনিস জানো। ছোট ছেলেমেয়েরা ব্রতর কিই বা বোঝে তাই ঠাকুমার দুপাশে বর কনে শুয়ে থাকে। এদিকে তাদের ভারি ইচ্ছা রাতে গল্পটা করে। একবার সারা-দিন দুজনায় পরামর্শ হলো। ধনুকের ছবি দেখেছো? কাঠের দু কোটি উপরের দিকে বাঁকানো থাকে না? গভীর রাতে ছেলেটি ঠাকুমার গায়ের উপর দিয়ে ধনুকের কাঠটি এগিয়ে দিলো। মেয়েটি ধনুকের এক কোটির ভাঁজ নিজের কোমরের নিচে দিয়ে এমনভাবে রইলো যে ভারটা এদিক ওদিক না হয়। তারপর ধনুকের অন্য ডগা ধরে ছেলেটি ধনুক তুলতে শুরু করলো। কপাল আর কাকে বলে! অনেকটা উঠেছে মেয়েটি, আর একটু তুলে ঘুরিয়ে নিতে পারলেই হয়। মচ্ করে একটা শব্দ। ধনুকটার মাঝখানটায় ভেঙে গেলো। ঠাকুমারা এমনি ঠাকুমা হয় না। সবই বুঝলো সে। বললো, 'আউর কুছ দের বা।' এই বলে বুড়ি পাশ ফিরে ঘুমলো।

রাজু অনুভব করলো গল্পটা আশ্চর্য রকমে বলা হয়েছে। এক মুহূর্ত যেন মাধুর্য অনুভব করে পরে সে হাসলো।

নয়নতারা বললো,—ঠাট্টা মনে করলে?

—না।

—কেমন টেনে তোলার গল্প নয়। উদ্বহন।

—সন্দেহ কি? ধনুকের ডগায় কনেকে তুলে আনার শক্তি না হলে বিয়ে হয়নি মনে করতে হবে। কিন্তু নয়ন—

—কি?

—এদিকে দেখো কি করে ফেলেছো!

—বটে? কি এমন?

—কারো হাত যে ভার বইবার মতো শক্ত না হ'ক টেনে তোলার মত শক্ত তা প্রমাণ করে ফেলেছো।

নয়নতারার মুখের খানিকটা রক্তাভ হয়ে উঠলো। তা কি ব্রীড়ায় অথবা অনুশোচনায়? কিন্তু সে ঝটিতি বললো,—সে জন্যই তো ব্রহ্মময়ীর আসা-যাওয়া। কিছু ভেবো না। সে এক ভারি মজার ব্যাপার। জানো ব্রহ্মময়ী কিন্তু বেশ অঙ্কের ধাঁধা বানাতে পারেন।

—অঙ্কের ধাঁধা? কি রকম।

বেশ একটা কৌতুকের ব্যাপার ঘটলো। ঘটকী ব্রহ্মময়ী একটা অঙ্কের হিসাবই বলে-ছিলো বটে। সেটাই মনে এসেছিলো নয়নতারার। যখন সে প্রায় বলে ফেলেছে হঠাৎ সম্বিত পেয়ে থামলো সে।

—কই বললে না?

নয়নতারা তাড়াতাড়ি বললো,—আচ্ছা, রাজকুমার, তুমি যে একবার পিয়েত্রো বুজরুকের সঙ্গে শীকারে গিয়েছিল সে কি এই পথ? সামনে দেখা ঘাসের জঙ্গল। হাতিটাও পথ চেনে যেন। রাতে যেমন ভূতের গল্প এ জঙ্গলেও শীকারের গল্প তেমন।

রাজু বলতে যাচ্ছিলো, বাব্বা, কোথায় ঘটকীর অঙ্কের ফাঁদ আর কোথায় শীকারের

গল্প, কিন্তু ঘাসের জঙ্গলটা তারও নজরে পড়েছে। বুজরুক পিয়েত্রোর সংগে সে শীকারে গিয়েছিলো এমনই ঘাসের জঙ্গল পার হয়ে। সে দৃশ্যটা যা দুটি অত্যন্ত প্রিয় মানুষের স্মৃতিতে জড়ানো তা ভোলার নয় আর এখন তো মনে করাই হচ্ছে। রাজচন্দ্রর উজ্জ্বল মুখের উপরে একটা হাল্কা ছায়া পড়লো যেন।

নয়নতারা বললো,—বাহ্, আমার শীকারের গল্পটা কি হলো?

রাজু বললো,—তোমাকে বরং একটা মজার কথা বলি। জানো নয়ন পিয়েত্রো আর বুজরুক দুজনেই আমার চাইতে বয়সে বড় ছিলেন। সুতরাং তাঁদের কাল আর আমার কাল এক হতে পারে না প্রকৃতপক্ষে। কিন্তু কখনও কখনও মনে হয়—

—কি?

—না, ঠিক বলতে পারলাম না। একালে আমার নিজের ঘরবাড়ি নেই বললে তো ভাষা হয় না।

—বেশ কথাটা তো! নয়নতারা বললো,—দেখো, দেখো রাজকুমার হাতি ডুবে যাচ্ছে এমন ঘাস। গ্রামের কাছে এমন দেখি নি। এমন ঘাস। ধানও হতে পারে তা হলে।

রাজুর দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। সে বললো,—কেন ধান হয় না জানি না। হাত দিও না। ধার আছে। দেখো হাতির গায়ে দাগ পড়ছে। একটু পরে সে আবার বললো,—নিজের কথাই বলছি। নয়নতারা আমি কিন্তু তোমাকে কুশল প্রশ্নও করি নি।

—এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ছে? ধাক্কাটা সামলে নিয়েছো বলো।

—কিসের ধাক্কা? ও! এত গর্ব নাকি রূপের?

নয়নতারা ঠোঁটে আঙুল রেখে চোখের ইশারায় মাহুতকে দেখিয়ে দিলো।

ঘাসের জঙ্গল কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নও বটে। সামনে একটা মাঠ। তাতে ছোট ঝোপ-ঝাড়। একটা ঝোপড়া কাঁটাগাছ। লতা উঠেই যেন তাকে আরও দর্শনীয় করেছে।

রাজু তাড়াতাড়ি বললো,—ওটা কি খদির, কবরেজ মহোদয়?

—খয়ের তাই কি? নয়নতারা বললো,—আচ্ছা, রাজকুমার, না হয় এক কাজ করো, তোমার এদিকের তহশীলটাই না হয় আমাকে পত্তনি দাও। শুনেছি এদিকের তহশীল কাছারী নাকি একটা ভালো বাংলো। সেটাই পত্তনিদারের বাড়ি হতে পারবে।

রাজু বললো,—শুনেছি উচ্চ অভিলাষ নাকি মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি। আমি ভুল করেছি। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিলো এতদিন কোথায় ছিলে, কেনই বা তেমন না বলে চলে গেলে?

—রাজু, মানুষ শুধু শুধু কি বেড়াতে যায় না?

নয়নতারার চোখের কাছে কি ছায়া পড়লো? কিন্তু হাতির চলায় একটা দোলা লাগলো কি না লাগলো, নয়নতারা হাসলো। আর তখন মনে হলো তার মতো চোখকেই খঞ্জন আঁখিও বলা যায়।

সে বললো,—ওটা কি? বিল? কি সুন্দর যে! যদি না হাসো বিল সম্বন্ধে তোমাকে একটা কথা বলি।

রাজু সম্মুখে চাইলো। দিগন্তের নীল রেখাটা যা বনের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আরও বেশি বাঁকা মনে হচ্ছে সেটা মেঘ নয়।

নয়নতারা বললো,—বিল নাকি কচ্ছপের মতো চলে বেড়ায়।

রাজু হো হো করে হেসে উঠলো।

এদিকে বর্ষা নেই তবু কখনও কখনও বিলের জল বেড়ে ওঠে, তা থেকেই মনে হয় বিল গুটি গুটি এগোচ্ছে। তা থেকেই এই প্রবাদ। আসলে হয়তো তার মূলে মরা নদীর খাত বেয়ে উত্তরের বর্ষার জল এসে পড়ার ফলেই।

নয়ন বললো,—রাজকুমার গরম লাগছে।

—তা লাগতেই পারে। এ হাওদাটা মহিলাদের জন্য নয়।

নয়ন এদিক ওদিক চেয়ে একটা বড় গাছ দেখতে পেয়ে মাহুতকে সেদিকে হাতি নিতে বললো। ছায়ায় জিরিয়ে নেয়া দরকার। সেখানে হাতি পৌঁছলে নয়ন বললো হাতিকে বসাতে। হাতি বসলে জানালো তার পিপাসা পেয়েছে। রাজু কিছু বলতে গেলে সে বললো, ভুল যা করেছি করেছিই, তুমি জল না খেলে আমি খাই কি করে?

এটা একটা সাধারণ কৌশল যা মহিলারা অবলম্বন করে। আহার্য ও পানীয় তো রাজ-বাড়ি থেকেই এসেছে। মাহুতকে যথেষ্ট খাবার দিয়ে তাকে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিলো। সে কিছু দূরে আড়ালে গেলে নয়ন বললো,—রাজকুমার বন্দুক ধরে থেকে তোমার হাতে তেলকালি। এসো আমি খাইয়ে দিই।

রাজুর খাওয়া শেষ হলে তবে হাতি উঠলো। মনে হতে পারে এটাই সব চাইতে মূল্যবান —অন্তত এটাই অন্যতম কারণ যার জন্য নয়নতারা আজ শীকারে এসেছে।

ইতিমধ্যে এক কৌতুকের ব্যাপার হলো। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা বিলের বাঁক। তার একাংশ যখন প্রায় দিগন্তরেখায়, অন্য অংশ তখন হঠাৎ একেবারে চোখের সামনে খুলে গেলো। হাওদা পিছন দিকে ঝুঁকেছিলো বলে অনুমান হচ্ছিলো বটে হাতি উপরে চড়ছে, নতুবা ঘাস, কাশ, নল, মাঝে মাঝে শিমুল, বাবলা, ক্বচিৎ অশ্বত্থ হিজল, কদাচিৎ কিছুদূর ধরে বেতজঙ্গল, সব জায়গাতেই হাতির উচ্চতার তুলনায় সমান উঁচু বন।

ডানদিকে গড়ানে জমি শ্যাওলা জমে নি এমন জলের দিকে নেমে গিয়েছে। পারে এক অল্পবয়সী বট, যদি বা মানুষের অনুপাতে তাকে বিশেষ বৃদ্ধই বলতে হয়। বটের একটা ডাল জলের উপরে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। ডালটাকে অতদূর এগিয়ে যেতে দেয়ার সুবিধা করে দিতেই যেন জলের একেবারে ধার ঘেঁষে একটা মাঝারি মোটা বট। এগিয়ে যাওয়া ডালটা থেকেও অনেক ঝুরি জলের উপরে জালের মতো ছড়িয়ে আছে অথচ জল বলেই যেন আরও নামছে না। তেমন একটা ঝুরিতে একটা মাছরাঙাকে দেখতে পাওয়া গেলো। দেখতে দেখতে সোনা লাল সবুজের ঝিলিক দিয়ে এক পাক উড়ে ঝুপ করে জলে পড়ে আবার ঝুরিতে এসে বসলো। তখন দেখা গেলো কালো কালো গলা দিয়ে জল সেলাই করছে অনেক পানকৌড়ি। তাদের কার্যকলাপই ছিলো মাছরাঙার নিশানায়।

নয়নতারা বললো,—এমন সুন্দর দেখি নি।

তার চোখ দুটি ডাগর, তার লাল ঠোঁট দুটি একটু উন্মুক্ত, স্নিগ্ধ হাসিতে তার উজ্জ্বল দাঁতের দু-একটি ডগা চোখে পড়ছে। দেখে রাজুর মনে হলো এমন পাশে থেকে সে নয়নতারাকে কখনই দেখে নি। কি আশ্চর্য!

সে সোৎসাহে বললো,—দেখো দেখো, নয়ন, ডাহুক বোধ হয়, যাদের টিটিভ বলে।

হাতি বিলের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে। যেন একটা পায়ে-চলা পথও আছে সেখানে। অনুমান হয় তা থেকে এদিকে একটা গ্রাম থাকবে।

হঠাৎ নয়নতারা বললো, বলার আগেই হাসি ফুটলো তার মুখে,—আচ্ছা রাজকুমার, টিটিভ, না ডাহুক কে ভালো।

রাজু বললো,—নয়ন, তোমাদের রাজকুমার যে মূর্খ এটা প্রমাণ না করেই তা বলা যায়।

—আ, রাজু, আমি কি? দেখো—নয়নতারা মুহূর্তের জন্য ভাবলো সে কি বুঝিয়ে বলবে ডাহুক কথাটা অনেক গানে আছে, টিট্টিভের সাক্ষাৎ বিষ্ণুশর্মার উপদেশের বাইরে নেই। সেজন্যই সে জিজ্ঞাসা করেছিলো।

কিন্তু বিলের দিকে চোখ রেখে রাজু বললো,—ও কি মুখের কেন অমন চেহারা? তুমি কি সত্যি ভেবেছো তোমাদের রাজকুমার মূর্খ থেকে যাচ্ছে? যদি তুমি সেই আড্ডাগুলো দেখতে নয়ন যা অনেক সন্ধ্যায় আমার বৈঠকখানায় বসে। কি শ্যাম্পেন! আর কত কথা। আমাদের বাগচী মাস্টারমশায় কিন্তু যত গম্ভীর দেখায় তত গম্ভীর নন।

নয়নতারা বললো,—নিজের ব্যাপারে এখন দেখছি তোমার সব কথাই বাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

রাজচন্দ্র হাসলো। বিলের সৌন্দর্যের প্রফুল্লতাই যেন তার মুখে। সে বললো,—কে বলেছে? আমার এই বন্দুক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো কিংবা পিয়ানো সম্বন্ধে দেখবে আমার কোন কথাই বাঁকা নয়।

রাজকুমারের মুখের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে নয়নতারা চিন্তা করলো। কথার সুরে কোথাও কোথাও সুখ জড়ানো আছে, কিন্তু শেষ কথাটার চাইতে বাঁকা আর কি?

কিন্তু মাহুত যে এতক্ষণ নিজেকে লুপ্ত করে রেখেছিলো কথা বললো,—সামনে লোক-জন দেখছি।

—হ্যাঁ, ওরাই পথ দেখাবে।

নয়নতারাও লোকগুলিকে দেখতে পেয়েছিলো। হঠাৎ যেন তার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো।

—কি ভাবছো?

মৃদুস্বরে নয়নতারা বললো,—কাজটা ভালো হয় নি। হাওদায় কবরেজকে দেখে না জানি অন্যে কি ভাবে।

রাজকুমারের চোখ দুটিতে দুষ্টুমি দেখা দিলো। সে বললো,—তাই তো, এখন আর অন্তর্ধানেরও উপায় নেই। একেই কি অগত্যা বলে দেবী, মনে হয় করণ বুঝি, কিন্তু আসলে প্রকৃত্যাদিভিঃ।

হাতি এগিয়ে চললো।

নয়নতারা ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবলো কিংবা তাকে বরং পরিবেশটাকে অনুভব করার চেষ্টা বলা যায়। সামনের লোকগুলি ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার মধ্যেই মনে হলো তার একবার, এটা কি রাজুর একটা ঝক্‌ঝকে বাক্য তৈরির নেশা কিংবা শ্লেষ করে কিছু বলছে? স্ত্রীলোককেই তো প্রকৃতি বলে।

কীবল কেন এসেছিলো এ গ্রামে? নানা দিকে বিচার-বিবেচনা করার পর অনুমান তার অনেকটা জীবিকা অনুসন্ধান, কিছুটা পলাতক বৃত্তি। পরবর্তী জীবনে এদেশে আইন ব্যবসায় সে খ্যাতি ইত্যাদি লাভ করেছিলো। তার স্বদেশে কি তা হতে পারতো না? অথবা ভারতে তখন কয়েকটি হাইকোর্ট স্থাপিত হওয়ার কথা চলছে, সেইসব নতুন হাইকোর্টে নতুন আইন-জীবীদের প্রতিযোগিতা করার সুবিধা ছিলো। অন্যদিকে তা হলে এই প্রশ্ন থাকে কিছু বেশি টাকার জন্যই কি সহজে স্বদেশ ত্যাগ করা যায়? আসলে একথাও মনে রাখতে হবে কারো কারো কাছে সাজানো-গোছানো লন্ডন যেন সভ্যতার কেন্দ্রর চাইতে অসভ্যতার প্রান্তে যেখানে সভ্যতা গড়ে উঠছে এমন সংযোগস্থলেই আকর্ষণীয় বোধ হয়। সভ্যতা গড়ে তোলারও একটা

নেশা আছে।

আপাতত কীবলের হাতে কাজ ছিলো না। মুখ্যত সে রাজারগ্রামে চিঠি দিতে এসেছিলো ডাকে। কিন্তু সেটা এমন ব্যাপার নয় যে তাকে আসতেই হতো। মরেলগঞ্জের নিজস্ব ডাকহরকরা আছে যে রাজারগ্রাম থেকে মরেলগঞ্জের ডাক দেয়া-নেয়া করে, দরকার হলে সদরেও যায় মেল ধরাতে। যৌবনের একটা ঝোঁক আছে। ঝোঁকের মাথায় কীবল কাল অনেক রাত পর্যন্ত একখানা চিঠি লিখেছে, এবং দ্বিতীয়বার না পড়েই তা পোস্ট করতে ঝোঁকের মাথাতেই ডাকঘরে এসেছিলো। অনুপ্রেরণার স্বভাব এই যে দ্বিতীয়বার পড়লে তার অনেক কথাই বাস্তবজ্ঞানের কাছে বর্জনীয় মনে হয়।

কীবল চিঠি লিখেছিলো তার আত্মিক ভগ্নীকে। তাদের প্যারিশের প্রিন্সের বিধবা মেয়ে। বয়সে কীবলের চাইতে কিছু বড় হতে পারে, নাও পারে, কিন্তু সম্মানে কীবলের চোখে গগনচুম্বী। তাকে চুম্বন করতে সুতরাং গগনই পারে। কীবল বড়জোর তার আঙুলের ডগা চিবুকের ডগায় আনতে পারে। বিধবা এই মহিলাকে, তার নাম ম্যাগি হওয়ার সুবাদে, কীবলের চোখে ম্যাগডালেন বলে বোধ হয়, ক্রাইস্টের স্নেহধন্যা ম্যাগডালেন। কি করে কি হয় বলা যায় না। একবার ম্যাগিকে মুহূর্তের জন্য জননী এই অনুভব করতে সাধ গিয়েছিলো কীবলের। বাইবেল নিয়েই বসা। কিন্তু সেই বিকেলের উজ্জ্বল আলোয় তারা অল্পবয়সী ভাইবোনের মতো হাত কাড়াকাড়ি করছিলো। জাপ্টাজাপ্টি শেষে বইটা দখল করে কীবল চেয়ারে বসতেই মুখোমুখি বসলো ম্যাগি। তখনও সে হাঁপাচ্ছে। হঠাৎ দেখতে পেয়েছিলো তখন কীবল। ব্লাউজের হুক্ খুলে গিয়েছে, চাঁপারঙের অর্গান্ডির আন্ডার গার্মেন্টের শাসনে আবদ্ধ সুপক্ক একটি পুষ্ট স্তনের অর্ধাংশ, যা নাকি স্বর্গের মতো। আর তখন হাঁপাচ্ছিলোও ম্যাগি। ফলে তা যেন জীবন্ত এক সত্তা। কীবলের অনুভূতিতে।

সে যাই হ'ক কীবল তার আত্মিকভগ্নীকে চিঠি লিখতে অভ্যস্ত। কেননা চিঠিতে যেমন এই আত্মিকভগ্নীত্বের গভীরতা ছুঁয়ে চলা সম্ভব পাশাপাশির নৈকট্যে ততটার সাহস হয় না যেন। কারণ ত্বকের নৈকট্য এমন এক উষ্ণতা সৃষ্টি করে যা মনের শাসনের বাইরে চলে যেতে চায়।

চিঠি দেয়ার পরে হাতে এখন অনেক সময়। সুতরাং সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। ঘণ্টা তিনেক আগে ব্রেকফাস্ট হয়েছে। ঋতুটা এখন এমন যে চারিদিক থেকেই সূর্যের আলো তার গায়ে পড়ছে। এদেশের হিসাবে এটা এখন শীতের সূচনা, তার কাছে বরং গ্রীষ্ম আসে আসে এমন মনে হচ্ছে। ধুলো নয়, প্রচুর ঘাস; কাদা নয়, ট্যালকমের মতো মাটি। উপরন্তু যেদিকে তাকাও সবুজ, ময়ূরের পেখমের মতো নীলে জড়ানো সবুজ এবং উজ্জ্বল।

ঘোড়া ক্যান্টারে চলছে। ধান কেটে নেয়া হয়েছে এমন একটা মাঠ আড়াআড়ি পার হতে হতে সে শিস দিতেও শুরু করেছিলো। তা এখানকার জলটা ভালো, ক্যালকাটার তুলনায় বটেই। ক্যালকাটার জল লোনা। আর ক্যালকাটার নেটিভ পাড়ার, এবং ক্যালকাটার বেশির ভাগই তাই, সেই খোলা পচা জলের নর্দমাগুলোর চাইতে এই বুনো পথও ভালো। ডিসাই-ডেড্‌লি। এখন আবার চিঠির কথাটা অথবা চিঠির প্রশ্নর কথাই তার মনে এলো। দুটো প্রশ্ন আছে এই চিঠিতে। সে প্রশ্ন দুটির বিষয়ে ম্যাগির ধারণা জানতে চেয়েছে। (১) সেন্টপলসের হাতে স্বর্গের যে চাবি আছে তা কি সোনার তৈরি? (২) সে হাত কি অ্যাঞ্জেলদের হাতের মতো? বস্তুত এই প্রশ্ন দুটো তৈরি না হলে গত সপ্তাহের পর আজই আবার চিঠি কেন?

এখন মনে হলো কীবলের অ্যাঞ্জেলদের হাতই বা কি? তা কি স্বচ্ছ একটা জমাটবাঁধা

আলো? কিংবা অ্যাম্ব্রোসিয়ায় তৈরি। কি আশ্চর্য এ সম্বন্ধেও ধারণা স্বচ্ছ নয়।

কিন্তু চিঠিতে প্রশ্ন ছাড়াও অন্য কিছু থাকে। কীবল তার একটা অভিজ্ঞতার কথা লিখেছে। এটাকে মানে ইন্ডিয়াকে ন্যাংটো সন্ন্যাসী ও সাপুড়ের দেশ মনে করে বটে লোকে। এখানে অন্য অভিজ্ঞতাও হতে পারে। তোমাকে বলতে পারবো না সবটুকু। কিন্তু এখানে জননেন্দ্রিয় পূজা হয়ে থাকে। তবে তুমি নিশ্চিত থেকো। তোমার মুখখানি আমার স্মৃতির দিগন্তে। আমি বিপথে যাবো না।

একটা বোধ হয় বেতের ঝোপ। ডানকানের কথা বিশ্বাস করতে হলে মালাক্কা কেন্ আর এই বেত একই জিনিস। একটা নালার বরাবর তার দুপারে মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু বেত-ঝোপ। দু-একটা যে গাছ ধারেকাছে তার ডালপালা আঁকড়ে ধরেও বেত উঠে পড়েছে। এমনকি দু-একটি বড় গাছের মাথা ছাড়িয়ে রোদে ঝল্‌মল্ করছে বেতের চূড়া।

ঘোড়াটা চমকে উঠলো। কারণ খুঁজে এদিক ওদিক চাইতেই কীবল হাতি, হাওদা, ও হাওদায় মানুষ দেখতে পেলো। বেশ দ্রুত চলেছে হাতি, আর তার ঘোড়াও ক্যান্টার করছে। আরও ভালো করে দেখতে হলে লাগাম টানতে হয়।

সে অনুভব করলো : মাই—স্‌প্লেনডিড! এর আগে কি হাতি দেখেছি, না তার সওয়ার!

আচমকা এরকম অনুভব করার পর তার মন যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলো। তুমি স্বপ্নও দেখো নি এমন রূপ সম্বন্ধে। কি আশ্চর্য, এমন রূপ কি হিদেন-নেটিবদের হয়? হ্যাঁ চিনতে পেরেছে সে। পুরুষটি রাজকুমার নয় কি? কারণ প্রিন্সই হাতি চড়তে ভালোবাসে। পরবর্তী পর্যায়ে সে যুক্তি দিলো, মহিলাটি প্রকৃতপক্ষে ক্যাথারীনই, নতুন পোশাকেই তাকে তেমন দেখিয়েছে। কারণ কেট এদেশে জন্মালেও সব শেষ হিসাবে ইংলন্ডের রক্ত আছে তার গায়ে। ব্রিটিশ ব্লাড। কীবলের চাপা ঠোঁটে ভাঙচুর দেখা দিলো, আর এই রাজকুমার অবশ্য হার ম্যাজেস্টির একজন সাবজেক্ট মাত্র। বৃথা জাঁকজমক। কিন্তু ক্যাথারীন? ক্যাথারীন অবশ্যই জিনুইন ব্রিটিশ ব্লাড। নতুবা এত রূপ হয়। তার ইদানীং নারীসম্পর্কহীন ব্রিটিশ ব্লাড একটি পবিত্র কবোষ্ণতায় যেন পেঁৗছে গেলো।

এখন তার মরেলগঞ্জে ফেরারও তাড়া নেই। এদিকে দেখো সামনের ওই রাস্তাটা চওড়া। এটা রাজারগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নাকি? সে লাগাম টানতে ঘোড়াটা চওড়া পথটা ধরলো। কিছু দূরে গিয়েই গোল, সাদা, প্রকাণ্ড একটা ছাতার মতো গম্বুজ চোখে পড়লো। ওটাই নাকি রাজবাড়ি?

অতঃপর সে আবার রাজবাড়ির গম্বুজের টানেই যেন রাজারগ্রামের দিকে ফিরতে শুরু করলো।

তখন তার মনেও একটা উল্টো পাক দেখা দিয়েছে। সে ভাবলো, (যেন সে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধেই উৎসুক) আসল কথা এদেশে অর্থাৎ এই ইন্ডিয়ায় বিভিন্ন রকমের মানুষ থাকাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ মানুষের যত রকমের দেহবর্ণ হতে পারে বোধহয় সব রকমই এখানে পাওয়া যাবে। আর তা হয়তো এইজন্য যে একের পরে এক মানবগোষ্ঠী এখানে তাদের বিভিন্ন বর্ণের দেহ নিয়ে এসেছে এবং থেকে গিয়েছে। হয়তো একদিন তেমন ইংরেজদেরও কিছু চিহ্ন পড়ে থাকবে। কীবলের মন থেমে দাঁড়ালো। না, না, অবশ্য তা প্রকৃতপক্ষে হবে না। কেননা কোন এমন জাত আছে পৃথিবীতে যা ইংরেজদের পরেও আবার এদেশে রাজ্য পাবে? অর্থাৎ ইংরেজ অপেক্ষা উন্নত ও শ্বেতকায়? রাজকুমার হয়তো এবং হয়তো বা রাজকুমারের সঙ্গীও তেমন কোন অভিযাত্রী দলের বংশধর। তারা কি এরিয়ান ছিলো?

কীবল স্থির করলো, এদেশে হয়তো আর্যদের পর যারাই রাজত্ব করেছে তারাই অল্প-বিস্তর শ্বেতকায়। এবং এতেই প্রমাণ হয় আর্য অভ্যুদয় হওয়ার পর থেকে সব দেশেই শাসনের ভার শ্বেতকায়দের হাতে থাকছে। যদিও এটা মিলের লজিকের প্রথম সূত্র মাত্র।

তার হাতে অন্য একখানা চিঠিও ছিলো। রলে নামক একজন পূর্বপরিচিত ভদ্রলোককে লিখেছে সে। রলে এই অঞ্চলে একটা রোমান ক্যাথলিক মিশন হাউস স্থাপন করতে চায়।

অনেক সময়ে যোগাযোগ ঘটে যায়। চন্দ্রকান্ত এন্ড্রুজ বাগচী তখন চরণদাসের বাড়ি থেকে নিজের কুঠিতে ফিরছিলো লাঞ্চের জন্য। তার পনিটা বেশ মোটা, গতিটাও শ্লথ। যদি কেউ দুএক বছর আগে দেখে থাকে তবে তার এই অনুমান হবে বাগচীর যত্নেই তার এই উন্নতি। হাঁটু দুটোর কাছে দর্শনীয় থোপা থোপা পশম, ঘাড় সিংহসম কেশরযুক্ত ও লেজের মাটিছোঁয়া বালামচি বাড়বাড়ন্ত দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাগচীর পোশাকও গ্রামে লক্ষণীয়। স্প্যাটস্, ক্রাভ্যাট সমন্বিত পুরো ইংলন্ডীয় তার পোশাক। শুধু মাথার পেল্ট্‌হ্যাট যেন টোকার মতো বড়ো। পনি মাথা ঝাঁকিয়ে টিক্ টিক্ করে চলেছে। বাগচীর পা দুখানা লম্বমান মাটির কয়েক আঙুল উপরে। দুষ্টু ছেলেরা মন্তব্য করে গোপনে ঘোড়া ও সওয়ার দুজনেই একসঙ্গে হাঁটে। কিন্তু তা গোপনে, খুবই গোপনে, কারণ এই মানুষই যখন স্কুলের ঘরে নিজের দুপায়ে দাঁড়াবে তখন তার চোখের দিকে তাকানো যায় না।

চরণদাসের বাড়িতে একটা দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারি আছে। সেখানে সপ্তাহের অন্যান্যদিন সকালে কিংবা বিকেলে অন্তত একবার সে যায়ই। ছুটি ও রবিবারে দুবেলাই হয় প্রায়।

আজ রোগীর ভিড় ছিলো। ফিরতে কিছু দেরি হয়েছে বাগচীর। বিলমহল থেকে দুচার ক্রোশ পায়ে হেঁটে কয়েকজন রোগী এসেছিলো। কারো বাত, কারো স্থায়ী মাথাধরা, একজনের তো ক্ষয়রোগ বলেই সন্দেহ হয়েছে।

তার প্রশ্নের উত্তরে রোগীরা তাদের যে রোগলক্ষণ বলে চরণদাস তা সংক্ষেপে টুকে নেয়। বাগচী কিছুদিন যাবৎ চরণদাসকে প্রশ্ন করে, তুমি হলে কি দিতে? চরণদাস যদি সাহস করে কিছু বলে বাগচী কোন ক্ষেত্রে তার ভুল দেখিয়ে দেয়, কোন ক্ষেত্রে বলে দাও, দেখা যাক; অন্য কখনও বলে ঠিক বলেছো, আমারই ভুল হয়ে যাচ্ছিলো। এ সেই চরণদাস যে গ্রামের পোস্টমাস্টার। সে বাগচীর স্কুলে শিক্ষকতাও করে। এবং দেখা যাচ্ছে সে ডানকানের আত্মা বিচারের আগে লাখ লাখ বছর ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ পাবে এমন গল্প বানায়।

আজ ডিস্‌পেনসারির কাজ ভালোই চলেছিলো। বাগচী কখনও হেসে কখনও তিরস্কার করে রোগী দেখা শেষ করছিলো এবং চরণদাস ওষুধ দিয়ে চলেছিলো।

দেখা যাচ্ছে গুজবের মতো রসিকতাও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে কৌতুকের এই হলো : চরণদাসের রসিকতা অন্যের মুখে ঘুরে চরণদাসের কানেই ফিরে এলো।

বিলমহলের সেই চিরস্থায়ী মাথাধরা রোগী, যার কপালে সুতোর ডোরে একটা সরু শিকড় বাঁধা, সেই বললো,—চরণ কবরেজ, শুনেছো নাকি ডানকানার নাকি নরকেরও ভয় নেই।

চরণদাস ওষুধের ফোঁটা ঢালছিলো জলের শিশিতে।

বাগচী জিজ্ঞাসা করলো,—কে? কার কথা বলছো? ডানকানা কে? কিন্তু বাগচী নিজেও বুঝতে পারলো। সে হো হো করে হেসে উঠলো। এরা ডানকান সাহেবকে একটা মাত্র আকার দিয়েই কানা করে ছেড়েছো। রোগীটি বাগচীর সামনে লঘু কথা বলে ফেলে অপ্রস্তুত বোধ

করছিলো। বাগচী হাসলেও রসিকতাটা আবার করা উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ হলো।

বাগচীই বরং বললো হাসতে হাসতে,—সে আবার কি গো, নরকের ভয় কার নেই?

সাহস পেয়ে রোগীটি বললো,—নরকে তো আত্মাই যায়। তা সে আত্মা যদি লাখ লাখ বছর ঘুমিয়েই থাকে তার তবে কিন্তু আত্মার ভয় কমে গেলো।

এই কৌতুকের জনক চরণদাস কিন্তু বিব্রত বোধ করলো। সে ব্যাপারটাকে হাল্কা করার জন্য বললো,—পাপ কি কেউ এড়াতে পারে? ওর আর তামাদি নেই।

রোগীটি যা শুনেছে তা ভোলেনি। বললো সে, তামাদি নয় নেই। কিন্তু তুমিই বলো; হলোই বা ইংরেজ চিত্রগুপ্ত। তার সেরিস্তায় কি কাগজ লাখ লাখ বছর পরের পর ঠিক থাকে? বিচার তো করে সেই শেষের এক দিনে।

বাগচী অবাক। একবার মনে হলো সে আবার হেসে উঠবে। কিন্তু রসিকতা হলেও এটা কি ভালো রুচির? একটু গম্ভীর মুখেই সে বললো,—সব ধর্মেই এমন কিছু থাকে যা অন্য ধর্মের লোকেরা সহজে বুঝতে পারে না। ওষুধটা ওকে দিয়ে দাও চরণ। দেরি হচ্ছে।

একটু হেসে সে রোগীটিকে বললো,—ওষুধটা কিসের তৈরি জানো? স্রেফ ঘোল। তাই বলে ঘোল খেলে মাথা ধরা সারবে না। হুঁ হুঁ!

ওষুধ নিয়ে রোগীটি উঠে দাঁড়ালো। ট্যাঁক থেকে পাঁচসিকে পয়সা বার করে বাগচীর জুতোর সামনে রেখে বললো,—কবে আবার আসবো, সার?

বাগচী বললো,—ওকি, পয়সা কেন?

—সার কত গরীব লোককে পথ্য দেন শুনি। পয়সা কটা সেই ধর্মভাণ্ডারে দেবেন।

দেখা যাচ্ছে ছাত্রদের দেখাদেখি রোগীরাও কখনও কখনও তাকে সার বলে।

বাগচী রোগীটির মুখের দিকে চাইলো। এই পরার্থপরতা তার ভালো লাগলো। সে সস্নেহে বললো,—ফের রবিবারে এসো। নিজে আসতে না পারো কাউকে পাঠিও খবর দিয়ে। আবার হেসে বললো,—তোমাকে ঘোল খাওয়াচ্ছি বলে আবার কেউ ঠাট্টা করবে না তো, হে!

কিন্তু রসিকতা কখনও কখনও নাছোড়বান্দা হয়। দাওয়া থেকে পৈঠায় নামতে রোগীটি বললো আবার,—তা চরণ, যাই বলো, ভাই, ভাগ্যটাই ওদের ভালো। এদিকে ইহকালে রাজা হয়েই জেঁতে বসেছে, ওদিকে দেখো পরকালেরও সাজার ভয় নেই। মজা আর কাকে বলে।

ওদিকের বেঞ্চের উপরে স্বগ্রামের কয়েকজন রোগী ছিলো। তাদের একজন রসিকতার সুরেই বললো,—তা, ভুতোদা, মিথ্যে বলোনি। কিন্তুক এক কাজ করা যায়। সব সমেত পুড়িয়ে দিলে হয়। তা হলে আত্মা ঘুমুতে জায়গা পায় না। সরাসরি নরকে পেঁৗছায়।

সকলেই হেসে উঠলো।

রোগীর ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। বাগচী কিছু ভাবলো। তার মুখে হাসি দেখা দিলো না। পাইপ বার করে ধরালো। বরং পায়ের উপরে পা তুলে আয়েশ করে নেয়ার ভঙ্গিতে বসে বললো,—চরণ, ডাবা টেনে নাও। ওতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু একটা কথা, চরণ।

চরণ বললো,—বলুন, সার।

—এই এখনই যা বলা হলো।

চরণদাস উত্তর দেয়ার আগে চিন্তা করলো। তামাক, শোলা, চকমকির বাকসটাকে আঙুলে নির্দেশ করে একজন রোগীকে বললো,—তামাক খাও, চেরো কাকা।

তারপর হঠাৎ বাগচীর দিকে ফিরে বললো,—যদি লাগাই হয়, সার, সবসমেত পুড়িয়ে

দেয়াই ভালো। যাকে সৎকার বলে। আর তা করতে হবে পাপ করে উঠেছে ঠিক এমন সময়ে। অনুশোচনা করে পাপ কাটানোর সুযোগ যাতে না পায়।

বাগচীর মুখে কথা নেই। সে যেন ভেবেই পেলো না সে হাসবে না চটে উঠবে। একবার তার মনে হলো সেদিন সে আর রোগী দেখতে পারবে না, পরে একবার ভাবলো যত তাড়াতাড়ি এদের বিদায় করা যায় ততই ভালো। কি সাংঘাতিক কথা!

তাই করলো সে। রোগীদের বিদায় করে পাইপটা জবালালো সে আবার। ভাবলো এটা কি ধর্মবিদ্বেষ চরণের? তাইকি? তা হলে সেও তো ক্রিশ্চান হিসাবে বিদ্বেষের পাত্র হতো।

কথাটা তখন মনে পড়লো তার। মূল ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে সে মনে মনে হেসে বললো,—তা চরণ তুমি কি হিন্দু পেট্রিয়টের নাম শুনেছো?

—তা শুনেছি, সার। ডাকঘরে একখানা নিয়মিত আসে দেওয়ানসাহেবের নামে।

—পড়েছো?

—দেওয়ান-সাহেবের কাগজ কি খোলা যায়, সার?

বাগচী অনুমান করেছিলো চরণদাস হয়তো "হিন্দু পেট্রিয়ট" থেকেই নীলকরের প্রতি একটা গভীর বিদ্বেষ সংগ্রহ করে থাকবে, কারণ বাগচীর ধারণা ছিলো "হিন্দু পেট্রিয়টে"র হরিশ নীলকরদের কঠোর সমালোচক।

পথে বেরিয়ে ভাবলো বাগচী: এদিকেও লক্ষ্য করো শেষ বিচার, অনুতাপ এমন সব বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকলে তেমন বলা যায় না চরণদাস যা বলেছে। কিন্তু এসবই বা কোথায় শিখবে সে? ভেবে দেখতে গেলে এটাকেই বরং বেশী আশ্চর্য মনে হওয়ার কথা। এখানে নীলকর অত্যাচার করে থাকলে "হিন্দু পেট্রিয়টে"র সাহায্য ছাড়াই বিদ্বেষ জন্মানো সম্ভব। "হিন্দু পেট্রিয়ট" বরং দূরে, এরাই কাছে। কিন্তু ধর্মের তত্ত্ব কোথায় শেখে চরণ? বাগচী অনুমান করার চেষ্টায় স্কুলের নতুন মাস্টারমশাই নিওগিকেই খুঁজে পেলো। নিওগির কাছে কি শিখেছে চরণ অনুতাপে পাপমুক্তির তত্ত্ব? আচ্ছা!

এখন বাগচী অন্য বিষয়ে চিন্তা করছে। বিষয়টা তার স্কুলের পরীক্ষা সম্বন্ধে। প্রশ্নটা এই জ্ঞানের বিষয়কে মূল্য দেয়া হবে, না যে ভাষায় বিষয়টাকে বলা হয়েছে তাকে মূল্য দেয়া হবে? কোন ছাত্র যদি হীমালয়, জমুনা, গংগা, প্রভৃতি বানান লিখেও পর্বত-নদীগুলোর যথাযথ পরিচয় দিতে পারে তাহলে কি তা মূল্যহীন? তার মনে হচ্ছে কলকেতার আধুনিক শিক্ষাও ভাষাজ্ঞানের উপরেই জোর দিচ্ছে। সে তার স্কুলের পরীক্ষায় ভাষা ও বানানের উপরে জোর দেয়, যদি সে লিখিত পরীক্ষার বদলে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে উঁচু শ্রেণীতেও? ভূগোল ইতিহাস বিজ্ঞানের কথা শেখাই কি আসল কথা নয়। আর সাহিত্যই যদি বলো তাতেও কি বানান আর ব্যাকরণের চাইতে রস বিষয়টা মূল্য পাবে না? শেকস্পীয়রের ব্যাকরণ আর বানান এখনকার কোন ছাত্র ব্যবহার করলে সেসব প্রশ্নেই কি জোরের বেশী পাবে? কিংবা এদেশের কৃষকের ধর্মজ্ঞানের কথা ভাবো। এক অক্ষর পড়তে লিখতে জানে না। কিন্তু শুনো দেখি তার কথা? মূর্খ বলবে? অথচ কলকাতার ভাষাজ্ঞানের নিরিখে তারা মূর্খের অধম।

চিন্তার বিষয়টা তার বিশেষ প্রিয়। মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু মনের একটা কৌশল যেন এখানে ধরা পড়ছে। সে ঠিক এখন এ বিষয়টাকে কেন ভাবছে। অন্য কোন চিন্তাকে দূরে রাখতে কি?

তা যদি হয়, এটা মনের অভ্যাস বাগচীর অপ্রিয় বিষয় থেকে সরে যাওয়ার অন্য বিষয়কে

মনে এনে। কিন্তু সব সময়ে কৌশল কাজে লাগে না সবটুকু।

কিন্তু খানিকটা যেতে না যেতে বাগচী একা একাই হো হো করে হেসে উঠলো, দেখো কান্ড শুধু নামে একটা আকার যোগ করেই কেমন তিরস্কার তৈরি করেছে। ডান দিকে কানা। ডানকানা।

ওদিকে কিন্তু লজ্জা হলো তার। কেউ দেখে ফেলে নি তো তাকে হাসতে? সে তাড়াতাড়ি হ্যাট্‌টাকে কপালের উপরে টেনে নামালো। মুখটাকেও গম্ভীর করলো।

টকাটক্ করে চলছে পনি। মাটির কাছাকাছি বাগচীর সুদৃশ্য জুতা ও সুদৃশ্যতর সকস্‌পরা পা দুখানা দুলছে তালে তালে।

বাগচী হঠাৎ অবাক হয়ে স্বগতোক্তি করলো আমিই কি শেষ বিচার কিংবা ইটারন্যাল ড্যামনেশন সম্বন্ধে কিছু জানি? ওসব কিন্তু আমার কাছেও ঠিক পরিষ্কার নয়। সেটা কি মিল্টনের জ্বলন্ত গন্ধক ও কালো আগুন, ব্রিমস্টোন অ্যান্ড ব্ল্যাক ফায়ার? না কি সে এক ঈশ্বরের সম্পর্কহীন অন্ধকারে বায়ুভূত নিরালম্ব অবস্থা?

বাগচীর মুখটা এখন গম্ভীর দেখাচ্ছে। তার মনে পড়লো দুখানা ছবিকে। বলা যায় সে দুটিই বিশ্ববিখ্যাত ছবি মাইকেল এঞ্জেলো এবং রুবেনস নামক চিত্রিদ্বয়ের আঁকা দুখানা শেষ বিচারের ছবি। বিশেষ করে মাইকেল এঞ্জেলো। পরমপিতার সিংহাসনের নিচে ক্রাইস্টের ভঙ্গিতেও সেদিন ক্রোধ। ক্রাইস্টের পাশে ভার্জিন মেরিও যেন ক্রাইস্টের অটল গাম্ভীর্যকে তার রুদ্র রূপকে স্নিগ্ধ করতে পারছে না। দণ্ডিত পাপীদের নিচে কেরনের নৌকার দিকেই ঘুরে ঘুরে পড়তে দেখা যাচ্ছে, অথবা তাদের সবলে টেনে নেয়া হচ্ছে সেই বিভীষিকার দিকে।

বাগচী নিজের ডান হাত তুলে চোখের সামনে রাখলো। যেন তাতে স্মৃতি থেকে সেই ছবিগুলোকে মুছে দেয়া যায়, সেই ভয়ংকর সুন্দর ন্যুড আকৃতিগুলিকে।

কি আশ্চর্য একি সে বিশ্বাস করে? সে অনুভব করলো নিজেকে নিয়ে চিন্তা করলে মন বরং খারাপ হয়ে যায়। তাই নয়? না, এ রকম দৃশ্যে সে বিশ্বাস করে না।

সেই শেষ বিচারের দিনে সেন্ট বার্থলোমিউ ক্রাইস্টের পাশে বিচার প্রার্থনা করছে বা এরকম অন্য অনেক কিছু বিশ্বাস করতে পারলে তো ভগবান দুদিনে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করে একদিন বিশ্রাম করেছিলেন তাও বিশ্বাস করা যায়। অথচ সে মনপ্রাণ দিয়ে আজও এ তথ্যে বিশ্বাস আনতে পারলো না।

প্রমাণ আর কি—এই তো, কোন রবিবারেই সে কি প্রার্থনা করে?

তার মুখের গাম্ভীর্য কমে গিয়ে একটা স্বপ্নময় দুঃখার্ততার ছাপ পড়লো।

কিন্তু চোখ তুলতেই যোগাযোগটা ঘটে গেলো। ঘোড়ার পিঠে কীবলকে দেখতে পেলো, গলির মুখে বড় রাস্তাটা পার হয়ে যাচ্ছে তার ঘোড়া। কীবল কি প্রকৃত ইভান্‌জেলিস্ট যেমন ডানকান বলেছিলো?

চন্দ্রকান্ত এন্ড্রুজ বাগচী তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানে ইংরেজ ঠোঁটটেপা জাত, গায়ে পড়ে আলাপ করে না, অন্য কেউ তেমন করে তাও চায় না। তা সত্ত্বেও কীবলের সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ দেখা দিলো তার মনে, নিছক ভদ্রতার চাইতে বেশী গভীর সে আগ্রহ। কি কারণ তার? মনের বিচিত্র গতি বলা হবে। কিংবা চরণের রসিকতায় উল্লেখ করা লাস্ট জাজ্‌মেন্ট ও ড্যামনেশান, ধর্ম সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, এবং কীবল এই নামটা কি তার আগ্রহের মূলে ছিলো। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন তার মধ্যে কীবল নামে একজন ছিলেন বটে। এবং অক্সফোর্ডের সে আন্দোলন নিয়ে সে এবং

তার শ্বশুর ফাদার এন্ড্রুজ একসময়ে বহু আলোচনা করেছে।

পনিকে দ্রুত চালানোর চেষ্টা করলো বাগচী। সে তার রাশি রাশি বালামচিসহ ঘাড় এবং মাথা এমনভাবে নাড়লো যেন তখনই ধাপে ছুটবে। অথচ সে অসহায়। হায়! আদরপুষ্ট তার মোটা শরীর যেন তার দ্রুতগমনেচ্ছু মস্তিষ্কের সঙ্গে অসহযোগ করে বসলো।

কিন্তু কীবলও তাকে দেখতে পেয়েছিলো। ক্রিমিয়াখ্যাত লাইটবিগ্রেডের সওয়ারের কায়দাতেই রাশ টেনে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে আনলো সে।

—হেলো ফাদার, গুড্‌মর্নিং। এই বলে কীবল হাসলো। সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান তার দন্তপংক্তি এখনও। গুডমর্নিং বলতে গিয়ে কি সময়ের কথা মনে পড়লো বাগচীর। তারপরেই সেও হাসিমুখে বললো,—গুডমর্নিং মিস্টার কীবল, কিন্তু আমাকে ফাদার বলা বৃথা। আমি একজন ভিলেজ স্কুলমাস্টার মাত্র। এদিকে যখন এসেছেনই আসুন আমার কুটীরে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে লাঞ্চের সময়টাকে আমরা এগিয়ে নেবো।

ইংল্যান্ডে অনুশীলিত কীবলের মনের ইংরেজি অভ্যাস অস্ফুটস্বরে একবার চিন্তা করলো ইটস্ নট ডান্ (এপ্রকার প্রথা না হয়।) কিন্তু পরক্ষণেই তার কি মনে হলো, আপটার অল দি ওনলি ইংলিশ গ্যার্ল দিশ্ সাইড ক্যালক্যাটা? (কলকাতার বাইরে ইংরেজ দুহিতা আর কে?)

সে বললো,—কিন্তু মিসেসের উপরে নির্যাতন হবে না? সেই লাঞ্চ, আবারও এই লাঞ্চ।

আদৌ নয়, আদৌ নয়, বরং আমরা সম্মানিত জ্ঞান করবো। আর এর চাইতে আনন্দেরই বা কি? আসুন তা হলে। বাগচী ডানহাত প্রসারিত করে যেন তার বাংলোকে ইঙ্গিত করলো।

বাগচীর বাংলোর সামনে। ঘোড়া দুটির ব্যবস্থা করলো সহিসই। তারা যখন বসবার ঘরে ঢুকছে ম্যান্টেলপিসের উপরে বসানো চার্চের আদলে তৈরি ছোট ক্লকটায় একটা বাজতে কিছু দেরি আছে মাত্র।

ঘড়িটাতে আগে চোখপড়ার একটা কারণ ছিলো। তা বোধ হয় ছবিটা। ক্লকের ফিট দুয়েক উপরে হলুদে-সাদা দেয়ালের গায়ে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য। অথবা প্রাকৃতিক দৃশ্য না বলে বরং একটা বাড়ির, তার উপরের আকাশের, এবং একজোড়া গাছের ছবি। বাড়িটা অক্স্‌ফোর্ডের একটা কলেজের। কীবল যেটায় ছিলো অবশ্যই সেটা নয়। তাহলেও যেন চেনা চেনা লাগলো তার। চিত্রকর এবং একজন অচিত্রকর ছাত্রের দেখায় পার্থক্য থাকেই। চিত্রকর আকাশের যে রং দেখে অথবা আকাশের যে রং লেগে কলেজবাড়ির এক বিশেষ অংশ ছবিতে আঁকার মতো হয়ে ওঠে তা চিত্রীর চোখেই ধরা পড়ে।

ততক্ষণে বাগচী বসুন বসুন বলে চেয়ার এগিয়ে দিয়েছে।

এখন শীতকাল হলেও ঘরে অনেক আলো। একটা জানলার কাচে রোদও। কীবলের ত্বকে উষ্ণতাটা যেন একটু বেশী তীক্ষ্ম মনে হলো, আরামদায়কের চাইতে তীক্ষ্ম এবং হয়তো সেজন্যই বা কিছু উত্তেজক।

সে বললো,—আজ দিনটা বেশ উষ্ণ।

—আরামদায়করূপে সে রকম, তাই নয়।

জানালার উপরে বসানো রঙীন কাচের স্কাইলাইট দিয়ে আলো আসছে। রঙীন জ্যামিতিক ছবির মতো মেঝেতে।

বাগচী বললো,—আপনি তো ধূমপান করেন না। কফি কিংবা অন্য পানীয় আনাই। অবশ্য তা স্কুল মাস্টারের কুটীরের পানীয়ই হবে।

কীবল হাসিমুখে বললো,—কফিই ভালো। যুদ্ধে খুব দামী মদ দেয় না, আর তা ছাড়া অক্সফোর্ডে কিংবা ইন্‌এও দামী মদের যোগাড় করা কদাচিৎ সম্ভব।

বাগচী কীবলের কথা বলার সময়ে তার মুখের দিকে চেয়েছিলো। সে অনুভব করলো তার পরিচিত কোন ইংরেজের মুখে এমন সরল কথা সে শোনেনি। খুব ভালো লাগলো তার। সেদিন লাঞ্চটা ভালোই হয়েছিলো, বেশ আলোকোজ্জ্বল এবং আধুনিক আবহাওয়ায় কিন্তু আলাপে যা ক্রমশ প্রাধান্য পেয়েছিলো তা সবই ইংল্যান্ডের সম্বন্ধে, ইংল্যান্ডের সামাজিক ইতিহাসই বলা যায়। উভয়পক্ষেরই বেশ তৃপ্তির কারণ হয়েছিলো সেই লাঞ্চ। বাগচীর বাংলোটা যে আকারে কিছু ছোট হলেও ডানকানের বাংলোর সঙ্গে নকশায় এক তা বুঝেছিলো কীবল। কিন্তু ডানকানের বসবার ঘর নিশ্চয় এমন গোছানো, আলোকপ্রতিফলিত নয়। মানানসই ছিটের পর্দা, ম্যান্টেলপিসের কিছু উপরে রাখা কট্‌ম্যানের আদত ছবি, বেশ বড় সেই পিআনোটা, সেল্‌ফে সাজানো বাগচীর বই, ডেস্কের উপরে রাখা টাইমস্‌ কাগজের ফাইল, আর সব কিছুতেই জানলা ও স্কাইলাইটের আলো। আর লাঞ্চে কিছু দেরি আছে বলে ঝকঝকে পাত্রে কফি নিয়ে কেট প্রবেশ করলো। সাদা প্রিন্টের স্কার্ট, তার উপরে নীল স্ট্রাইপের জ্যাকেট। তার লালচে চুল, যা বনেট পরলে ঢাকা থাকে এখন বরং এলো খোঁপায় জড়ানো। অত অজস্র লাল রেশমি চুল! একি ভারতের জলবায়ুর প্রভাব? কীবল স্বীকার করেছিলো তেমন সুন্দর পরিবেশ সে কল্পনাই করে নি। বাগচীর কথা বুঝতে না পেরে কীবল জিজ্ঞাসা করেছিলো হোয়াট্‌স দ্যাট্‌ শ্যালক? এবং সে বুঝতে পারে নি ব্রাদার ইন-ল কথাটাতে এমন মধুর করে হাসার কি আছে। তার মনের কোথাও ঠোঁটচাপা কেউ সতর্ক করেছিলো— ইটস্‌ নট্‌ ডান্‌। কিন্তু তার মনের অন্য অংশ তাকে উৎসাহিত করে বলেছিলো—এটা গ্রেট ব্রিটেন নয়, এখানে সীমার বাইরে যাওয়ার টান আছে। সে টাইমস্‌ কাগজকে ইঙ্গিত করে বলেছিলো—ক্যালকাটার বাইরে এই প্রথম টাইমস্‌ দেখলাম। ক্যালকাটাতেও বা কজন রাখে?

তখন বাগচীরা বলেছিলো কীবলের মুখে ইংল্যান্ডের হালফিলের কথা শুনেই তারা দেওয়ানসাহেবের কাছে থেকে টাইমস্‌ চেয়ে এনেছে। কাগজগুলো পুরনোই। তখন আর স্টীমার চললে কাগজও তাড়াতাড়ি আসবে, এবং স্টীমার কি অলৌকিক ব্যাপার তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিলো। কফির সঙ্গে পিআনোর কথা উঠেছিলো। কীবল বলেছিলো, এমন দামী জিনিস নিছক খেয়ালের কথা নয়। তখন কীবল ধর্মাচরণ এবং পিআনো বাজনা সম্বন্ধে এই গল্পটা বলেছিলো :

গল্পটা ক্যার্ডিন্যাল নিউম্যানের প্রিয় শিষ্য ডাব্লু জি ওয়ার্ড সম্বন্ধে। তাকে কীবল শেষবার দেখেছিলো অক্‌সফোর্ডের পথেই। বছর পঁয়তাল্লিশের একজন ইংরেজ ভদ্রলোক কিন্তু ঘটনার সময়ে ওয়ার্ড যুবক। তখন ধর্মের ব্যাপারে ঝাঁজালো ধারালো যুক্তি তৈরি এবং সঙ্গীতচর্চা এই দুইএতেই সমান প্রবল অনুরাগ তাঁর। কখনও তিনি ইউক্যারিস্টের গুহ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ রহস্যময়তার আঁধি তুলছেন, কখনও মোজার্টের কোন ফিগারোর স্বরলহর ছড়িয়ে দিচ্ছেন কুজনের মতো। এই দুইএর কোনটিতে তাঁর অন্তর সায় দিচ্ছে সে বিষয়ে তাঁর ধর্মগুরু ডক্টর পুসেরও দ্বিধা ছিলো। একদিন ওয়ার্ড শুকনো মুখে ডক্টর পুসের কাছে উপস্থিত হলেন। স্বীকার করলেন লেনটের সময়ে সঙ্গীতের মতো হাল্কা ব্যাপারে জড়িয়ে না-পড়ার যে প্রতিজ্ঞা তিনি নিয়েছেন তা রাখতে গিয়ে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। এ-বিষয়ে ডক্টর পুসে কি কিছু উপায় বাৎলাতে পারেন?

ডক্টর স্থির করলেন একটু-আধটু পবিত্র ধাঁচের বাজনা তেমন ক্ষতি করে না বোধ হয়।

কৃতজ্ঞ ওয়ার্ড এক বন্ধুর ঘরে বাজনার আসর পাতলেন। শুরু হলো হেন্ডেলের গম্ভীর সংগীত দিয়ে। চেরুবিনির ধর্মীয় স্বরলহরী ও মালুউটারিস তারপরে; ম্যাজিক ফ্লুটের স্বর্গ-স্পর্শী স্বরগ্রাম এসে গেলো। কিন্তু হায় মোজার্টে অনেক বিপদ। কেউ হয়তো পাতাটা উল্টে দিয়েছিলো। আর সেখানেই ছিলো পাপাজেনো-পাপাজেনার সেই দৈবতসংগীত। রক্তমাংসের মানুষ আর কত সয়। সংগীতের পর সংগীত, স্বরগ্রাম হাল্কা ও দ্রুততর ক্রমে। তারপরই বোধ হয় রোজিনির লার্গো অল ফ্যাক্টোটামের সেই মাতাল করা আনন্দহিল্লোল। যখন শেষ হলো, মনে হলো তখন দেয়ালের গায়ে কে মৃদু কিন্তু বারংবার টোকা দিয়ে চলেছে। হঠাৎ বন্ধুদের খেয়াল হলো সর্বনাশ! পাশের ঘরটাতেই ডক্টর পুসে থাকেন বটে।

গল্পটা বলে কীবল, গল্পটা শুনে কেট ও বাগচী হেসে উঠলো।

গল্পের মধ্যেই কফি শেষ হয়েছিলো। কেট উঠে দাঁড়ালো। কফির কাপ প্লেট ট্রেতে কুড়িয়ে নিতে নিতে বললো সে,—আমাদের ঝি-চাকর নেই। লাঞ্চ কিছু বাকি আছে তৈরি করতে। আপনারা গল্প করুন। আমিও মাঝে মাঝে আসবো।

কেট চলে গেলে বাগচী জিজ্ঞাসা করলো,—মিস্টার ওয়ার্ড কি রোম্যান ক্যাথলিক?

কীবল বললো,—সম্ভবত। কিন্তু অ্যাংলো ক্যাথলিকদের সঙ্গে বিবাদ আছে বলেও শুনি নি। আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক ধরেছি। আপনি কোয়েকার। প্রকৃতপক্ষে আমি আজই চিঠি দিলাম বাড়িতে, তাতে লিখেছি এখানে একজন প্রকৃত কোয়েকারের সাক্ষাৎ পেয়েছি। ঈশ্বরের সান্নিধ্যের অনুভূতিতে কম্পমান! বাগচী কোয়েকার শব্দ শুনে তার তাৎপর্য আবার উপলব্ধি করেই যেন শিউরে উঠলো। সে বললো,—সর্বনাশ! আপনি করেছেন কি?

—কেন আপনি কোয়েকার নন?

—হয়তো ডিসেন্টার। কেউ কেউ বলে ইউনিট্যারিআন। হায় কি বিড়ম্বনা।

—আদৌ না। আমি এবার লিখতে পারবো ইউনিট্যারিআনদের মধ্যে কোয়েকারের ভাব থাকে। আমি কিন্তু ইংলিশ চার্চেই আছি। যদিও আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে অ্যাংলো ক্যাথলিক, এবং ক্রিমিয়ার কমরেডদের মধ্যে অনেক, বিশেষ করে যারা আইরিশ, রোম্যান ক্যাথলিক ছিলো।

এরপরে ইংল্যান্ডের ধর্ম আন্দোলনের কথা উঠেছিলো। বাগচী হাসিমুখে বললো,—ডানকান আপনাকে ইভানজেলিস্ট এবং সেন্ট বলেছিলো।

কীবল হেসে বললো,—আমাদের বন্ধু এসব ব্যাপারে পুরনো খবর রাখেন। তিনি অবশ্য ইভানজেলিস্টদের যে এক সময়ে সেন্ট বলে ঠাট্টা করা হতো সে খবর রাখেন। কিন্তু এখন সেসব দিন বেশ বদলেছে।

এরপরে যে আলাপ হলো তা ইংল্যান্ডের ধর্ম আন্দোলন সম্বন্ধে। বাগচী মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে এবং কীবল তার উত্তর দিয়ে যে আলোচনা তৈরি করলো তাকে সংক্ষেপে এরকম বলা যায়: রাষ্ট্রস্বীকৃত এবং সুতরাং বৃত্তিপ্রাপ্ত পুরোহিত সম্প্রদায় যে ক্রমশই জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিলো, তার প্রমাণ তৎকালীন র‍্যাডিক্যাল প্রেসের বিদ্রূপ, পরিহাস, ক্যারিকেচার। ১৮৩১-এ রিফর্ম বিলের বিরুদ্ধে হাউস অব লর্ডস ধর্মীয় পীয়ররা ভোট দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষকেই বরং জ্বালিয়ে তুললেন। সেই বছরের শীতকালে রিফর্মসমর্থক জনতা বিশপদের গাড়িতে ঢিল ছুঁড়ে এবং তাদের প্রাসাদে আগুন দিয়ে শুধু ছেলেমানুষি আনন্দই করেনি, প্রাপ্তবয়স্কের ক্রোধও দেখিয়েছিলো।

ভয়সন্ত্রস্ত চার্চম্যানেরা এবং তাদের উল্লসিত প্রতিপক্ষও স্থির করে নিয়েছিলো

১৮৩৩-এর পার্লামেন্টের প্রথম কাজই হবে ডিসেন্টারদের স্বীকৃত অভিযোগগুলো দূর করা। এরকম অনুমান হতো ধর্মে আর রাষ্ট্রের একচেটে অধিকার থাকছে না। বরং ধর্মীয় লর্ডদের যাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ উঁচুতলায় অন্যশ্রেণীর লর্ডদের সঙ্গে, তাদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও জনসাধারণের যে কোন একজনেরই যে বাইবেল থেকে ধর্ম প্রচারের অধিকার আছে তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো।

বলা বাহুল্য ডিসেন্টার এবং এভানজেলিস্টদের জনপ্রিয়তার কারণ যতখানি ধর্মসম্বন্ধে তাদের ঐকান্তিকতা এবং ঠিক ততখানিই তাদের সমাজসেবার আগ্রহ। উইলবারফোর্স এবং বাক্সটন যাঁরা ক্রীতদাসপ্রথা লোপ করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা মনে প্রাণে এভানজেলিস্ট ছিলেন সন্দেহ নেই। বেন্থামের সেই কথাটাও মনে রাখতে হবে। তিনি বলেছিলেন সমাজের অন্যায় দূর করলে যদি সেন্ট বলে বিদ্রূপ করা হয় তবে তিনি সেন্ট অথবা এভানজেলিস্ট হতে আপত্তি করবেন না।

অন্যদিকে কেউ কেউ এখনই মনে করে ডিসেন্টারদের প্রাদুর্ভাব যে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। শিল্পবিপ্লবে কিছু কিছু শ্বেতকায় ক্রীতদাস তৈরি হয়েছিলো। ডিসেন্টারদের সকলকেই অল্পবিস্তর তাদের উন্নতির চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে। এককথায় হাই চার্চ-এর তারা যেমন রাজা, লর্ড, বিশপ এবং ধনীজমিদার ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে, লো চার্চ-এর ওরা তেমন মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত যারাই আকাশের তলে মাথা তুলতে চাইছিলো তাদের প্রতিভূ ছিলো এরকম মোটামুটি বলা যায়।

কিন্তু কেট এলো। সে ইতিমধ্যে লাঞ্চের ফ্রায়েড রাইসের জল বসিয়ে এসেছে উনুনে। বাগচীকে বললো,—তুমি স্নান করবে তো? আমি বসি বরং অতিথির কাছে।

বাগচী উঠলো। অতিথিকে 'কিছুক্ষণের জন্য মাপ করুন' বলে স্নান করতে গেলো সে।

কেট বললো,—এখানে আপনার নিশ্চয় অসুবিধা হচ্ছে। আউটল্যান্ডিশ মনে হয় না?

—আউটল্যান্ডিশ? কীবল বললো,—রোম্যান্টিক বরং, কিংবা রোম্যান্টিক বিষয়টাতেই আউটল্যান্ডিশ ভাব থাকে না? কিন্তু আপনি আমাকে মাপ করবেন যদি আমি আপনাদের ছবিগুলোকে ভালো করে দেখি।

—স্বচ্ছন্দে। বলে কেট উঠলো। বললো—আসুন।

ম্যান্টেলপিসের উপরে প্রিন্ট। বেশ খানিকটা সময় নিবিষ্ট হয়ে সেটিকে দেখলো কীবল। বললো,—ক্রাইস্ট চার্চ নাকি?

কেট বললো,—আগে ছবির তলায় পরিচয় লেখা ছিলো। নতুন করে ফ্রেমে পরানোর সময়ে ঢেকে গিয়েছে। ঠিক বলতে পারি না। এটা বোধহয় এ কারম্যানের প্রিন্ট, এরকম শুনেছিলাম মনে পড়ছে।

—কিন্তু এসব প্রিন্ট এখন ইংল্যান্ডেও দুর্লভ।

প্রিন্ট ছবিটা দেখে বিপরীত দিকের দেয়ালের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সেই জলরং ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কীবল। একটু উপরে ছবিটা। ঘাড় উঁচু করে দেখতে হয়। স্বদেশের দৃশ্য। চিত্রীও সুনিপুণ। কীবল মুগ্ধ হয়ে গেলো। ছবি দেখতে দেখতেই সে জিজ্ঞাসা করলো,—এটা কি মূল ছবি। তাই যেন মনে হয়। টার্নার নাকি?

কেট পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। সে বললো,—না টার্নার নয়। এ জানতাম। এ ছবিটাও আমার বাবার সংগ্রহ। তার কাছে শুনেছিলাম এটা নরউইচ স্কুলের। দস্তখতটাকে দেখুন, কটম্যান মনে হয় না।

ছবিটাকে আর একটু ভালো করে দেখার জন্য পিছিয়ে আসতে গিয়ে ছেলেমানুষি কেলেঙ্কারি ঘটালো কীবল। ধাক্কা লাগলো বেশ জোরেই কেটের গায়ে, বোধ হয় কেটের বাঁ পায়ের পাতাটা কীবলের জুতোর গোড়ালিতে চাপা পড়লো।

তাড়াতাড়ি ফিরে সে মুখ লাল করে ক্ষমা চাইলো। কেটের মুখও লাল হয়ে উঠেছিলো। মুহূর্তের মধ্যেই হেসে কেট বললো,—এ কিছুই নয়, আসুন বরং—

কীবল বললো,—আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করে ক্ষমা করুন।

সাময়িক বিড়ম্বনাকে ঢাকতে কেট বললো—আসুন তার চাইতে বরং আপনার যুদ্ধের কথা শুনি।

কীবল বললো,—দেখুন মিসেস বাগচী, এমন আশ্চর্য লাগছে আমার এখানে। আমি নিজেই ঠিক পাচ্ছি না কখন ম্যানার্সের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছি।

—তা যাচ্ছে না। হয়তো ক্রিমিয়ার অভিজ্ঞতা আপনাকে কিছুটা ননকনভেনশ্যনাল করেছে। কেট হাসলো মিষ্টি করে।

বাগচী স্নান করে ফিরে এলো। বাড়িতে যার অতিথি তেমন গৃহকর্ত্রীরও বসে থাকা চলে না বিশেষ যদি সংসারের কাজ নিজে করতে হয়।

বাগচী বললো,—এটা কিন্তু খুব মজার ব্যাপার। আমরা যখন ভাবতাম মানুষ ধর্মের কাছে থেকে সরে যাচ্ছে, তখনই ধর্মটা আবার সর্বত্র প্রবল হয়ে উঠছে, তাই নয়! নতুন রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে আমাদের মত না মিলতে পারে, কিন্তু তাদের সে ব্যাপারটায় একটা ঐকান্তিক অনুসন্ধান ধরা পড়ে, কেমন তাই মনে হয় না।

কীবল বললো,—ঐকান্তিকতা তো বটেই। নিউম্যান, পুসে, কীবল ম্যানিং প্রত্যেকেই ধর্মের ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহশীল তাতে সন্দেহ কী?

লাঞ্চে বসেও আবার এই ধর্মের কথাটাই উঠে পড়লো।

বাগচী বললো,—কি লন্ডনে কি ক্যালকাটায় শিক্ষিত মানুষমাত্রেই এখন ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখুন। প্রচলিত পদ্ধতি যাচাই করে দেখছে অনেকেই। নতুন পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে যেন ঈশ্বরের দিকে। এসব খুবই ভালো, তুমি কি বলো কেট?

কেট বললো,—সত্যর কাছে পেঁাছানোর আগ্রহ বলছো?

—আমার তো তাই মনে হয়। মিস্টার কীবল, আমি শুনেছিলাম শিক্ষিত সংস্কৃতিবান যুবকদের নিউম্যান, কীবল প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিরা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন। আপনার কি মনে হয় রোম্যান ক্যাথলিকদের সংখ্যা ইংল্যান্ডে এখন বিশেষভাবে বাড়বে?

একটু জল খেয়ে নিয়ে কীবল বললো,—তা বলা শক্ত কিন্তু। ১৮৪৫ পরে অর্থাৎ নিউম্যান রোম্যান ক্যাথলিক বলে দীক্ষিত হওয়ার পরই অক্সফোর্ড আন্দোলন দুভাগ হয়ে গিয়েছে। পুসে ও কীবলের অ্যাংলো ক্যাথলিক; নিউম্যান ম্যানিং-এর রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়।

—কেন তার কি দরকার ছিলো। কেট জিজ্ঞাসা করলো।

—রোমান ক্যাথলিকদের পক্ষে শিক্ষা, কালচার, এবং ধর্মে অনুরাগ থাকলেও সেই মতবাদ যে চট করে ইংল্যান্ডে বেড়ে উঠবে তা মনে হয় না। ভেবে দেখুন ১৮৫০-এ পোপ কয়েকজন রোমান ক্যাথলিক বিশপের এক্তিআর ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে "পোপের আক্রমণ" বলে যে আন্দোলন তৈরি হয়েছিলো তা এখনও থিতিয়ে যায়নি। ইংল্যান্ডে এখনও রোম্যান ক্যাথলিকদের সহ্য করা হচ্ছে কিন্তু পোপের প্রভাব রাজনীতির দিকে এগিয়েছে মনে করা

মাত্র ইংল্যাণ্ডে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। তাই স্বাভাবিক নয়? এবং এই কারণেই অ্যাংলো ক্যাথলিক হয়েছেন কেউ কেউ। দেশপ্রেমের তো টান একটা আছে। (কীবল এই জায়গায় একটু হাসলো।) আপনার মনে পড়বে নেপোলিওনের সঙ্গে যুদ্ধের কিছু আগে থেকেই ডিসেন্টাররা অপদস্থ হচ্ছিলো, জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছিলো তাদের। কারণ সে সময়কার স্বাধীন মতবাদের সঙ্গে ফরাসী জ্যাকোবিনিজমের মিল আন্দাজ করা হচ্ছিলো।

বাগচী বললো,—হাঁ তা বটে। এরকমও শুনেছি। এ তো ভেবে দেখার মতো।

সে কৌতুক বোধ করলো। যেন মনে মনে বললো স্বাজাত্যবোধ এবং বিদেশীধর্ম যতই বলো ধর্ম জাতি দিয়ে বিভাজ্য নয়। আসলে কিন্তু ধর্ম জাতীয়তার সীমা লঙ্ঘন করলেই মুস্কিল।

পরবর্তী কালে কীবল অনুভব করেছে সেদিনকার লাঞ্চটা ভালোই হয়েছিলো যার অন্য বিশেষণটা হয়তো ইনফর্ম্যালও হতে পারে। আলাপটা কি লাঞ্চের আগে কি লাঞ্চের সময়ে বেশ উত্তেজক হয়ে উঠছিলো। কিংবা তার অন্য নাম ঐকান্তিক। অথবা বলা যেতে পারে সোস্যাইটি থেকে বহুদূরে থাকার ফলে এদের কথাবার্তা চালচলনে সমাজের কোন আদর্শ মেনে চলার তেমন ঝোঁক না থাকায় আড়ষ্টভাবটা ছিলো না।

লাঞ্চের পরে ইউরোপের সভ্যতার উপরে পেগানদের প্রভাব কিছু আছে কিনা, রেনেশাঁয় তা কতটা খুঁজে পাওয়া যায় এমন আলোচনা হবে বলে মনে হয়েছিলো একসময়ে। তারুণ্যের ফলে কীবলের যেন আলোচনার বাতিক আছে। কিন্তু এদেশের খাদ্য সুস্বাদু হতে পারে, কেট বলেছিলো অতি সহজপাচ্যও, কিন্তু তা ভারি আর যেন আয়েশ করতে প্ররোচনা দেয়। লাঞ্চের ওজনটা ভারই ছিলো, মদের পরিমাণই বরং কম। এবং একটু ঝাল বেশী।

পথে বেরিয়ে, তার ঘোড়া তখন ছুট করছে, কীবলের মনে হলো সে তার আত্মিক-ভগ্নীকে এরপরেই যে চিঠি লিখবে তাতে একারম্যানের প্রিন্ট সম্বন্ধে না হক নরউইচ স্কুলের কট্‌ম্যানের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে বলবে। রাস্কিনের বই-এ কটম্যান সম্বন্ধে বলা আছে নাকি জানতে পারলে ভালো লাগবে।

ঠিক এই সময়েই তার মনে হলো নাচতে গিয়ে সঙ্গিনীর পা মাড়িয়ে দেয়া যেন। না, সে কথা আত্মিকভগ্নীকে লেখা যায় না বোধহয় সেই কবোষ্ণ অনুভূতির কথা। অথচ এটা অ্যাক্‌সিডেন্ট ছাড়া কিছু নয়। এবং ভদ্রলোকের তা মনে রাখা উচিত নয়। না, উচিত হয় না।

কীবল অন্যদিকে মন দিলো, অর্থাৎ লাগাম দিয়ে আঘাত করে ঘোড়াটার গতি বাড়ালো।

[ক্রমশ]

রীতি বিষয়ক আলোচনা

(যুক্তিকে সুপরিচালিত করার জন্য এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধানের তাগিদে)

রনে দেকার্ত

আমি ছিলাম তখন জার্মানিতে, যুদ্ধ[১] উপলক্ষে সেখানে আমার ডাক পড়ে—যুদ্ধ চলছে তখনো। সম্রাটের[২] অভিষেক হতে ফিরছি সেনা-শিবিরের দিকে, পথে শীতের প্রাদুর্ভাবে থামতে হয়েছে এক জায়গায়। সেখানে না ছিল কথা বলে সময় কাটানোর মতো লোক, ভাগ্য-ক্রমে না ছিল এমন কিছু চিন্তা বা আগ্রহও যা আমায় ব্যস্ত রাখতে পারত—সারাদিন আমি তাই নিজেকে একলাটি বন্ধ করে রেখেছিলাম ছোট্ট ঘরে, আগুনের উত্তাপে, সারাক্ষণ যা-খুশী ভাববার অনন্ত অবকাশ নিয়ে। যে-সব ভাবনা তখন আমার মনে আসছিল, তার প্রথম একটি হল এই বিচার যে মানুষ যখন একলা কোনো কাজ সম্পন্ন করে, তাতে একটি সম্পূর্ণতার ছাপ পাওয়া যায়—যেটা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় না সেই সব একাধিক বিভাগ-যুক্ত কাজে যা নাকি অনেকে মিলে অনেক হাত লাগিয়ে সম্পন্ন করেছে। তাই দেখা যায় যে-সব বাড়ী নির্মিত হয়েছে কোনো বিশেষ স্থপতির দ্বারা, তাদের একটি সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার ভাব আছে—যেটা পাওয়া যাবে না অনেকে-মিলে সম্পন্ন করা বাড়ীঘরে। এই শেষোক্ত ধরনের নির্মাণে দেখা যাবে কোনোরকমে খাপ খাওয়ানোর এক চেষ্টা, কখনো কোনো পুরাতন প্রাচীরকে কাজে লাগানো, যদিও সে-প্রাচীর মূলে হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। তাই বহু প্রাচীন সহর, যার সূত্রপাত হয় ছোট-ছোট জনপদ হিসেবেই, কালে-কালে আজ তা বিরাট-বিরাট নগরীতে পরিণত। কোনো বাস্তুকার তাঁর খেয়াল-খুশীতে সমতল-ভূমির উপর যে-সঙ্গতি-পূর্ণ চক-এর পরিকল্পনা করতে পারেন, সেই তুলনায় এই নগরীগুলি অতি অসমঞ্জস, যদিও সেখানকার প্রাসাদ বা বাড়ীঘরগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে হয়তো প্রায়ই তাদের মধ্যে অন্য যে-কোনো সহরের যে-কোনো প্রাসাদের মতো একই বা ততোধিক শিল্প-সৌন্দর্য আবিষ্কার করা সম্ভব। তবু যখন দেখা যায় এসব নগরীতে বাড়ীঘরগুলি কীভাবে বিন্যস্ত, এখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে একটা বড় বাড়ী, ওখানে ছোট বাড়ী, এবং যার ফলে রাস্তাগুলি অসমান ও সর্পিল, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এভাবে এদের সাজিয়ে রাখাটা নেহাৎই অদৃষ্টের ফল, এর পিছনে যুক্তিসম্পন্ন মানুষের কোনো ইচ্ছা কাজ করেনি। এবং যখন ভাবা যায় ব্যক্তিবিশেষের বাসভূমি রক্ষণাবেক্ষণের ভার সব কালেই পৌর কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত থেকেছে, এগুলিকে সর্বসাধারণের সম্পদ হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তাদেরই, তখন সহজেই বোঝা যাবে অন্যের তৈরী জিনিসের উপর পরিশ্রম করে বড় কিছু অর্জন করা কেন এত শক্ত। আমার তাই মনে হয়েছে সেই সব জাতির কথা যারা আগে অর্ধ-বর্বর ছিল, যারা সভ্য হলেও আস্তে-আস্তে এবং ক্রমাগত খুনখারাপি ও কলহজনিত অস্বস্তিকর অবস্থা এড়ানোর জন্যই বাধ্য হয়েছে তাদের নিয়ম-কানুন খাড়া করতে—ভেবেছি তারা কখনোই ততটা সুশাসিত হতে পারবে না যতটা পারবে সেই অন্যশ্রেণীর মানুষেরা যারা নাকি একত্রে মিলিত হয়েই একেবারে প্রথম থেকে মানতে পেরেছে বিচক্ষণ কোনো বিধান-প্রণেতার অনুশাসন। ঠিক যেমন সুনিশ্চিত, যে-সত্য ধর্মের নির্দেশদাতা ঈশ্বর[৩] স্বয়ং, তার বিধিব্যবস্থা অন্যান্য যে-কোনো ধর্ম হতে অতুলনীয়ভাবে শ্রেয়। এবং মানুষ-সম্পর্কিত বিষয়ের প্রশ্ন যদি তুলি তো আমার মনে হয় যে স্পার্টা[৪] নগরী যদি এককালে অতি সমৃদ্ধিশালী হয়ে থাকে, তা সেই

নগরীর প্রত্যেকটি রাজনীতির কোনো বিশেষ সদগুণের দরুন নয়—বরং সেই রীতিনীতির অনেকগুলিই ছিল বেশ একটু বিচিত্র ধরনের, এমন-কি শিষ্টাচারের বিরোধী পর্যন্ত—তার কারণ হল এই যে যেহেতু রীতিনীতিগুলির আবিষ্কর্তা মাত্র একটি ব্যক্তি, সেগুলি সব একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে পেরেছিল। তাই আমি ভেবেছি বই-এ যত বিজ্ঞানের কথা থাকে, অন্তত যে-বিজ্ঞানের যুক্তি শুধু সম্ভাব্য মাত্র, সর্বপ্রমাণবিহীন, এবং যা গড়ে উঠেছে, পুষ্ট হয়েছে বিভিন্ন জনের নানান মতামত নিয়ে, তা সত্যের ততো কাছে কিছুতেই যেতে পারবে না, যতটা নাকি স্বভাবতই পারবে কোনো বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ মানুষের সরল বিচারশক্তি। এবং সেই কারণেই আমি এটাও ভেবেছি যে যেহেতু মানুষ হওয়ার আগে আমরা সকলেই শিশু ছিলাম[৩] এবং যেহেতু অনেকদিন ধরে আমাদের সকলকেই এক-দিকে আমাদের সাধ-আকাঙ্ক্ষা ও অন্যদিকে আমাদের উপদেষ্টাদের দ্বারা চালিত হতে হয়েছে —এবং এই দুটি প্রায়ই পরস্পরবিরোধী, তারা একে-অন্যে যত পরামর্শ দিয়েছে, তাকেও হয়তো সব সময় সেরা বলতে পারব না—তাই আমরা যে কোনো অনাবিল বা বলিষ্ঠ যুক্তি-শক্তিতে সম্পন্ন হব, সেটা প্রায় অসম্ভব। সেটা সম্ভব হতে পারত যদি একেবারে জন্ম হতে আমাদের যুক্তিশক্তি সম্পূর্ণ আমাদেরই করায়ত্তে থাকত এবং একমাত্র তার দ্বারাই আমরা চালিত হতাম।

কোনো সহরের সমস্ত বাড়ীগুলিকে ভূমিসাৎ করে ফেলতে হবে, শুধু যাতে তাদের নতুনভাবে গড়া যায় এবং রাস্তাগুলিকেও আরো সুচারুরূপে বিন্যস্ত করা চলে, এটা ভাবা যায় না, সত্যই। যদিও অনেককে সেটা করতে দেখা যায়, পুরনো বাড়ী নতুন করে গড়ার জন্য সেগুলিকে ভেঙে ফেলতে তারা কখনো-কখনো বাধ্যও হয়, বিশেষত যখন সেই সব বাড়ীর ভিত্তি দৃঢ় না হয় এবং তাই আপনা থেকেই একদিন তাদের ধসে পড়ার আশংকা থাকে। এই দৃষ্টান্ত স্মরণ করে আমি এটাও মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে আমূল সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে একেবারে ভিত থেকে একটি রাষ্ট্রের সব কিছু উল্টে-পাল্টে দিতে চাওয়া যুক্তিযুক্ত ঠেকতে পারে না, যেমন যুক্তিযুক্ত হবে না যাবতীয় বিজ্ঞানের কলেবরে আমূল সংস্কার-সাধনের কোনো ইচ্ছা বা বিদ্যালয়ে সেই সব বিজ্ঞান পড়ানোর প্রচলিত রীতি পাল্টে দিতে চাওয়া। শুধু আমি যা করতে পারি, তা আজ পর্যন্ত যত মতামতকে সত্য বলে সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করেছি, সেগুলির হাত থেকে অন্তত একটি বারের জন্য নিজেকে নিষ্কৃতি দেওয়া—যাতে আমার যুক্তির[৩] সমান-সমান করে তাদের দাঁড় করাতে পারি, এবং দরকার হলে পরে হয় তাদের সস্থানে আবার প্রতিষ্ঠা করি, অথবা তাদের জায়গায় আরো ভালো অন্য কোনো মতামত বসাই। তাই এ-বিশ্বাস আমার দৃঢ় যে পুরনো ভিত্তির উপর কিছু নির্মাণ করতে আর না চেয়ে যদি এই নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করি তো নিজের জীবনটাকে আরো অনেক সুষ্ঠুভাবে চালিত করতে আমি সমর্থ হব—সেই সব তত্ত্বের উপর আর নির্ভরশীল থাকা নয়, যাদের ছেলেবেলা থেকে কোনো প্রশ্ন না করেই মেনে নিয়ে এসেছি, তারা যথার্থই সত্য কিনা, সেটা একবারও পরখ করে দেখিনি। মানছি, এ-পথে বাধা অনেক, তবু সে-বাধা এমন নয় যে তার সমাধান নেই, এবং জনসাধারণ-সম্পর্কিত তুচ্ছতম বস্তুর সংস্কার-সাধনে যে-ধরনের বাধা জাগতে পারে, তার তুলনায়ও এ-বাধা কিছুই নয়। কারণ জনসাধারণ-সম্পর্কিত যে-কোনো জিনিসই এত বড় যে একবার ভেঙে ফেললে তাদের আবার দাঁড় করানো বেজায় শক্ত, একবার যদি নাড়া খেয়ে থাকে তারা তো তাদের ধরে রাখাও সমানই কষ্টকর—তাদের পতন রূঢ় হতে বাধ্য। এবং তাদের দোষত্রুটির কথা যদি ধরি—অবশ্য দোষত্রুটি যদি থাকেই, এবং সেটা আছেও,

প্রমাণ হিসেবে তাদের নিজেদের মধ্যে হাজার পার্থক্যটাই তো যথেষ্ট—সেক্ষেত্রেও, ব্যবহারের ফলে সেই দোষত্রুটির ধার অনেক কমে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঐ একই ব্যবহারের দরুন দোষত্রুটিগুলির একটা বিরাট অংশ হয় আপনা থেকে সংশোধিত হয়ে গেছে, নয়তো তার সম্ভাবনাকে মানুষ এড়াতে পেরেছে—যেটা শুধু সুচিন্তিত সতর্কতা অবলম্বন করলে এত ভালো সাধিত হত না। তাছাড়া, তাদের বদলাতে গেলে যে-দশা হবে, তার থেকে যেন দোষ-ত্রুটিগুলিকে মেনে নেওয়াই প্রায় সবক্ষেত্রে আরো সহজে সহনীয়। ঠিক যেমন পাহাড়ের লম্বা-লম্বা আঁকাবাঁকা পথ যা বহু ব্যবহারের ফলে আস্তে-আস্তে এত মসৃণ ও সুগম হয়ে ওঠে যে পাহাড়ের উপরে যেতে গেলে সেই পথ নেওয়াই বহুগুণে শ্রেয় সরাসরি উঠতে চাওয়া থেকে—কারণ সরাসরি উঠতে গেলে কখনো একটার পর একটা পাথরের চাঁই-এ আরোহণ করতে হবে, কখনো বা নামতে হবে খাদের অতলে।

তাই জন্মগত বা ভাগ্যগত কোনো অধিকারই যাদের নেই সরকারী বিষয়-কর্মের তদারকে এবং তা সত্ত্বেও অন্তত চিন্তায় যারা সব সময় নতুন-নতুন সংস্কার-সাধনে উৎসুক, তাদের সেই বিভ্রান্তিকর ও অস্থির মতির সমর্থন আমি কিছুতেই করতে পারব না। এবং যদি ভাবতাম এ-রচনায় এমন সামান্যতম কিছুও আছে যার দ্বারা আমার মধ্যে অনুরূপ কোনো মূর্খতার অস্তিত্ব নিয়ে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে, তাহলে এটিকে প্রকাশ করতে আমি দুঃখই পেতাম। শুধু নিজের চিন্তাভাবনার সংস্কার-সাধনের চেষ্টা এবং সম্পূর্ণ আমার নিজেরই ভিত্তি থেকে নতুন কিছু গড়ার জন্য পরিশ্রম করা—আমার অভিপ্রেত এই সীমানার বাইরে কখনো যায়নি। এই কাজটা আমার খুব ভালো লেগেছে বলেই তার একটা নকশা এখানে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, তবু তার অর্থ এই নয় যে এটাকেই অনুকরণ করার জন্য আমি কাউকে পরামর্শ দিতে চাই। ঈশ্বরের করুণা আরো বেশি যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষে উন্নততর কোনো পরিকল্পনা হয়তো সম্ভব, যদিও আমার ভয় আমারটি অনেকের কাছে ইতিমধ্যেই একটু অতি মাত্রায় স্পর্ধিত বলে ঠেকতে পারে। এতদিন ধরে যত মতামতে বিশ্বাস করে এসেছি, আজ সেগুলিকে বাতিল করে দেওয়ার এই সঙ্কল্পের দৃষ্টান্তটি যে প্রত্যেককে অনুসরণ করতে হবে তা নয়, এবং পৃথিবী মোটামুটি যে-দুই শ্রেণীর লোকে বিভক্ত, তাদের কারুরই পক্ষে এটি একেবারেই সুবিধারও নয়। সেই দুই শ্রেণীর লোকের একটি হল তারা যারা নিজেদের যতটা চালাক মনে করে, আসলে ততটা নয়, তাই তারা তাড়া-হুড়ো করে তাদের মতামত না জানিয়ে পারে না—নিজেদের চিন্তাগুলিকে শৃঙ্খলায় চালিত করবে, এমন ধৈর্যও তাদের নেই। এর ফলে যত তত্ত্বে তারা বিশ্বাস করে এসেছে আগে থেকে, একবার যদি তাতে সন্দেহ তোলার সিদ্ধান্ত নেয়, দূরে সরে যেতে চায় প্রচলিত পথ থেকে, তখন সোজা চলার সেই অন্য রাস্তাটিতে তারা কিছুতেই ঠিক থাকতে পারবে না, সারা জীবন ঘুরে মরবে পথভ্রষ্ট হয়ে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হল সেই তারা যাদের বুদ্ধি ও বিনয় যথেষ্ট পরিমাণে আছে—তাই তারা জানে যাঁদের কাছে তারা উপযুক্ত শিক্ষা পেতে পারে, সেই সব ব্যক্তির তুলনায় সত্যকে মিথ্যা হতে পৃথক করার ক্ষমতা তাদের কম, এবং সেই কারণেই আরো ভালো মতামতের সন্ধানে নিজেরা না গিয়ে তারা বরং সন্তুষ্ট থাকে অন্যের দেখানো পথ অনুসরণ করেই।

আমি নিজে ঐ দ্বিতীয় দলেই নিশ্চয় পড়তাম যদি শিক্ষক হিসেবে একটি ভিন্ন দুটি ব্যক্তিকে কখনো না পেতাম বা যদি জানতেই পারতাম না নানা মুনির নানা মতে কী পার্থক্য চিরকাল ধরে রয়েছে। কিন্তু, প্রথমত, যেহেতু সেই বিদ্যালয়ের সময় হতেই আমি জানি যে

এমন কোনো নতুন বা আশ্চর্য কথার কল্পনাও করা চলে না যা দার্শনিকদের কেউ-না-কেউ আগেই বলে যাননি; দ্বিতীয়ত, যেহেতু পরে যখন ভ্রমণে বেরিয়েছি, দেখেছি কোনো শ্রেণীর লোকদের হাবভাব আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বলেই যে তারা বর্বর বা বন্য হবে, এমন নয়—বরং তাদের অনেকেই আমাদের মতো বা আমাদের চেয়ে আরো বেশি করে যুক্তিশক্তিকে কাজে লাগায়; তৃতীয়ত, যেহেতু দেখেছি যে-লোক ছেলেবেলা থেকে শুধু ফরাসী বা জার্মান-দের সংস্পর্শে বড় হয়েছে, সেই একই লোক তার একই চিন্তাধারা নিয়ে কীরকম ভিন্ন ব'নে যেতে পারে যদি তাকে সারাটা জীবন চীনা বা নরখাদকদের মধ্যে কাটাতে হয়; চতুর্থত, যেহেতু এটাও তো দেখেছি যে আমাদের জামাকাপড়ের ব্যাপারে পর্যন্ত আজ যে-পোশাকটাকে মনে হয় অতিরিক্তভাবে অদ্ভুত ও হাস্যকর, সেটাই ভালো লাগত দশ বছর আগে এবং হয়তো আবার ভালো লাগবে আগামী দশ বছরের ভিতরেও; অতএব বোঝা যাচ্ছে কোনো নিশ্চিত জ্ঞানের চেয়ে একমাত্র প্রথা ও দৃষ্টান্তই কোনো বিশেষ পথে চলতে আমাদের প্ররোচিত করে, এবং অনেকে এক বাক্যে কিছু বলছে বলেই যে সেটা দুরূহ কোনো সত্যের আবিষ্কারে সহায়ক হবে, তাও নয়। বরং এটারই সম্ভাবনা আরো বেশি যে সেই সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছে একটি বিশেষ কোনো ব্যক্তিই, সমগ্র জাতি নয়। আমি তাই এমন কাউকেই খুঁজে পেলাম না যার মতামত অন্যদের থেকে আমার কাছে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য ঠেকতে পারে—ফলে বাধ্য হলাম নিজের পথ নিজেই বেছে নিতে, নিজেই নিজেকে চালিত করতে।

কিন্তু ঘন অন্ধকারে যে-পথিক একলা হাঁটে, তার মতো আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এত আস্তে চলার এবং সব ব্যাপারে এত সতর্কতা অবলম্বন করার যে এগোলাম না-হয় অতি ধীরে ধীরেই, তবু অন্তত খানায় পড়ার ভয়টা যেন না থাকে। এমন-কি যে-সব মতামত যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হয়েই আমার বিশ্বাসে আগে ঢুকে পড়ে থাকতে পারে, তাদেরও একটিকেও যথেষ্ট সময় নিয়ে বিচার না করে আমি পুরোপুরি বাতিল করতে চাইলাম না যে-কাজের পরিকল্পনা আমি গ্রহণ করেছি, তার পক্ষে এই বিচারটির দরকার, যাতে যে-সত্য রীতির অনুসন্ধানে রয়েছি, তার দ্বারা প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান অর্জনে আমার মন যথাসম্ভব সক্ষম হয়।

বয়স যখন কম ছিল, দর্শনের নানা শাখায় বিচরণ করতে করতে অল্প একটু যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলাম, এবং গণিতশাস্ত্রগুলি পড়তে পড়তে মেতেছিলাম কিছু বীজগণিত ও কিছু জ্যামিতির বিশ্লেষণে—মনে হয়েছিল, এই তিনটি শিল্প বা বিজ্ঞান আমার পরিকল্পনায় সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তাদের পরীক্ষা করতে গিয়েই একটু সাবধান হতে হল—কারণ, যুক্তিবিদ্যার কথা যদি ধরি, তো দেখলাম তার ন্যায় ও অন্যান্য নির্দেশগুলির[৭] অধিকাংশই যেটা মানুষে আগেই জানে[৮], শুধু সেটাকেই ব্যাখ্যা করার কাজে লাগে। অথবা লুল্-এর[৯] পদ্ধতির মতো, যা মানুষে জানে না, তার সম্বন্ধে এই নির্দেশগুলি যুক্তিহীন মন্তব্য করে চলে, কিন্তু মানুষে যেটা জানে বা যেটা জানে না, তার কোনোটাই শেখাতে সাহায্য করে না। এবং যদিও এদের মধ্যে বহু নির্দেশ আছে যা অতি সত্য ও অতি ভালো, এমন নির্দেশেরও কিছু অভাব নেই যা ক্ষতিকর বা নিষ্প্রয়োজন, এবং সবই এমন একাকার হয়ে মিলেমিশে আছে যে একেবারে অখোদিত এক মর্মর প্রস্তরখণ্ড হতে যেমন সরাসরি কোনো ডায়েনা বা মিনার্ভা দেবীর মূর্তি টেনে বার করা অসম্ভব, ঠিক তেমনই শক্ত এদেরও একের থেকে অন্যকে পৃথক করা। পরে যদি প্রাচীনদের[১০] বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও আধুনিকদের বীজগণিতের প্রসঙ্গে আসি তো দেখি যে তাদের বিস্তার শুধু অতীব বিমূর্ত এমন বিষয় বা বস্তু নিয়ে যার কোনো প্রয়োগ সম্ভব বলে মনে হয় না। তাছাড়া প্রথমটি অর্থাৎ প্রাচীনদের বিশ্লেষণ-পদ্ধতিটি

সর্বদাই রেখাচিত্রের বিচার-বিবেচনায় এত ব্যস্ত যে তা বুঝতে গেলে কল্পনাশক্তিকে রীতি-মতো ক্লান্ত না করে উপায় নেই। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আধুনিক বীজগণিতের ব্যাপারেও দেখি, এমন কোনো-কোনো নিয়ম-কানুন ও রাশির খপ্পরে সেখানে সব সময়ই পড়তে হয় যে শেষ পর্যন্ত জিনিসটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা গোলমেলে ও দুর্বোধ্য বিদ্যা[১১], যা চর্চার জন্য কোনো যথার্থ বিজ্ঞানে পরিণত হওয়ার বদলে চিত্তকে শুধু ভারাক্রান্ত করে। এরই ফলে ভাবতে প্রবৃত্ত হলাম যে এবার এমন একটা অন্য রীতির সন্ধান না করলে নয় যার মধ্যে ঐ তিনটি[১২] পদ্ধতির সমস্ত গুণগুলি বর্তমান থাকবে, কিন্তু তাদের দোষগুলির একটিও থাকবে না। তবে নীতির বাহুল্য প্রায়ই পাপের অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়—যেমন বিধান যত কম থাকে, রাষ্ট্র তত সুপরিচালিত হয়, বিধানের সংখ্যা সামান্য বলেই প্রতিটি পালিত হতে পারে যথাযথ যত্নের সঙ্গে। সেইরকমই, যুক্তিবিদ্যার অমন বহুসংখ্যক নির্দেশের পরিবর্তে আমি নিচ্ছি নিম্নলিখিত চারটি বিধান মাত্র, যা মনে হয় আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে, অবশ্য যদি তাদের অনুসরণে একটি বারের জন্যও আমার দিক থেকে ত্রুটি না হয়, যদি এই সংকল্পে সদাসর্বদা আমি অবিচল থাকতে পারি।

বিধান চারটির প্রথমটি হল, কোনো জিনিসকেই আর সত্য বলে গ্রহণ করব না যতক্ষণ-না সেই জিনিস স্বতঃপ্রমাণিতভাবে সত্য বলে আমার দ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে[১৩]। অর্থাৎ, সযত্নে পরিহার করতে হবে অত্যধিক ত্বরা বা তাড়াহুড়োর ভাব এবং সকল পূর্ব-ধারণা—এবং একমাত্র সেই জিনিসটিকেই আমার বিচারে গৃহীত বলে মেনে নেব যা চিত্তে প্রতিভাত হয়েছে অতি পরিষ্কার ও উজ্জ্বলভাবে ও সে-কারণে তাকে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ পরে আর ঘটবে না।

দ্বিতীয়টি হল, বিচার করতে বসে যেই কোনো সমস্যা জাগবে, অমনি সেটিকে যত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে পারি বিভক্ত করে নেব, যাতে তার সমাধান আরো ভালো করে সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, আমার চিন্তাগুলিকে এমন এক পদ্ধতিতে চালিত করব যাতে সুরু করতে পারি সরলতম জিনিস দিয়ে—যা সবচেয়ে সহজে বোঝা যায়—পরে উঠব একটু একটু করে, ধাপে ধাপে, জানতে একেবারে জটিলতম জিনিসগুলি পর্যন্ত। এমন-কি যে-জিনিসগুলি একের সঙ্গে অন্যে একেবারেই সূত্রবদ্ধ বলে ঠেকছে না, ধরে নেব তাদেরও পরস্পরের মধ্যে একটি শৃঙ্খলার ভাব রয়েছে।

এবং শেষের বিধানটি হল, সর্বত্র এত সম্পূর্ণ পরিগণন করব, এমন এক সমগ্র পুনরীক্ষণ, যাতে নিশ্চিত হতে পারি বিচারে কিছুই বাদ পড়েনি।

লম্বা হলেও যুক্তির এই পদ্ধতির প্রতিটি ধাপই সরল ও সহজবোধ্য, এবং জ্যামিতিজ্ঞরা তাঁদের জটিলতর প্রমাণগুলিতে পেঁৗছানোর জন্য একই পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। এই পদ্ধতিটি নিয়ে ভাবতে বসে আমার মনে হয়েছে, মানুষের জ্ঞানের আওতার মধ্যে যা-কিছু পড়ে, তার সবই একই প্রকারে একে অন্যের অনুসরণ করে—এবং কেবল যা সত্য নয়, তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে যদি বিরত থাকি ও অনুমানের সূত্র ধরে যদি একটি বস্তুর সঙ্গে আরেকটির সম্বন্ধ-নির্ণয়ের রীতিটিতে সদাসর্বদা অবিচল রই, তাহলে যত দূরেরই হোক না কোনো জিনিস, তাতে একদিন-না-একদিন পেঁৗছাবই, যত গুপ্ত হয়েই তা থাকুক না, তাকে খুঁজে বার করবই[১৪]। আর তা করতে গেলে কোন্ পথে এগোনো দরকার, সেটাও খুঁজে নিতে বিশেষ বেগ আমায় পেতে হল না, কারণ আমি তো আগেই জেনেছি আরম্ভ করতে হবে সরলতম জিনিসগুলি দিয়ে যেগুলি বোঝা সবচেয়ে সহজ সেইগুলি প্রথমে ধরে। এবং যখন ভাবি বিজ্ঞানের মধ্যে আজ অবধি যাঁরা সত্যের অনুসন্ধান করেছেন, তাঁদের ভিতরে একমাত্র

গণিতজ্ঞরাই খুঁজে পেয়েছেন কিছু প্রমাণ, অর্থাৎ এমন কিছু যুক্তি যা নিশ্চিত ও স্বতঃসিদ্ধ, তখন আমার সন্দেহ থাকে না যে তাঁরাও তাঁদের বিচারে এই একই পদ্ধতি ধরেই এগিয়েছেন —যদিও চিত্তকে সত্যের দ্বারা পুষ্ট হতে অভ্যস্ত করা বা মিথ্যা যুক্তিতে কিছুতেই সন্তুষ্ট না থাকা ভিন্ন তাঁদের এ-প্রক্রিয়ার অন্য কোনো উপযোগিতার আশা আমি করছি না[১৫]। কিন্তু তার জন্যেই যে লোকে যে-বিজ্ঞানকে সাধারণত গণিতশাস্ত্র[১৬] বলে, তার সকল বিভিন্ন শাখায় আমায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে, এমনও আমি চাইছি না। অবশ্য এটাও দেখেছি, তাদের বিষয়গুলি যত বিভিন্নই হোক না কেন, তারা কোনো একটা জায়গায় এসে মিলিত হয়ই[১৭], কারণ তাদের পৃথক-পৃথক ঠেকছে যেখানে, সেখানে তাদের বিচার্য হল শুধু অন্তর্নিহিত নানান সূত্র বা অনুপাতের সম্বন্ধ-নির্ণয়ই। আমার তাই মনে হয়েছে, এই সূত্র বা অনুপাত-গুলিকেই সাধারণভাবে বিচার করা দরকার, এবং তাদের অস্তিত্ব অনুমান করে নেব একমাত্র সেইসব বিষয়েই যার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন আমার পক্ষে সহজতম হবে। এবং সূত্র বা অনুপাতগুলির সেই পারস্পরিক সম্বন্ধের জ্ঞানটিকে কোনো একটি বিশেষ জায়গায় বদ্ধ রাখাও কিছুতে চলবে না, বরং দেখতে হবে যাতে যেখানে-সেখানে উপযোগী ঠেকে, সেইরকম সকল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই তাকে কাজে লাগানো যায়। সেই সূত্র বা অনুপাতগুলিকে জানার জন্য যেহেতু আমার দরকার পড়তে পারে কখনো তাদের একটি-একটি করে বিচার করার, কখনো-বা তাদের অস্তিত্বটি শুধু মনে রাখার, আবার কখনো-বা তাদের কয়েকটিকে একত্রে গ্রহণ করার, আমি তাই সাবধান হয়ে ভাবতে বসলাম, এবং দেখলাম যে একটি-একটি করে বিচার করতে গেলে ভালো হবে তাদের কোনো রেখার মধ্যে ফেলে অনুমান করা, কারণ এ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে এত সহজে ও পরিষ্কারভাবে তারা আমার কল্পনা ও বোধে প্রতিভাত হতে পারবে না। কিন্তু যদি তাদের অস্তিত্বটি শুধু মনে রাখতে চাই বা তাদের কয়েকটিকে বিচার করতে যাই একসঙ্গে, তাহলে তাদের ব্যাখ্যা করা দরকার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত কতকগুলি রাশির[১৮] মাধ্যমে—এবং এই উপায়ে জ্যামিতিক বিশ্লেষণ ও বীজ-গণিতের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তাকে আমি কাজে লাগাতে পারব, সঙ্গে-সঙ্গে একটির দোষত্রুটি সংশোধন করব অন্যটির দ্বারা।

এমন-কি এটা পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করব না যে অল্পসংখ্যক যে-কয়েকটি নির্দেশ বেছে নিই, তাদের নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করার ফলে ঐ দুটি বিজ্ঞান সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্নের জট আমি খুলে ফেলতে পেরেছি অতি সহজে—এত সহজে যে মাত্র দু'তিন মাসের যে-সময় আমি নিই তাদের বিচারের জন্য, তারই মধ্যে সে-প্রশ্নগুলির বেশ কয়েকটিকে আগে অত্যন্ত দুরূহ ঠেকলেও ততদিনে সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছি। শুধু তাই নয়, যেগুলি তখনো বুঝে উঠতে পারিনি, সেগুলি বোঝার উপায় কী বা তাদের সমাধান কতদূর পর্যন্ত সম্ভব, তারও যেন স্পষ্ট হদিস ঐ দু'তিন মাসের শেষাশেষি আমি পেয়ে গেছি বলে মনে হল। বিচারের সময় সুরু করি সরলতম ও সাধারণতম প্রশ্নগুলি দিয়েই, এবং এটাও ধরে নিই যে যখনি কোনো একটি সত্য আবিষ্কার করছি, তা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে রীতিতে, যে-রীতিকে পরে কাজে লাগাতে পারব অন্যান্য সত্যের আবিষ্কারে। তাই আশা করি আপনারা আমাকে খুব একটা দাম্ভিক ভাববেন না যদি বলি যে যেহেতু প্রতিটি জিনিসের মাত্র একটি সত্যই থাকতে পারে, যে-কেউ সেই সত্যকে খুঁজে পেয়েছে, জিনিসটি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য সে জেনে ফেলেছে—অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি বলি যে যে-ছেলে পাটীগণিতের ঠিক পদ্ধতিটি রপ্ত করে কোনো একটা যোগ কষতে পেরেছে, সেই বিশেষ অঙ্কটি সম্বন্ধে যে-কোনো মানুষ

যা-কিছু জানতে পারে, তা সে-ছেলে নিশ্চিত আয়ত্ত করেছে। সবশেষে, পাটীগণিতের পদ্ধতি-গুলিকে যা-কিছু নিশ্চয়তা দান করে, তার সবই পাওয়া যাবে সেই রীতির মধ্যে যার মাধ্যমে শিখতে পারা যায় ঠিক শৃংখলাটি অনুসরণ করতে, বা ঈপ্সিত বস্তুর সকল বিভিন্ন অবস্থার একেবারে যথাযথ পরিমাপ নিতে।

কিন্তু এই রীতির যে-জিনিসটি আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, তা হল এই যে তার দ্বারা আমার যুক্তিশক্তিকে আমি সর্বত্র নিশ্চিতভাবে ব্যবহার করতে পারব—হয়তো সবসময় সম্পূর্ণভাবে নয়, তবু যতটা আমার ক্ষমতায় ধরে, অন্তত ততটা। তাছাড়া এটা ব্যবহার করতে করতে আমার চিত্তও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হবে তার বিষয়গুলি সম্বন্ধে ক্রমশই আরো পরিষ্কার ও স্পষ্ট ধারণা পেতে। এবং যেহেতু কোনো বিশেষ বিষয়ের সীমানার মধ্যে আমি নিজেকে বদ্ধ রাখছি না, রীতিটিকে সমানই সার্থকভাবে অন্যান্য বিজ্ঞানগুলিরও সমস্যা-সমাধানে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারব—ঠিক যেমনটি সাফল্যের সঙ্গে আগে করেছি বীজগণিতের বেলায়। এর মানে অবশ্য এই নয় যে যত বিজ্ঞানের যা-কিছু সমস্যা আমার সামনে হাজির হয়েছে, তার সবগুলিকেই সঙ্গে-সঙ্গে পরীক্ষা করতে প্রবৃত্ত হলাম—সেটা হবে রীতিটির বিধিবিধানগুলির ঠিক বিপরীতটি করতে যাওয়া। তবে যেহেতু জানতাম যে যে-দর্শনশাস্ত্রে নিশ্চিত বলে কিছুই আমি এখনো খুঁজে পাইনি, এই রীতির সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করতে হবে সেই দর্শনশাস্ত্র হতেই, আমার তাই মনে হল সর্বাগ্রে যা দরকার, তা দর্শনের ঐ তত্ত্বগুলিকে খাড়া করতে সচেষ্ট হওয়া—এবং এর চেয়ে জরুরী কাজ পৃথিবীতে আর নেই, কারণ এখানেই সব থেকে বেশি ভয় যত ত্বরা বা তাড়াহুড়োর সম্ভাবনার, যত পূর্ব-ধারণার। কিন্তু রীতিটি আবিষ্কার করি যখন, আমার বয়স ছিল তখন মাত্র তেইশ বছর, তাই ঠিক করেছিলাম এটিকে পুরোপুরি প্রয়োগ করার আগে বেশ পূর্ণ-বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতেই হবে, এবং ততদিন পর্যন্ত যথেষ্ট সময় নিয়ে নিজেকে তৈরী করার কাজে আমি লাগব। নিজেকে আমার সেই তৈরী করাটা চলবে একদিকে যেমন যত ভুল মতামত সেই যাবৎ গ্রহণ করে এসেছি, তার প্রত্যেকটিকে আমার চিত্ত হতে সমূলে উৎপাটন করে, অন্য-দিকে তেমনি বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে, যাতে পরে নিজেই হয়ে উঠতে পারি আমি নিজেরই যুক্তিতর্কের ফল। এটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে একমাত্র সেই রীতির অবিরত প্রয়োগে, যার বিধান আমিই আমাকে দিয়েছি—যত তার প্রয়োগে যত্নবান হব, ততই তার মধ্যে নিজেকে আরো দৃঢ়তার সঙ্গে স্থাপিত করব।

পাদ-টীকা

[১] ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ (১৬১৮—১৬৪৮)।

[২] বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরীর রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিন্যান্ড—তাঁর অভিষেক হয় ১৬১৯ খৃস্টাব্দে, ফ্রাঙ্কফুর্টে।

[৩] চরম যুক্তিবাদী বলেই দেকার্ত চরম মানবতাবাদী, তাই তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কিত উক্তিগুলি কৌতূহল জাগাতে পারে। এখানে মনে রাখা দরকার, দেকার্তের যুগে গীর্জার এমন প্রভুত্ব ছিল যে চাইলেও ঈশ্বর-বিরোধী কথা বলা যে-কোনো ব্যক্তিরই পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। তা সত্ত্বেও রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ই বহুদিন ধরে দেকার্তকে সুনজরে দেখেননি—শেষে তো রোমান ক্যাথলিক গীর্জা তাঁর অধিকাংশ রচনাকে নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকাভুক্ত পর্যন্ত করেন। তবু, ঈশ্বরের অস্তিত্বে দেকার্ত তাঁর বিশ্বাসের যুক্তিও দেখাতে চেয়েছেন, এবং সে-যুক্তি মোটামুটি হল এই : মানুষ যেহেতু তার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন, কোনো-এক অজ্ঞাত অনায়ত্ত সম্পূর্ণতার ধারণা তার মনে জেগে থাকেই। নতুবা কার সঙ্গে তুলনা করে সে নিজেকে অসম্পূর্ণ বলছে? এই সম্পূর্ণতার ধারণা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা সে কিছুতেই অর্জন করতে পারে না, কারণ সেই অভিজ্ঞতায় এমন কিছুই নেই যা সম্পূর্ণ। তাই সম্পূর্ণ এক

সত্তা বা ঈশ্বর আছেনই, একমাত্র যিনি মানুষকে সৃষ্টি করে থাকতে পারেন। দেকার্তের মত হল এই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা গেলে মানুষ এমন সব বিশ্বাসের উপরও নির্ভর করতে পারে যার সত্যতার প্রমাণ অথবা খণ্ডন নিছক যুক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, মানুষের বাইরে যে-বিরাট বাস্তব জগৎ পড়ে রয়েছে, যা মানুষের উপর এতটুকুও নির্ভর করে নেই কিন্তু যাকে বাদ দিয়ে মানুষের কোনো বিচার-বিবেচনাই দাঁড়াতে পারে না, তেমন একটা জগৎ থাকবে কেন, মানুষের যুক্তিতে তার উত্তর নেই। অথচ, সে-জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেও মানুষের উপায় নেই। দেকার্ত মনে করেন, এই ধরনের বিশ্বাসে মানুষ যে নির্ভরশীল হতে পারে, সেই নিশ্চয়তা তাকে দিয়েছে ঈশ্বরেরই কারুণ্য।

[৪] প্রাচীন গ্রীসের এই প্রখ্যাত নগরী সুপরিকল্পিতভাবে বেড়ে ওঠেনি, সে-পরিচয় পাওয়া যায় নগরীর নামেই—'স্পার্টা' কথার অর্থ হল বিক্ষিপ্ত।

[৫] দেকার্তের মতে শৈশবে যত পূর্ব-ধারণার সৃষ্টি হয়, তা-ই মানুষের প্রথম ও প্রধান ভুলের উৎস।

[৬] অর্থাৎ রাজমিস্ত্রী যেমন তার মাপকাঠির সাহায্যে পাথর বা ইঁট সাজায়, আমাদের চিন্তাগুলিকেও সেইভাবে যুক্তির মধ্যস্থতায় বিন্যস্ত করা উচিত।

[৭] খুব সম্ভবত সাধারণ বিষয় সম্পর্কিত আলোচনার পদ্ধতি যাকে প্রাসঙ্গিক বিচার বলা চলে, এবং যথার্থভাবে তর্ক করার শৈলী যা তর্কশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

[৮] এখানে দেকার্ত অ্যারিস্টট্‌ল্‌ প্রবর্তিত ন্যায়-রীতির সমালোচনা করছেন।

[৯] ফ্রান্সিসক্যান্‌ যাজক রেমঁ লুল্‌ (১২৩৫—১৩১৫), যিনি তর্কের এক বিশেষ পদ্ধতির প্রচলন করেন।

[১০] প্রাচীনদের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ছিল সত্যকে আবিষ্কার করার এক বিশেষ রীতি, যার দ্বারা প্রথমেই ধরে নেওয়া হত আলোচ্য সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, পরে ঠিক আগের সেই প্রস্তাবটিতে ফিরে যাওয়া হত যে-প্রস্তাবের উপর নির্ভর করে আছে সমাধানটি, এবং পরে এইভাবে পিছু হটতে হটতে একটির পর একটি প্রস্তাবের বিচারে বসা হত যতক্ষণ-না পর্যন্ত কোনো সত্য বা তত্ত্ব প্রমাণিত হয়। গ্রীক জ্যামিতিজ্ঞরা এই পিছু হটার পদ্ধতিটি ব্যবহার করতেন, রেখাচিত্রের বিচারে পর্যন্ত—এই ক্লান্তিকর পদ্ধতির বদলে দেকার্ত তাঁর নিজস্ব রীতি প্রবর্তন করলেন, যার দ্বারা রেখার স্থান নিল সমার্থক বীজগাণিতিক সংকেত। এইভাবে জ্যামিতিকে তিনি মুক্তি দিলেন কেবলই রেখাচিত্রের অবিরাম বিচার হতে।

[১১] একদিকে সংখ্যা অন্যদিকে কিছু-কিছু চিহ্ন বা রাশির ব্যবহার 'আধুনিকদের বীজগণিত'-কে দুর্বোধ্য বিদ্যায় পরিণত করেছিল। দেকার্ত সমস্যার সমাধান করলেন দু'টি উপায়ে : প্রথমত, সংখ্যার বদলে তিনি বসালেন অক্ষর (বর্ণমালার প্রথম অক্ষরগুলি, যথা a বা b বা c যেখানে বোঝাতে চাইছেন জ্ঞাত কোনো রাশি; এবং বর্ণমালার শেষ অক্ষরগুলি, যথা x বা y বা z যেখানে বোঝাতে চাইছেন অজ্ঞাত কোনো রাশি); দ্বিতীয়ত, আগের বীজগণিতের 'কসিক' চিহ্নগুলির স্থানে তিনি বসালেন সমান অর্থপূর্ণ সংখ্যা। দেকার্তের এই পরিবর্তন-সাধন কত সরল ও কতখানি যুগান্তকারী, তা বোঝার জন্য মাত্র একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে। ধরা যাক আজকের এই সহজবোধ্য সূত্রটি : $x+4x^2-7x^3$ দেকার্তের আগে যে-জটিল আকারে এটি লিখিত হত, সেটি বাংলায় রূপান্তরিত করলে দাঁড়াবে : ১ মূল, যুক্ত ৪ বর্গ, বিযুক্ত ৭ ঘনক।

[১২] অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা, বীজগণিত ও জ্যামিতি।

[১৩] যাকে শুধু সম্ভব মনে হয়, তাকে এই বিধান অনুসারে বিজ্ঞানের মধ্যে স্থান দেওয়া যাবে না।

[১৪] দেকার্ত বলছেন, মানুষের জ্ঞানার্জনের ক্ষমতার কোনো সীমানা নেই। একমাত্র শক্ত যা তা ঠিক রীতিটি ও ঠিক তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করা, এবং একবার সেটা আবিষ্কার হয়ে গেলে মানুষের জানার পরিধি আপনা থেকেই বেড়ে চলতে বাধ্য। এমন আশাবাদে মোহভঙ্গের আশঙ্কা যে নেই তা নয়, তবে বিজ্ঞানের চর্চা মানুষকে এই আশা ও বিশ্বাসে দৃঢ় করে।

[১৫] গণিতশাস্ত্রের অনুশীলনে চিত্তের পক্ষে এক ব্যায়াম—সেই অনুশীলনের অভ্যাসের ফলেই শৃঙ্খলার রীতি আয়ত্তে আসে।

[১৬] সেই সমস্ত বিজ্ঞানগুলি যাদের মধ্য যুগের দার্শনিকরা বলতেন মিশ্র গণিতশাস্ত্র। এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, প্রধানত : জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীত-বিদ্যা ও আলোক-বিদ্যা।

[১৭] গণিতশাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে যে-কথা দেকার্ত বলছেন এখানে, সেই একই কথা অন্যত্র তিনি বলেছেন সমগ্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে। মধ্য যুগের দার্শনিকরা বিশ্বাস করতেন এক বিজ্ঞান হতে আরেক বিজ্ঞানের স্পষ্ট শ্রেণী-বিভাগে—দেকার্ত প্রমাণ করতে চাইলেন সকল বিজ্ঞানের অভিন্নতা। তিনি বললেন, আলোচ্য বিষয়ে এক বিজ্ঞানের সঙ্গে আরেক বিজ্ঞানের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাদের কলেবরটা একটাই—কারণ যে-ধীশক্তি তাদের জন্ম দিয়েছে, তা অখণ্ডভাবে এক, অদ্বিতীয়ভাবে এক।

[১৮] অর্থাৎ বীজগণিতের রাশি, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত (দ্রষ্টব্য : ১১নং পাদ-টীকা)।

শব্দপঞ্জী

এই খণ্ডে ব্যবহৃত কিছু বাংলা শব্দের বর্ণানুক্রমিক সূচী তলায় দেওয়া হল—সঙ্গে সমার্থক ফরাসী ও ইংরেজী শব্দ, আগে ফরাসী পরে ইংরেজী। সর্বত্র যে-অর্থ দেওয়া হয়েছে, তা দেকার্তের সময়ের।

অজ্ঞাত রাশি, quantité inconnue, unknown quantity
অনুপাত, proportion, proportion
অনুশাসন, constitution, constitution
আলোক-বিদ্যা, optique, optics
উপদেষ্টা, précepteur, preceptor
কসিক, cossique, cossic
কাণ্ডজ্ঞান, bon sens, good sense
গণিতজ্ঞ, mathématicien, mathematician
গণিতশাস্ত্র, mathématique, mathematics
ঘনক, cube, cube
চক, place, public square
চিহ্ন, caractère, type
জ্ঞাত রাশি, quantité connue, known quantity
জ্যামিতি, géomètrie, geometry
জ্যামিতিজ্ঞ, géomètre, geometrician
জ্যোতির্বিদ্যা, astronomie, astronomy
তত্ত্ব, principe, principle
তর্কশাস্ত্র, dialectique, dialectics
ত্বরা, অত্যধিক ত্বরা,
তাড়াহুড়োর ভাব, précipitation, precipitancy
দর্শন, দর্শনশাস্ত্র, philosophie, philosophy
ধীশক্তি, faculté intellectuelle, intellectual faculty
নকশা, modèle, model
নির্দেশ, précepte, precept
ন্যায়, syllogisme, syllogism
পরিকল্পনা, dessein, design
পরিগণন, dénombrement, enumeration
পাটীগণিত, arithmétique, arithmetic
পুনরীক্ষণ, revue, revision
পূর্ব-ধারণা, prévention, prejudice
পৌর কর্মচারী, officier, officer
প্রমাণ, démonstration, proof
প্রস্তাব, proposition, proposition
প্রাসঙ্গিক বিচার, topique, topical argument
ফ্রান্সিসক্যান্, franciscain, Franciscan
বর্গ, carré, square
বাস্তব জগৎ, monde physique, physical world
বাস্তুকার, ingénieur, engineer
বিধান, précepte, precept
বিধান-প্রণেতা, législateur, legislator
বিমূর্ত, abstrait, abstract
বিযুক্ত, moins, minus
বীজগণিত, algèbre, algebra
বীজগাণিতিক সংকেত, symbole algébrique, algebraic sign
ব্যবহার, usage, usage
মধ্যযুগের দার্শনিকরা, scolastiques, scholastics
মূল, racine, root
যুক্ত, plus, plus
যুক্তি, raison, reason
যুক্তিবিদ্যা, logique, logic
রাশি, chiffre, figure
রাষ্ট্র, Etat, State
রীতি, méthode, method
রীতিনীতি, lois, laws
রেখাচিত্র, figure, drawing
শিষ্টাচার, bonnes moeurs, good customs
সংগীত-বিদ্যা, musique, music
সূত্র, formule, formula
স্থপতি, architecte, architect
স্বতঃপ্রমাণিতভাবে, évidemment, evidently
স্বতঃসিদ্ধ, évident, evident

মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ : **লোকনাথ ভট্টাচার্য** [ক্রমশ]

আইরাজ মণিরাজ

দিনেশচন্দ্র রায়

পরিষ্কার মনে আছে সময়টা বর্ষা শেষে শরতে পড়ছে। ঠিক বর্ষাটাও যায়নি আবার শরৎও আসেনি। এমনি এক পলতা বেওয়ারিশ সময় বাংলাদেশে শ্রাবণের শেষে আর ভাদ্রের প্রথমে আসে। এই সময়টাতে শরৎকাল তার সাদা ঘোড়া আকাশে ছুটিয়ে দেয়। এমন জোর নেই সেই অশ্বমেধের ঘোড়া বেঁধে লম্বা লম্বা বৃষ্টির বর্শা দিয়ে শেষ শ্রাবণের বর্ষা দিগ্বিজয়ী শরৎকাল রুখবে। তাই শ্রাবণের বর্ষা বিজয়ী শরতের বিরুদ্ধে আচমকা লড়াই চালায়। নদীর এপারে ঝম্ঝম্ বিষ্টি, ওপারে ঝল্মল্ রোদ্দুর। মাঠের মাঝখানে ঝিম্ঝিম্ বর্ষা, দুপাশে রোদ্দুর। জামদানী শাড়ির মতো সারাটা দিন রোদে ঝল্মল্ শুধু মাঝে মাঝে মেঘলা মুহূর্তগুলো বেমানান কালচে সুতোর রিপুর কাজ মনে হয়। অথবা শরতের দিনগুলোর গায়ের বরন কাঁচা হলুদের মতো, মেঘলা প্রহরগুলো যেন কতকগুলি জরুলচিহ্ন। এমনি দিনের এক বিকেলে আমার বাবার কাছে জমিদারবাড়ি থেকে নায়েবমশায় এলো। নায়েবের আগমন সম্পর্কে আমার তেমন কোন কৌতূহল থাকার কথা নয়। কিন্তু বাবা এবং নায়েব যখন কথা বলছিলেন আমি তখন পাশের ঘরে পড়াশোনার ভান করছি। বেশ কয়েকবার আমার নাম কানে এলো। এমনিতেই পড়াশোনাতে আমার মন তেমন কোন দিনই ছিল না। বই সামনে নিয়ে বসে রাজ্যের নানা কথা ভাবতাম আর আমার আশেপাশে যা কিছু হচ্ছে তা লক্ষ্য করতাম। সুতরাং আমার নাম শুনতেই আমি বই রেখে কান পেতে শুনতে লাগলাম পাশের ঘরে কি কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও কিছুই বোধগম্য হলো না। ক্রমে ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। একসময়ে নায়েব অনেক কথা বলে, বহু ছিলিম তামাক খেয়ে কাশতে কাশতে চলে গেলো। বাবা গলা খেঁকারি দিতে দিতে কিছুক্ষণ পরে ভেতর বাড়িতে ঢুকলো।

চার-পাঁচদিন পরে সন্ধ্যাবেলাতে খেতে বসেছি, খাবার সময় আমার চুপচাপ খাওয়াটাই অভ্যাস। বেশি কথা বলি না। পেট ভরলেও না, না ভরলেও না। ভাতের গ্রাস চিবোচ্ছি আর বৃষ্টির শব্দ শুনছি। হঠাৎ মনে হলো নিশ্চুপ। পুকুরের জলে কে যেন একখণ্ড পাথর ফেললো। চমকে উঠে শুনি মা কথা বলছে।

—একটা মজার খবর আছে।

—কি খবর মা?

—এবার জমিদারবাড়িতে দারুন জাঁক করে যাত্রা হবে। জমিদারবাবুরা নিজেরা একটা দল করেছে। খুব ধুমধাম হবে। তোকে দিয়ে ওরা কৃষ্ণের পার্ট করাতে চায়।

মায়ের কথাটা আমি একেবারেই বুঝতে পারছিলাম না। ভাতের দলা তখন আমার মুখের মধ্যে, হাঁ করে তাকিয়ে আছি। মা রেগে উঠলো।—তোর কি দশা ধরলো? অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? মনে হচ্ছে তুই তোর মা-মরার সংবাদ পেলি।

মা একটু মুখরা। পাড়াতে কল্লাপনার জন্য নাম ছিল। মায়ের ধমক খেয়ে ভাত গিলে ফেললাম, এক ঢোঁক জল খেলাম, তারপর জিগগেস করলাম,—তারপর মা?

মা তখনও গজরাচ্ছে। প্রথমে আমার কথার জবাবই দিল না, তারপর রাগের স্বরগ্রামেই

গলার স্বর রেখে বলতে লাগলো,—প্রথমে নায়েবকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তোর বাবা রেগেই আগুন। সোজা বলে দিয়েছে আমার ছেলে নাটুকে হলে তার পড়াশোনার বারোটা বাজবে। ওসবে আমার মত নেই।

মা একটু দম নিলো। রান্নার বাসনকোসন গুছিয়ে রাখলো। মায়ের গলাতে রাগের ভাবটা একটু কমে এলো,—তারপর জমিদার বেটা সাতঘাটে ঘুরেছে। আজ তোর ইস্কুলের হেডমাস্টার আর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তোর বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। এত বড়বড় লোকের অনুরোধ ফেলতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সে ঢোঁকি গিলেছে। তোকে নাটুকে হতে হবে। আগামী শনিবার থেকে প্রতিদিন বিকেলে মহড়া দেবার জন্য জমিদারবাড়িতে যেতে হবে। সেখানে এক যাত্রার মাস্টার তোকে কি সব শেখাবে।

পরের শনিবার থেকে জমিদারবাড়ি যাওয়া সুরু করলাম। বিকেলে যেদিন প্রথমে বাবার সঙ্গে গেলাম সেদিন দেখি ঘরভরতি লোক। জমিদার একখানা বড় আরাম কেদারায় বসে আছে। মাথার চুল একেবারে ঘাড় থেকে চাঁদি পর্যন্ত ছাঁটা। চুলের পরিমাণ কমালেও তেলের পরিমাণ জমিদার কমায়নি। বেশ তেলকুচকুচে লাগছে। হ্যাজাক লাইটের আলোতে খুব চক্‌চক্ করছে। মুখখানা প্রকাণ্ড। চোখের নিচে ফোলাফোলা। থুতনিটা চর্বিতে থুকথাক্। যেন থুতনিটা খানিকটা ফাও হয়ে একটা বোলতার চাকের মতো ঝুলে পড়েছে। আটার ঢ্যালার মতো একটা থলথলে ঘাড়ের ওপর মাথাটা বসানো। জমিদার আমার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো। আমার মনে হলো কোন অদৃশ্য মায়ায় জমিদার তার জিবটাকে চোখের দৃষ্টিতে চালান দিয়েছে আর ভেজা দৃষ্টি দিয়ে আমার গা চাটছে। চারিদিকে তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। মশার ডাক বা গুঞ্জন যাই কথা হোক না কেন সেই প্রখরতার সঙ্গে তাল রেখে মানুষগুলো খুব জোরে জোরে কথা বলছে। সবাই যেন অবচেতনভাবে মশার ডাককে ছাপিয়ে কথা বলতে চাইছে। ঘরের বাইরে থেকে শুনলে মনে হবে একঘর লোক পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে। জমিদার পরপর দুটো হাই তুললো। খুব পরিষ্কার দাঁত হ্যাজাকের আলোতে প্রায় ঝিলিক দিলো। হাইতোলা তারপর ঢোঁক গেলা জমিদারের কথা বলার আগের মুদ্রাদোষ।। আমি বাবার পাশে বসেছিলাম। বাবাকে সম্বোধন করে জমিদার বললো,—তোমার ছেলেকে ভগবান মেয়ে গড়তে গড়তে ভুল করে ছেলে করে দিয়েছে।

একটা হাসির গুঞ্জন উঠলো। প্রায় সবাই হাসলো। আমার পরিষ্কার মনে আছে আমি সেদিন হাসিনি। বুঝতে পেরেছিলাম আমি জমিদারকে প্রাণপণ ঘৃণা করছি। আমাদের বাড়ির কাঞ্চিকোণাতে প্রচুর আগাছা জঙ্গল আছে। বেতের বন, অ্যাশশ্যাওড়া গাছে আর নানা লতা-পাতার ভিড়ে জায়গাটা অন্ধকার। সেইখানে আমি একদিন একটা বিরাট গুইসাপ দেখেছিলাম। গুইসাপটা বারবার জিব বের করছিল। জিবের মাঝখানটা চেরা। পরে শুনেছিলাম গুইসাপ যদি কারও গায়ে থুতু ছিটিয়ে দেয় তবে তার সেই অঙ্গ পচে খসে পড়ে। আমি সেদিন কায়মনোবাক্যে গুইসাপ হতে চেয়েছিলাম আর থুথু ছিটিয়ে জমিদারের মুখখানা পচিয়ে দেবার প্রবল বাসনা হয়েছিল। হাসির গুঞ্জন থামলে জমিদার তার অসমাপ্ত কথা বলতে সুরু করলো,—কি সুন্দর মুখ, চোখ, ঠোঁট,—শাড়ি পরিয়ে চুড়ো করে চুল বেঁধে দিলে কে বলবে ছেলে। সত্যি, তোমার ছেলের জন্যে অনেকেই পাগল হবে। প্রথমদিনের আলাপ পরিচয়ের পর আমি আর বাবা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এলাম। বাবা আগে আমি পেছনে।

যে লোকটার কাছে আমি গান শিখতাম আর যাত্রার পাঠ নিতে সুরু করলাম লোকে

তাকে হাড়গিলা বলতো। লোকটার গানবাজনাতে খুব নামডাক ছিল। তবলাতে হাত এতো ভালো ছিল যে সারা বছর কোথাও না কোথাও বায়না পেত। জমিদার তাকে মোটা মাইনে দিয়ে রেখেছিল। লোকটা ছিল খুব নোংরা। স্নান করতো না। মুখ ধুতো না। দাঁতে ছাতা পরে থাকতো। সন্ধ্যার পর আমি যখন যেতাম হাড়গিলা তখন আফিমের নেশাতে বুঁদ হয়ে থাকতো। কিন্তু হাড়গিলা হারমনিয়াম ধরলেই মনে হতো এলোমেলো চুল, চোখে-পিচুটি, লুঙ্গিপরা কালো লোকটা কোকিল হয়ে গেছে। হাড়গিলার গান শুনলে আর তাকে ঘৃণা করা যেতো না। একটা ব্যাপার আমি আস্তে আস্তে বুঝতে সুরু করলাম—আমি যেন কোন নারীর হাতে একগাছা চুড়ির মধ্যে একটা আলাদা চুড়ি। একগাছা চুড়ির গায়ে আমার গা লাগলেই আমি বেজে উঠি।

মহাষ্টমীর দিন আমাদের পালার অভিনয় হলো। আজ আমার তেমন কিছু মনে নেই। মনে আছে শুধু আমার প্রথম গানগুলো শেষ হবার পর চারদিক থেকে প্রচণ্ড ঝড় এলো। সোঁসোঁ ঝড়। একেবারে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। মনে হলো আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে। তারপর প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি। পরিষ্কার মনে নেই তবু চারিদিকে অগণিত রুপোর টাকা আমাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করছিলো। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো আমি একা এক মাঠের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় আর শিলাবৃষ্টিতে সাম্রাজ্য লাভ করেছি। সম্রাট। আমি ঈশ্বরের মতো শক্তিশালী। আমি অমোঘ।

গভীর রাতে পালা শেষ হলে আমাকে দেখবার জন্যে জমিদারবাড়ির জেনানা মহল থেকে ডাক এলো। আমি সম্রাটের মতো প্রবেশ করলাম। দেখলাম। জয় করলাম। রানীমার গজমতিহার গলায় দিয়ে বাইরে এলাম। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমি বিধাতার মতো অপরাজেয় হচ্ছি। হাতের তালু, দুগাল, দুকান, নাকের নিশ্বাস উত্তপ্ত। প্রচণ্ড জ্বর-বিকারে আমার সামনে থেকে মুছে গেলো মা, বাবা, স্কুল, জমিদার আর হাড়গিলে। আমি সেই গভীর রাতে সর্বশক্তিমান গন্ধর্বে পরিণত হলাম।

সেদিন রাতে নাটকের আর শেষ ছিল না। কেউ জানতো না নট্ট কোম্পানীর অধিকারী চাদর মুড়ি দিয়ে আসরে বসেছিল। একথাও কেউ সন্দেহ করে নি এই অধিকারীর চর হাড়-গিলা। প্রতিদিনের রিহার্সেলের পর হাড়গিলা ক্রমশ আমার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়েছিল এবং অধিকারীকে আমার গুণপনার বিশদ বিবরণ দিয়েছে। কিন্তু অধিকারী জাত নট্ট। পরের মুখে ঝাল খায় না। নিজের চোখে দেখার পর সেই চাদর মুড়ি দিয়েই এক ফাঁকে ঐ ভীষণ ভিড়ের মধ্য থেকে আমাকে ডেকে নিলো। নানাভাবে আমাকে বোঝালো। সেই কথোপকথনের কিছুটা আমার পরিষ্কার মনে আছে।

—তুই বেটা বিরাট নট হবি। কিন্তু এখানে পড়ে থাকলে তোর কিছুই হবে না। মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবি। এই জমিদার এক নম্বরের হারামী। তোকে বৌ-এর মতো রাখবে। আমার দল আজই বোঁচকা বাঁধবে। শেষরাতের গাড়িতে আমরা আসাম রওনা হবো। তুই এক কাপড়ে বেরিয়ে পর। পরে তোর সব হবে।

—কিন্তু আমার বাড়িঘর, মা-বাবা?

—নটের আসর ছাড়া আর কোন মা নেই, দর্শক ছাড়া অন্য বাপও নেই।

শেষরাতের আকাশ আমি জীবনে এই প্রথম দেখলাম। সমস্ত আকাশে জ্বল্ জ্বল্ করছে হাজার লক্ষ কোটি তারা। কুয়াশা কুয়াশা চারিদিকে। একটু হিমহিম গা শির শির।

অধিকারীর হাত ধরে আমি ঘোড়ার গাড়িতে উঠলাম। ঘোড়া চলছে, নির্জন পথে গাড়ির চাকার শব্দ হচ্ছে। চলি। পালতোলা নৌকাতে স্টীমারে পায়ে হেঁটে। চলি। ধুলো বৃষ্টি রোদ। আলো অগণিত মানুষ।

প্রতিটি সকাল পায়ে নূপুর বেঁধে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে শেষ রাতে। অধিকারী আমাকে পরিপূর্ণ ফিমেল করার জন্য মেতে উঠলো। গানের সঙ্গে তালিম চললো নাচের। অধিকারীর কোন মায়া মমতা নেই। ঘড়ির কাঁটা ধরে তালিম চললো। আমার জন্য আলাদা তাঁবু বা ঘর থাকতো। দেখাশোনা করার জন্য পুরো সময়ের লোক নিয়োগ করা হলো। টাকা পয়সা যখন যেমন লাগে চাইলেই পাই।

এক বছর পরে আমি পুরো ফিমেল হলাম। হ্যাঁ, পুরো ফিমেল। হাঁটাতে চলাতে। কথা বলাতে চোখের চাউনিতে। ঠোঁট বাঁকানোতে। শুধু আসরে নয় জীবনেও। শুধু আলোতে না অন্ধকারেও। শীতে গ্রীষ্মে বর্ষাতে বসন্তে। পুরো ফিমেল। আসরে আমার পায়ের ঘুঙুরে বহু মানুষের ভাগ্যচক্র ঘুরতো। সোনার মেডেল। রুপোর মেডেল। বেনারসি। সোনার ঘুঙুর। রুপোর বাজুবন্ধ। আতর। অশ্বমেধের লাল ঘোটকীর মতো ঘুঙুর বাজিয়ে ছুটে চললাম। ঈশ্বর হয়ে আমি আসরে নেমেছিলাম কিন্তু ঈশ্বরীর মতো আমি দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগলাম। আমি জানতাম আমি অতি দীর্ঘ কোজাগরী রজনী হবো। হাত বাড়ালেই সেই রাত আমি তখন প্রায় ছুঁতে পারি।

আমার যৌবন আর দুখানা আয়না নিয়ে একটা গল্প আছে। সেটা এখানে বলাই ভালো। গল্পটা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমার মিনতি তোমরা সবাই বিশ্বাস করো। গল্পটা সত্যি। আমার রোজগার মান মর্যাদা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি মানুষসমান দুখানা বেলজিয়াম কাঁচের আয়না কলকাতার চোরাবাজার থেকে কিনি। দুটি মজবুত কাঠের কেসে বিরাট বাদ্যযন্ত্রের মতো ওরা আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। কোন রাতে মর্জিনা, মাঝরাতে জনা, শেষ রাতে উদিপুরী, প্রায় ভোরে চন্দ্রাবলী। শেষ দৃশ্যের পর আমার সঙ্গে কেউ কোন কথা বলতো না, এটা প্রায় নিয়ম হয়ে গিয়েছিলো। আমি সোজা এসে আমার ঘরে ঢুকতাম। খুব জোরালো আলো থাকতো। নদীর স্রোতের মতো সব পাড় ভেঙে, সব দেশ ধুয়ে, তারায় আলোকিত আকাশকে ফাঁকি দিয়ে এই দুখানা আয়নাকে নিয়ে বেঁচে থাকতাম। এই দুখানা আয়নার একখানা কালো মেহগনি কাঠে বাঁধানো ছিল আর অন্যটির ফ্রেম ছিল টকটকে লালরঙের বার্নিশ দিয়ে রাঙানো। কালোটার নাম দিয়েছিলাম আইরাজ। লালটাকে আমি মণিরাজ বলে ডাকতাম। আইরাজের সামনে দাঁড়িয়ে আমি আমার সুডোল স্তন, মরাল গ্রীবা, পদ্মের ডাঁটার মতো বাহুযুগল দেখি, আর দেখি, অনেকক্ষণ ধরে দেখি। মণিরাজে আমার ভারি নিতম্বের ছায়া ধরে, সাপের মতো নকল বেণী বা খোঁপা ঢলে পড়ে। বহুক্ষণ দেখতে দেখতে আইরাজে মণিরাজে প্রতিফলিত নারীমূর্তি আর আমার পুরুষ সত্তা আলাদা হয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে আমি সাজসজ্জা ছাড়ি। খুলে রাখি নকল কবরী। গুছিয়ে রাখি কাঁচুলি শাড়ি। রাত্রির শেষ যামে ঈশ্বরীর দেহ থেকে আন্ডারপ্যান্টপরা এক অবলুপ্ত পুরুষ বেরিয়ে আসে। রাতশেষে আমি শুতে যেতাম। আমি জানতাম ঈশ্বরীর দেহ আমার পাশেই সারাক্ষণ জেগে থাকবে। কাল সকালে জেগে আমি আমার কঙ্কাল নিয়ে ঢুকে যাব ঐ খোলসে। এখন আর কেউ দেখবে না। আইরাজ মণিরাজ কোন ছায়া ধরে রাখে না।

বলতে ভুলে গেছি অধিকারীর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। আমি যেন নতুন বৌ

আর অধিকারী বুড়ো বর। একদিন রাতে অধিকারী পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিকের মতো এক রোম-হর্ষক ব্রতকথা শোনাল। অধিকারীর সঙ্গে আমার কথাবার্তা পরিষ্কার বাংলাতে হয়েছিল। কিন্তু অধিকারীর কথাগুলো কোন আদিম বন্য মুন্ডা পুরোহিতের মন্ত্রের মতো অবোধ্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আমার মনে হলো আমি বাঘডাকা সাপের শিষ দেওয়া প্যাঁচার হুমহুম করা গভীর অরণ্যে অদ্ভুত স্থাপত্যের এক মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। অধিকারী সেই মন্দিরের দুয়ার আস্তে আস্তে খুললো, দেখি বাণবিদ্ধ এক রক্তাক্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শূকর বেদিতে বিগ্রহ হয়ে অধিষ্ঠিত আছে। অধিকারীর কথাগুলো আমার পরিষ্কার মনে আছে,—এই লাইনে তোর এখন সুদিন। ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হবে। যতো পারিস কামিয়ে নে।

—আর কতো কামাব?

—আজ না খাস কাল তোকে মদ খেতে হবে। এ লাইনে এলে এ থেকে নিস্তার নেই। মদ ছাড়া একটা রাত চলবে না। গ্যাঁজা না টানলে চার বছর পর আর রাত জাগতে পারবি নে। গলা দিয়ে রক্ত উঠে মরবি। আর একটা রোজগারের বুদ্ধি আমি বের করেছি, মন দিয়ে শোন। আমি এখন থেকে তোর জন্য গ্রাহক ধরবো। বুড়োধুরো গ্রাহক। শো শেষ হলে তোর জন্য যারা চুলবুলিয়ে থাকে। যা রোজগার হবে আমরা আধাআধি ভাগ করে নেবো।

পাটের অফিসের বুড়ো বড়বাবু, লোমশ পাঞ্জাবী, সাদা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ক্যানভাসার, এমন কি এক আশ্রমের মোহন্ত পর্যন্ত এলো।

অধিকারী আমাকে একেবারেই বাইরে বেরুতে দিত না। বলতো,—স্টেজে তোকে লোকে দেখবে আনারকলি আর দিনের বেলা দুঠেঙে মন্দা,—শালা চমক নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং একমাত্র বিকেল বেলা শাড়ি পরে, হাতে চুড়ি ঝনঝনিয়ে, কপালে টিপ দিয়ে গাড়ি করে বেড়াতে বেরুতাম। অধিকারী আমার পাশে সোয়ামীর মতো বসে থাকতো।

অধিকারীর তাঁবেদারিতে বেশ ছিলাম। কিন্তু কেন জানি না, কবে থেকে জানি না, অধিকারীকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করলাম। অধিকারীকে দেখলেই মনে হতো বৃষ্টির দিনে বিষ্ঠা দেখছি। হঠাৎ একদিন রাতে আমার মনে হলো অধিকারী শালা একটা ঘেয়ো কুত্তা। পরদিন সকালে অধিকারীকে দেখলেই আমার বমি আসতে লাগলো। সেদিন সন্ধ্যাতে আসরে নামলাম না। অধিকারী আমার হাতে পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। আমি তখন জিনিস-পত্র গোছাতে শুরু করেছি। আমার আইরাজ মণিরাজের প্যাকিং শেষ। শেষ রাতে ট্রেনে আমি কলকাতা-মুখো। চলন্ত ট্রেনের ফ্রেমে বাঁধানো আকাশে কিছু তারা। বেওয়ারিশ বাগানে এখানে ওখানে নিজে থেকে ফোটা ফুল। ঠান্ডা বাতাস বুক ভরে টানলাম। আমার মনেই হলো না অধিকারীর সঙ্গে আমার কোনদিন পরিচয় ছিল, তাকে কোনদিন দেখেছি, তার সঙ্গে কোনদিন ছিলাম। নটের জীবনে শুধু প্রবেশ আর প্রস্থান। প্রস্থান আর প্রবেশ।

বাংলাদেশে আমার তখন খুব নামডাক। যাত্রাজগতে আমার ডাকনাম ছিল মাঈজী-বাবু। মাঈজীবাবু আসরে নামছে শুনলে সাত ক্রোশ দূর থেকে লোক ভেঙে আসে। টাকা হাতে না থাকলে ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়ে আসে। ফুলশয্যা থেকে বর উঠে আসে। অন্তর্জলী দেওয়া বুড়ো আমাকে দেখবার জন্য পরমায়ু ধার পায়। আমি তখনই বুঝে গেছি আমার রহস্য কোথায়। আসরে নামলেই আমি ঈশ্বরী। চারপাশে হাঁ করে বসে থাকা অগণিত সাবালক নারী পুরুষকে আমি কাদার মতো ছেনে ছেনে নতুন করে তৈরি করি। তারপর অগণিত মানব মানবী ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর মতো আমার গান শুনতো, চোখের কটাক্ষ দেখতো,

ঘুঙুরের শব্দ শুনতে শুনতে আমার নাচুনে পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি সংসার, ভাসিয়ে দিয়েছি ঘরবাড়ি, মটকে দিয়েছি অগণিত নরমুণ্ড। আমি ঈশ্বরী। যা বলবো তাই হবে।

অমুক দলের অমুক অধিকারী এসেছে। প্রায় ভোর রাত থেকে পথে রোয়াকে বসেছিল। সকালে দরজা খুলতে ঘরে এসে বসেছে,—সেও প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা হলো। এই সোনার মাথাটা ভেট দিয়েছে।

—না।

আর এক অপেরা পার্টির মালিক পাঁচশো টাকা ভেট দিলো। সারা সিজেনের জন্য দশ হাজার টাকা চুক্তি। খাওয়া-দাওয়া, নেশা ভাং ফ্রি।

—না।

অমুকগড়ের অমুক রাজা এলো। কতো গাড়ি আর কত লোকজন। বাড়ির সামনে ভিড় হয়ে গেলো। কিছু আমাকে করতে হবে না। শুধু প্রাসাদের মধ্যে আর এক প্রাসাদে রাজাকে খুশি রাখতে হবে। মাসে দু'হাজার টাকা মায়না। আগাম দশ হাজার। সোনার থালাতে রুপোর ভাত। সপ্ত ব্যঞ্জন।

—না।

সবই যদি না হয় তবে শেষ কি? শেষ কোথায়? তবে আছে আর একটা গল্প। এই কলকাতাতে থাকবার সময়েই আমার মনে হলো আর আইরাজ-মণিরাজে ছায়া নয়, আমি জীবন্ত নারীদেহ ভোগ করতে চাই। আমি ঈশ্বরী। আসরে আমি আমার ইচ্ছামতো মানুষকে হাসাই কাঁদাই অজ্ঞান করি আবার জ্ঞান ফিরিয়ে দেই। আমি ঈশ্বরী হয়ে আদেশ দিচ্ছি, তুমি পুরুষ হও। মহানগরীর অগণিত উর্বশী আর পরীদের মধ্যে তোমার যাকে পছন্দ তাকে ভোগ করো।

দীর্ঘ একমাস আমি রোজ কষা মাংস আর মদ্যপান করা শুরু করলাম। হ্যাঁ, দুবেলা মাংস আর অপরিমিত মদ। পাজামা আর পাঞ্জাবী আমার নিত্যবেশ হলো। শাড়ি চুড়ি কাঁচুলি বাড়ি থেকে নির্বাসন দিলাম। দাসীকে বিদেয় দিয়ে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ রোমশ দারোয়ান আর পরিচারক নিযুক্ত করলাম। ইয়ার বন্ধু জুটিয়ে এমন খিস্তি খেওড় শুরু করলাম যে বাড়িতে কাকপক্ষী বসতে পারতো না। আমি যে ঈশ্বরী, তাই আমি জানি কী করে আমাকে পুরুষ করে তুলতে হবে।

একমাস পরে এক বেসামাল সন্ধ্যাতে মস্তান স্ফূর্তিবাজ বাবু সেজে গোড়েফুলের মালা হাতে জড়িয়ে, ঠোঁটে এসেন্স দিয়ে, সাইডঘরে পাঞ্জাবী আর পাজামা পরে, হাতে ছড়ি ঘুরিয়ে গাড়িতে উঠলাম। পারুলরানীকে সোনার মালা পাঠিয়ে আগে থেকে বায়না দেওয়া ছিল। পারুলরানী তখন কলকাতার সন্ধ্যামালতীদের রানী। তার ডান চোখের কটাক্ষের দাম পাঁচশো, বাঁ চোখের ভ্রূ দুটির জন্য হাজার, ও হাসলে মাণিক দিতে হয়, কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে ওর জন্য জান দিতে বহু লাখপতি তৈয়ার থাকে। পারুলের গেটে লাফিয়ে নেমে ছড়ি ঘুরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। দাসী এসে আদর করে বসালো, বাদাম পেস্তা দেওয়া সরবৎ দিল, গোলাপজল ছিটিয়ে সারা ঘর সুগন্ধে মাতিয়ে তুললো। আমি তখন অধৈর্য। পারুলের কাছে যাবার জন্য আমি পাগল হয়ে গেছি। এক সময়ে, কতক্ষণ পরে মনে নেই, পাশের ঘরে মিষ্টি সেতারের সুর শোনা গেল, দাসী এসে জানালো রানীর সভাতে ডাক পড়েছে।

ঘরে ঢুকতেই আমার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেলো। সবকিছু বন্‌বন্‌ করে

ঘ্রতে লাগলো। কিছ্ক্ষণ পরে সেই চরকিবাজি থামলে দেখি সামনে আইরাজ মণিরাজ,—আর রাতে রেজিয়ার সাজে-সাজা আমি। হঠাৎ আমার মনে হলো আমি যদি আমার হাতের সৌখিন কাঠের ছড়িখানা ভেঙে ফেলতে পারি তবে আমি নিশ্চয়ই একটা প্রচণ্ড শক্তি লাভ করবো। দ্'হাতে ছড়িখানা মাথার ওপরে ভাঙতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। সত্যি পারিনি। অনেক চেষ্টা করলেও পারতুম না।

এর কিছ্দিন পরেই এক বিরাট দলের সঙ্গে চুক্তি করে আমি উত্তর ভারত সফরে বেরিয়ে যাই। তখন আমি ঈশ্বরীর মতো অনন্তকালের হিসাব থেকে বিচ্যুত। আমি ব্ঝতে শ্র্ করেছি এটা। ইংরেজী উনিশশো ছেচল্লিশ সাল। কলকাতায় তখন হিন্দ্-ম্সলমান দাঙ্গা হচ্ছে। প্রো দ্ বছর সফর করে আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। মালিক খ্ব খ্শি। দার্ণ লাভ হয়েছে এই সফরে। সত্যি টাকা রাখবার যেন জায়গা পাওয়া যাবে না, এতো টাকা কোথায় রাখবো,—এমনি সব ব্যাপার। এই সময়ে আমি তিন মাসের ছ্টি নেই। আগাম টাকা দিয়ে মালিক প্রীতে আমার বাড়ি ঠিক করে দিল।

পরিষ্কার মনে আছে সেদিন ছ্টিশেষে আমার ক'লকাতা ফেরবার টিকিট কাটা হয়ে গেছে। জিনিসপত্র বাঁধাছাদা প্রায় শেষ। ষষ্ঠীপ্জোর আর দ্দিন বাকি। ঐদিন 'রাতের কান্না' পালা দিয়ে আমাদের মরশ্মের শ্ভ আরম্ভ হবে। আমি আমার বাসার বারান্দাতে বসে কাগজ পড়ছিলাম। দাসী এসে ধ্লোট রং-এর একটা লম্বা খাম আমার হাতে দিলো। আমি প্রথমে ব্ঝতেই পারিনি কি ব্যাপার। জীবনে কোনদিন চিঠিপত্র পাইনি। লিখিনি। অধিকারীর হাত ধরে যে রাতে বেরিয়ে এসেছিলাম তারপর মা-বাবার আর কোন খবর নেইনি। তাদের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। স্তরাং জীবনে প্রথম চিঠি পেয়ে আমি ব্ঝতেই পারলাম না চিঠি পেয়ে কি করতে হবে। অনেকক্ষণ খামখানা আমার কোলের ওপর পড়ে রইলো। মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কেন জানি না খামখানা খ্লতে কিছ্তেই আমার সাহসে কুলোল না। আসলে যাত্রার নাট্কের কাছে দিনটা রাতের মতো বিশ্রামের সময়। দিনের বেলাতে কোন কাজ করা যায় এটা ভাবতেই পারতাম না। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই আমার চোখ দ্টো জ্বল্ জ্বল্ করে। আমি একটা নরখাদক ব্যাঘ্রী হয়ে যাই। তখন যে কোন মান্ষের ঘাড় মটকাতে পারি। স্তরাং এই শেষ বিকেলে জীবনে প্রথম পাওয়া চিঠি খ্লে পড়তে সাহস হলো না। চিঠিখানা শোবার ঘরে রেখে এলাম। যা করার মাঝরাতে করা যাবে।

কিন্তু এখন মাত্র বিকেল। মাঝরাত এখনও একশো যোজন দ্রে। এই অবসরে সংক্ষেপে বাকি কথাট্কু শেষ করে নেওয়া যাক। উত্তর ভারত সফর শেষে ফিরে আসবার সময় মোগলসরাই স্টেশনে একটি বাঙালী কিশোরীকে আমি আশ্রয় দেই। ঘটনাটা খ্ব আকস্মিকভাবে ঘটে। বিশদ বিবরণ দেবার কোন অবকাশ নেই। দ্র্গাপ্রতিমার মতো মেয়েটির গা দিয়ে পদ্ম-পদ্ম গন্ধ। একটা আন্তঃপ্রাদেশিক গ্ণ্ডার দল ওকে হরণ করে দিল্লির মিনাবাজারে চালান দিতে যাচ্ছিল। পথের মাঝখানে প্লিশের গোলমালে দলটি ল্টের মাল রেখে পালিয়ে যায়। তার পর নানা পথ ঘ্রে মোগলসরাইয়ে আমার হাতে আসে। এই মেয়েটিসহ আমি প্রীতে ছ্টি কাটাতে আসি। যদিও আমি সাধারণত সব সময়েই নারীবেশ পরে থাকি তব্ কিছ্দিন পরেই ও ব্ঝতে পারলো আমি প্র্ষ। মেয়েটি তার হাসিগান, সেবাযত্ন, চলাফেরা, আকার-ইঙ্গিত সব কিছ্র মধ্য দিয়ে বোঝাতে চাইলো আমি প্র্ষ। পাকা মেঝে কোন ধাতব বস্তু দিয়ে ঘসলে যে শব্দ হয় তা আমি সহ্য করতে

পারি না। ঝামা দিয়ে কড়াই মাজার শব্দে আমি প্রায় জ্ঞান হারাই। আমি পুরুষ এই সত্যটা মেয়েটি যখন আমাকে বোঝাতে চাইতো তখন আমি ঝামা দিয়ে কড়াই মাজার শব্দ শুনতাম। প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যেতাম। কাঁদতাম। এক-একদিন প্রচণ্ড এক উত্তেজনা আমাকে পেয়ে বসতো, পাগলের মতো বাসনকোসন ভাঙতে শুরু করতাম। এমনি এক পাগলামোর রাতে আমি আমার আজীবন সংগী আইরাজ মণিরাজকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললাম। আর্শি ভাঙার সেই ঝনঝনানি শব্দে ভয় পেয়ে মেয়েটি প্রচণ্ড চিৎকার করে দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে থামাতে এলো। কাঁচভাঙার সুরেলা শব্দ, মেয়েটির চিৎকার আর সমুদ্রের গর্জন এক মিনিটে আমাকে পাল্টে দিলো। ওকে বুকে চেপে ধরলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম কোন ওঝার মন্ত্রপূত জলের ছিটে পেয়ে আমি ধীরে ধীরে পুরুষ হচ্ছি।

রাতশেষে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লে ওর পায়ে মাথা রেখে বললাম,—হে ঈশ্বরী! তোমাকে প্রণাম।

দুপুর রাত। সাদা বালিশে চুল এলিয়ে, লাল কটকি কাজ করা চাদর মুড়ি দিয়ে ঈশ্বরী আমার পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। আমি আলো জেবলে বিকেলে আসা সেই খামখানা খুলে ফেললাম—

ইংরেজী উনিশশো ছেচল্লিশ সালে আমার মক্কেল বেঙ্গল অপেরা পার্টির একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীপটলচন্দ্র গুদুনীয়া আপনার সহিত পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তির এক নম্বর শর্তানুসারে স্থিরীকৃত ছিল যে আপনি নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঁচ বৎসর উক্ত অপেরা পার্টিতে অভিনয় করিবেন। চুক্তির দুই নম্বর শর্ত মোতাবেক কোন পক্ষই উপযুক্ত নোটিশ না দিয়া এবং উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়া এই চুক্তি সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে খারিজ বা অকার্যকর করিতে পারিবেন না। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য আমার মক্কেল বাবু পটলচন্দ্র গুদুনীয়া আপনার সহিত সম্পাদিত চুক্তি সামগ্রিকভাবে খারিজ করিয়া দিতেছেন। কারণগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল :

(১) আজকাল স্ত্রী-ভূমিকাতে প্রভূত পরিমাণে প্রতিভাশালিনী নারী অভিনেত্রী পাওয়া যাইতেছে।

(২) স্ত্রী-ভূমিকাতে নারী অভিনেত্রী অভিনয় না করিলে যাত্রা অভিনয়ে দর্শক সমাগম হয় না। ফলে যাত্রাদলের ব্যাবসাগত স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। আমার মক্কেল তাঁহার দলের শিল্পগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং ব্যাবসাগত স্বার্থরক্ষা করিবার বাসনায় স্ত্রী ভূমিকাতে অভিনয়ের জন্য মহিলা অভিনেত্রী নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

(৩) এমতাবস্থাতে আমার মক্কেলের পক্ষে আপনাকে আর অভিনয় কার্যে নিযুক্ত রাখা সম্ভব নয়। অবিলম্বে উক্ত যাত্রাপার্টিতে অভিনয় কার্য হইতে আপনাকে মুক্তি দেওয়া হইল। এখন হইতে উক্ত যাত্রাদলের সহিত আপনার সকল প্রকার সম্পর্ক রহিত হইল। আমার মক্কেল আপনার উচ্চশ্রেণীর শিল্প-প্রতিভার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিতেছেন এবং আপনার সহযোগিতার জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

স মা লো চ না

ভাষাপথিক হরিনাথ দে—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। অভী প্রকাশন। কলিকাতা ১। মূল্য পনেরো টাকা।

বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ—অরুণ সান্যাল। প্রতিভা প্রকাশন। কলিকাতা ৫৪। মূল্য ষোল টাকা।

কৃতী পুরুষের জীবনী রচনার দ্বারা এক অর্থে আমরা জাতীয় দায়িত্বই পালন করি—এমত তত্ত্বের উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ জীবনীকারদের প্রকৃতপ্রস্তাবে শিরোপাই দিয়েছিলেন। তত্রাচ দুর্ভাগ্য যে, এ-ভাবনায় সম্মানিত হবার মতো প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে অদ্যাবধি দুর্লভ; কারণ বিষয় নির্বাচন বা জীবন-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর যথাযথ তালিকা প্রণয়নেই যে জীবনীকারের দায়িত্ব ঘোচে না, এবং প্রায় একই সঙ্গে তত্ত্ব ও তথ্যের মৌলিক যোগাযোগ ঘটানোও যে তার দায়িত্বেরই অঙ্গ, এ-সত্য বিদেশের ভূরি ভূরি উদাহরণ সত্ত্বেও আমাদের প্রায় অগোচরই থেকে গেছে। ফললাভে যে-বিশ্বাসঘাতকতা আমাদেরই প্রশ্রয়ে তার মহীরুহরূপী শিকড় গেড়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে সম্ভবত পুনরায় যোগাসনে বসা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

বাংলাভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য জীবনীগ্রন্থগুলিকে স্মরণ রেখে বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে এদেশীয় জীবনীকারের হাতে ব্যক্তিত্ব সর্বদাই যে কেবল আধিদৈবিক বা সেই ব্যক্তিত্বের জন্মলগ্নের সঙ্গেই আরোপিত, তাই নয়, সামাজিক সম্পর্ক ও তৎসংক্রান্ত বিষয়বোধে যুক্ত তাঁর সমগ্র কর্মকান্ডও প্রায় অস্বীকৃত হয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি গভীর অনাস্থায়। এ-হেন নাস্তিক্যের সঙ্গে আমার ঐক্যমত হতে বাধে; কারণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে আমি যে কেবল উক্ত সম্পর্কগুলিকেই স্বীকৃতি দিই তাই নয়, সেই সঙ্গে মানি যে ব্যক্তিত্বের বিকাশে মন ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজাত প্রবৃত্তি ও অভিব্যক্তিগুলির ক্ষেত্র কী গভীরভাবে বিস্তৃত। কার্যত, জীবনী রচনায় উক্ত সমগ্র বিষয়াবলী যথাযথ স্বীকৃতি না পেলে কেবল যে তার মূল্যমান হ্রাস পায় তাই নয়, তা হয়ে ওঠে অবৈজ্ঞানিকতার চূড়ান্ত উদাহরণ। আর এবম্প্রকার বিশৃঙ্খলার অতিপ্রাকৃত হাস্যকর সংস্করণে—নীটসের ভাষায়, crimen laesae majestatis humanae—মানবিক যাবতীয় সুস্থ অনুভূতি প্রায় বিশৃঙ্খলায় দিগভ্রান্ত হয়।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিনাথ দে-বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনায় এ-ভূমিকা অবশ্যই যথেষ্ট নয়। যে-মনীষার সমগ্র ক্রিয়াকলাপ নিতান্ত অবহেলায় এদেশে প্রায় বিস্মৃত হতে চলে-ছিলো এবং শুধুমাত্র কিংবদন্তির নায়করূপেই যার অবস্থিতি দেশীয় আবহাওয়ার গুণেই ক্রমশ পলিমাটিতেই আবৃত হতে থাকে, তাকে উদ্ধার করে যথার্থ স্বভূমিতে পুনর্বাসন দানই সুনীলের একমাত্র কীর্তি নয়, যদিচ এই একমাত্র উদ্দেশ্য সাধনেই তিনি হতে পারতেন এদেশে বহুশ্রুত; তাঁর মৌলিক গবেষণায় তিনি যেমন একাধারে বহুপরিশ্রমের দানে সংগ্রহ করেছেন হরিনাথের জীবন-বিষয়ক প্রত্যেক খুঁটিনাটি এবং তাকে গ্রথিত করেছেন একটি মনীষার বিশ্বাসযোগ্য মূর্তি নির্মাণে, সেই সঙ্গে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন ব্যক্তিত্বের জন্ম ও বিকাশের প্রত্যেক কার্যকারণসূত্রকে; প্রকৃতপ্রস্তাবে এই জীবনী

রচনার দ্বারা তিনি যে কেবল এই প্রকার রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলেই বিবেচিত হলেন তাই নয়, তিনি আমাদের শেখালেন পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের প্রয়োগের উপায় ও পথ। গোর্কীর তলস্তয়-বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন লেখক তাঁর আলোচনায় সম্ভবত বাস্তবতাবোধের তাগিদে, যদিচ তাঁর আলোচনার ধর্ম কোনমতেই উক্ত গ্রন্থের ধারানুসারী নয়; পক্ষান্তরে তাঁর তুলনা (অবশ্যই কিছু সংকীর্ণ অর্থে) ভিক্টর উলফেনস্টাইন বা জর্জ উডককের সঙ্গেই উপযুক্ত। এবম্প্রকার বিবেচনা থেকে তিনি হরিনাথকে চিহ্নিত করেন এক 'আত্ম-সার্থককারী ব্যক্তিত্ব' হিসাবে এবং যার 'অন্যতম দুর্লভ গুণ বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগশূন্য বিমূর্ত ধারণাগুলি সম্বন্ধে চূড়ান্ত অনীহা এবং নতুন বিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষ বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অন্তহীন আগ্রহ'। আর এ-সূত্রেই তাঁর বিশ্লেষণ, অচেনা সুদূরকে জীবনে বিপুল উৎসাহে গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের আর একটি প্রমাণ। তাঁর অসংখ্য ভাষা শেখার প্রচেষ্টার মূলেও ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনমতো তিনি যে এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খলভাবে জ্ঞানের অনেক ধাপ হয়তো বা অসম্পূর্ণ রেখেই কোনও একটি ভাষাশিক্ষা অথবা ক্ষেত্রবিশেষের গবেষণায় প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পেরেছেন তার কারণ হল তাঁর ব্যক্তিত্ব আপন সৃজনশীলতার বেগে কোথাও নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন মনে করেনি। তাই অনেক ক্ষেত্রে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, নৈরাজ্য অন্যদের অকল্পনীয়, হরিনাথের ব্যক্তিত্বে সেগুলি খুব সহজে সমন্বয় অর্জন করেছে।

কার্যত হরিনাথের ব্যক্তিত্বের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াই তাঁকে বাধ্য করেছিলো এক অনমনীয় মনোভাবের দৃঢ়তায় স্থির হতে এবং যার ফললাভে পরিবেশের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়ে উঠেছিলো অনিবার্য; বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সংঘাত, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে পদচ্যুতি প্রভৃতি ব্যর্থতার পাশাপাশি বিদ্যাচর্চায় প্রভূত সাফল্য সমস্তই একই ব্যক্তিত্বের ভিন্ন-ধর্মী প্রবণতার সাক্ষ্য। সুনীলবাবু এর ব্যাখ্যানে যথার্থই লেখেন, 'সামাজিক তথা ঐতিহাসিক পরিবেশকে অতিক্রম করার স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা আত্মসার্থককারী ব্যক্তিত্বে অন্যতম প্রধান সূচক। হরিনাথ তাঁর ব্যক্তিত্বসংলগ্ন পরিবেশ থেকে মূলত কোনও প্রেরণাই পাননি। আপন ভাষাগত প্রতিভাকে বিকল্পিত করার জন্যে একমাত্র নিজ ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনাকেই তিনি অবলম্বন করে-ছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে ভবিষ্যতের সমস্ত আঘাত, বিপর্যয়, নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।'

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন উপস্থাপিত হতে পারে যে এবম্প্রকার ব্যর্থতা ও সার্থকতায়, নৈরাশ্যে ও আশাবাদে হরিনাথ কি শেষ পর্যন্ত উপনীত হতে পেরেছিলেন কোন উপান্তে, যা শেষ পর্যন্ত বিদ্বত্তাকে মনীষায় রূপান্তরিত করে। সুনীল কোন শেষ সত্য উচ্চারণ করেন নি; পক্ষান্তরে তিনি আমাদের বিবেচনার প্রয়োজনেই পরিশিষ্টে যুক্ত করেছেন অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী, নীরদ-চন্দ্র চৌধুরী, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক তারকনাথ সেনের ভিন্নধর্মী মতামতগুলি, যা একাধারে স্বীকার ও অস্বীকারের তাৎপর্যপূর্ণ দলিলরূপেই গ্রাহ্য। এবং উল্লেখযোগ্যরূপেই এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে হরিনাথের নিয়োগ ও পদচ্যুতি বিষয়ক সমগ্র নথিপত্রের প্রতিলিপি। এ-ছাড়া এখানে সংযুক্ত হরিনাথের বিস্তৃত রচনাপঞ্জী, প্রমাণপঞ্জী ও নির্দেশিকা কেবল লেখকের গবেষণার গৌরবই বৃদ্ধি করেনি, সেই সঙ্গে তিনি পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন পুনর্বিচারের সমস্ত দায়ভার।

তদুপরি পুনর্বার উল্লেখযোগ্য এই গ্রন্থের তথ্যসংগ্রহ, যার সন্ধানে লেখক প্রকৃত অর্থেই

প্রায় বিশ্বপরিক্রমা করেছেন; এইপ্রকার অনুসন্ধিৎসা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই এক বিরল উদাহরণ। কারণ এদেশীয় আবহাওয়ায় কিংবদন্তির নায়কেরা যে অর্থে তাঁদের বাস্তব অস্তিত্ব হারান এবং অনায়াসে প্রতিষ্ঠা পান স্বপ্নলোকের বাসিন্দা হিসাবে, তাকে শরীরী অস্তিত্ব দিতে হলে যে-পরিমাণ নিষ্ঠার প্রয়োজন—এদেশে তার উদাহরণ ক্বচিৎ মেলে; এ-গ্রন্থ রচনায় সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় যে বারংবার এইপ্রকার বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, তা তাঁর পাদ-টীকার প্রাচুর্যেই প্রমাণিত। এবং আমার ভাবতে অবাক লাগে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারী সাহায্য, বা কোনপ্রকার শিরোপা লাভের আশা না-করেই এই গ্রন্থ রচনায় এদেশে একজন গবেষক কী করে এ-পরিমাণ পরিশ্রমে আগ্রহী হন! অথবা হয়তো এ-কারণেই সুনীল এত সাহসে তথ্য উদ্ঘাটনে হয়েছেন এমন নির্ভয়! অন্যথায় তিনি কেমন করে প্রকাশ করতেন স্যার আশুতোষ-হরিনাথ সম্পর্কের তিক্ততা অথবা তুলনায় উপস্থাপিত করতে পারতেন উনিশ শতকীয় প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দকে ও তাঁদের রচনাবলীর বিতর্কিত মন্তব্যাদি।

অবশ্যই সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থাপিত সকল তত্ত্বের সঙ্গে আমি একমত নই এবং হয়তো অনেকেই হবেন না; যেমন মধুসূদন ও হরিনাথকে তিনি ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে মনে করেন সমধর্মা, যা আমার বিবেচনায় অধিক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে অথবা তিনি যে অর্থে রাম-মোহন-বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথকে আত্মসার্থককারী ব্যক্তিত্বের উদাহরণস্বরূপে চিহ্নিত করেন, তাও কার্যত বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এ-সমস্তই বাহ্য। লেখকের মৌলিক গবেষণা তার ফলে কিছুমাত্র আহত হয় না; পক্ষান্তরে আমাদের আহ্বান করে এক গভীর জিজ্ঞাসায় ও পুরাতনের পুনর্মূল্যায়নে।

উপরিউক্ত ভূমিকায় সংযুক্ত না করেও ডঃ অরুণ সান্যালের লেবেডেফ সংক্রান্ত গবেষণা সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি এ-গ্রন্থের রচনাদ্বারা দুরূহ কর্মসম্পাদনের কর্তব্যভার গ্রহণ করেছেন। ১৩২৮ সালের "বাসন্তী" পত্রিকার লেবেডফ বিষয়ে মন্তব্য: '...বাঙ্গালার নাট্য-মন্দিরের ও নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গেলে তাঁহারই নাম সর্বাগ্রে করা কর্তব্য। কারণ বাঙ্গালী নাটক তিনিই প্রথম লিখিয়াছিলেন, এবং এদেশে রঙ্গমঞ্চ জিনিসটাও মনে হয় তাঁহারই হাতে প্রথম গড়িয়া উঠিয়াছিল।' মুখ্যত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে লেবে-ডেফের এই দান বিষয়ে আমাদের অবহিতি যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে খণ্ডিত সত্য ছিল, এবং তাঁর বিষয়ে অন্যান্য অনুসন্ধিৎসায় আমাদের আলস্যও যে দায়ী, এ-তথ্য সম্ভবত এই প্রথম এত বিপুল ব্যাপ্তিতে জ্ঞাতব্য হলো। ২৫৩-পৃষ্ঠার আয়তনে ডঃ সান্যাল বাংলা নাটকের ও মঞ্চের উদ্ভব, সমসাময়িক নাট্য আন্দোলন ও লেবেডফ, ব্যক্তিপরিচয় ও জীবনদর্শন প্রভৃতি অধ্যায় সমকালীন সাংস্কৃতিক পটভূমি ও লেবেডেফের ভূমিকা বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণায় বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করেছেন।

ডঃ সান্যালের 'কথামুখ' থেকে জানা যায় যে লেবেডেফ শুধুমাত্র বাংলা নাটক ও নাট্য-মঞ্চের ক্ষেত্রেই অবদান রাখেন নি, সেই সঙ্গে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের সংস্কৃতিকেও নানাভাবে। নাটক অভিনয় ও রচনা অবশ্যই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেরই অঙ্গ এবং শুধুমাত্র এ-কাজে সম্পূর্ণত নিয়োজিত একজন ব্যক্তিত্বকে আমাদের আসন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠার কারণ ছিল না—অন্য গুণাবলীতে সমৃদ্ধ না হলেও। কার্যত ভারতবর্ষের সঙ্গে লেবে-ডেফের যোগাযোগ ঘটেছিলো যে ঘটনাবলীর সংঘট্টে এবং তার সূত্র ধরেই যে অর্থে তিনি এদেশীয় সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন, তার বীক্ষণে আমরা অনায়াসেই সেই ব্যক্তিত্বের জীবনচর্চার গভীর পর্যন্ত অনুধাবনে রত হতে পারি; কিন্তু কার্যত এ-বিষয়ে

এতকাল আমাদের অনীহা তাঁকে কেবলমাত্র এক বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ডের নায়করূপে চিহ্নিত করে রেখেছিল, এ-তথ্য ডঃ সান্যালের। তদুপরি লেবেডেফ যে অর্থে এদেশের মানসিকতায় সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন ইউরোপীয় মানসিকতা এবং শেষ পর্যন্ত যে যোগাযোগে ভারতীয় জীবন-বোধে স্থান পায় আধুনিকতা, তা কোন নাস্তিক্যেই অস্বীকার, প্রায় বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। ডঃ সান্যাল লেখেন : 'লেবেডেফ যে নাটককে এদেশের মানুষের সামনে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন তা সংস্কৃত নাট্যসম্ভার থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা ইউরোপীয় নাটক ও ভারতীয় নাটকে সাদৃশ্যহীনতা শুধুমাত্র গঠনরীতিতেই নয়, বস্তুত এদের প্রেরণাই স্বতন্ত্র।' জ্ঞাতসারে বা আকস্মিকভাবে, যেভাবেই এই ঘটনাবলী সংঘটিত হোক না কেন, পরবর্তী-কালের নাট্যচর্চায় এই স্বতন্ত্র প্রেরণার প্রভাব অনস্বীকার্য।

এতদ্‌ব্যতীত লেবেডেফ *The Disguise* ও *Love is the Best Doctor* নামীয় যে দুখানি নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন ও *A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* নামীয় যে গ্রন্থ রচনা করেন, তার বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশিত হয়েছে এক শিল্পানুরাগীর চরিত্র। তথাপি এ-সমস্তের অন্তরালে লেবেডেফ নামীয় যে ব্যক্তিমানুষ, তিনি একাধারে যেমন সংগ্রাম করে চলেছেন অসহনীয় দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে, ঠিক তেমনিভাবে এক অপরিসীম মানসিক স্থৈর্যে চর্চায় নিরত ছিলেন এদেশীয় সংস্কৃতির এবং এই যে ব্যক্তিমানুষ, তিনি সমস্ত কর্মকাণ্ডের ওপরে ব্যক্তি অস্তিত্বে আমার বিবেচনায় অধিক আকর্ষণীয়। আর এ-প্রকার জীবনকে উপলক্ষ্য করে অনায়াসে লেখা চলে কোন উপন্যাস বা নাটক।

স্বভাবতই, লেবেডেফের জীবন ও কর্মকাণ্ডের গবেষণায় এ-কারণেই প্রয়োজন এক বৈজ্ঞানিক মানসিকতার, যা কদাচ বিভ্রান্ত নয় কোন প্রাসঙ্গিক ভাবালুতায় অথবা কোন নৈকট্যের আগ্রহে নিজেকে প্রতিপন্ন করবে না কোন সহজিয়ারূপে। ডঃ সান্যাল যে প্রথমাবধি এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এমত মন্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তিস্থাপনা বাতুলতামাত্র; তৎসত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা গবেষকদের পক্ষে ঈর্ষার কারণ হিসাবে বিবেচ্য হতে পারে এবং এ-নিষ্ঠায় সাধুবাদই তাঁর প্রাপ্য।

তত্রাচ বহু বিষয় গবেষণার শাস্ত্রানুযায়ী আমার বিবেচনায় জিজ্ঞাস্য। লেবেডেফ-আত্মজীবনীর উদ্ধৃত অংশগুলির সূত্র যেমন পাঠকদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে, তেমনি বহু তথ্য সংস্থাপিত হয়নি মূল বিষয়টিকে অধিকতর মূল্যবান করে তোলবার প্রয়াসে। রুশদেশ তো এখন আর আমাদের কাছে কোন লৌহযবনিকার অন্তরালবর্তী দেশ নয় এবং যেখান থেকে অল্প আয়াসেই সংগ্রহ করা যেত বহু তথ্য, যা এদেশীয় তথাকথিত পণ্ডিতগণের আয়ত্ত নয়! সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনা অবশ্যই এখানে প্রাসঙ্গিক। এ-ধরনের তথ্য অধিকতর বিবৃত করা অবশ্যই অনুচিত, তথাপি যেহেতু আমার বিশ্বাস গবেষণা যে কোন অর্থেই কোন বৃত্তিলাভের চেয়ে মূল্যবান, সে-অর্থেই হয়তো আরও কিছুটা অনুসন্ধিৎসু হতে পারতেন ডঃ সান্যাল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কোনক্রমেই বিস্মৃত হতে পারি না তাঁর পরিশ্রমী গবেষণাকে।

নির্মল ঘোষ

বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি— কার্তিক লাহিড়ী। সারস্বত লাইব্রেরী। কলিকাতা ৬। মূল্য দশ টাকা।

বিষয় : বাঙলা উপন্যাস, তার ওপর আলোচ্য তার ফর্ম বা রূপকল্প—পাঠকের পক্ষে এমন একটি বইয়ের আকর্ষণ অস্বীকার করা কষ্টকর। নামে যা মনে হয়, বইটি অবশ্য সেই আ-সাম্প্রত বাঙলা উপন্যাসের আলোচনা নয়। কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই, যখন থেকে বাঙলা উপন্যাসে রূপকলা ব্যবহারে যথার্থ নিরীক্ষার প্রসার—এই বইটি ঠিক তার উপক্রমে এসেই থেমে যায়।

সূচীপত্র থেকে উপসংহার পর্যন্ত সর্বত্রই লেখককে আপোষ করে চলতে হয়েছে। "চার অধ্যায়" পর্যন্ত বাঙলা উপন্যাসকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করে নেন : ঘটনাপ্রধান, মনস্তত্ত্ব-মূলক ও মননধর্মী। কিন্তু তাঁর বইয়ের শেষ দুটি অধ্যায় 'আখ্যানভঙ্গী' ও 'ভাষা'; এবং প্লটের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগও তিনি মেনে নিয়েছেন (পৃ. ৮৪-১০৩)। অর্থাৎ প্রথম তিনটি বিভাজন চারিত্রগত, শেষ দুটি গঠনগত। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থকার যখন "আলাল", "অঙ্গুরীয় বিনিময়" দিয়ে শুরু করে "দুর্গেশনন্দিনী" থেকে প্রায় ধারাবাহিকভাবে রমেশচন্দ্র ও তারকনাথকে সাক্ষী রেখে পেঁছতে চান "চার অধ্যায়"-এ, তখন মনে হয়, 'রূপকল্প ও প্রযুক্তি' তাঁর বইয়ের শিরোনামে স্থান পেলেও, সে-বিষয়ে তাঁর ধারণা নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। না কি সত্যিই কার্তিকবাবু মনে করেন, বাঙলা উপন্যাসের গঠনবৈচিত্র্যে এঁদের দান নামতও উল্লেখযোগ্য? আর সেইজন্যেই কি শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে 'জনপ্রিয়তার খাতিরে ঘটনাবাহুল্য ও মনোবিকলনের মধ্যে তিনি একটা আপোষ করার চেষ্টা করেছিলেন' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ সমস্যার স্বরূপ যতটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র তার অংশত সক্ষম হননি'—এ-সত্য স্বীকার করেও শরৎচন্দ্রকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন? তৃতীয়ত, তাঁর আলোচনা কালানুক্রমিক। যদি আঙ্গিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতার ওপর তিনি জোর দিতে চান, তাহলে তাঁর উচিত ছিলো 'কথাবস্তু'র (narrative) ছকের (pattern) স্তর-- পরম্পরা আবিষ্কার করা। আর যদি উপন্যাসে প্লটের বৈচিত্র্য দেখানো তাঁর লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে সঙ্গত হতো সেই সম্ভাব্য বিভাগ অনুযায়ী আলোচনা করা। কিন্তু কার্তিকবাবু এর কোনোটিই করেননি। ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা ও চরিত্রের সঙ্গতি বিচারেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। তিনি প্রায়ই উপন্যাসের নিয়মের কথা পেড়েছেন, কিন্তু কোথাও স্পষ্ট করেন না সেই নিয়মের স্বরূপ। দশ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি উপক্রমণিকা রচনা করেও কার্তিকবাবু একবারের জন্যেও প্রকরণগত সমস্যাগুলোর উল্লেখ করলেন না—উপন্যাস শব্দের মধ্যে মেনে নিলেন অ্যানাটমি (ফিক্‌শন) থেকে রোমান্সের বহুবিচিত্র সংজ্ঞার্থ; বর্ণনা ও বিবৃতি, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ, কাকতালের ব্যবহার বা সমাপ্তির সমস্যা তাঁকে ভাবিত করলো না; পাত্রপাত্রী নির্বাচনে বাঙলা উপন্যাসের স্বভাবসীমাবদ্ধতার প্রশ্নেও তিনি নিরুৎসুক রইলেন।

আর এ-ভাবনাগুলো যে তাঁর মনে জাগেনি, তার প্রধান কারণ তাঁর আলোচনার বনিয়াদ বক্তব্য-নির্ভর। বিষয়সূচীই তার প্রমাণ। অবশ্য কার্তিকবাবু তাঁর স্বপক্ষে এডুইন মুরের "স্ট্রাক্‌চার অব্‌ দি নভেল" (১৯২৮) বইটির সাক্ষ্য উল্লেখ করতে পারেন। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় বইটি এখনো ব্যবহৃত হলেও উপন্যাসের গঠনশৈলীর আলোচনা তাকে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। রিচার্ডসের "প্র্যাক্টিক্যাল ক্রিটিসিজ্‌ম্‌"

প্রকাশিত হবার পর সাহিত্যে 'ফর্মালিস্টিক' আলোচনার যে-পথ খুলে গেছে—ক্লিয়েন্থ ব্রুক্স্, উইলিয়ম উইম্স্যাট্ বা রবার্ট পেন ওয়ারেন তাঁদের সমালোচনায় সেই পদ্ধতির সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। কার্তিকবাবু সেই সমালোচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন, হলে উইম্স্যাট্ ও ওয়ারেনের "আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফিক্শন" ও ঐ গোষ্ঠীর মুখপত্র "এক্সপ্লিকেটর"-এর আলোচনাভঙ্গি থেকে অনেক শিক্ষণীয় ইঙ্গিত পেতে পারতেন। সাম্প্রতিকতম স্ট্রাক্চারালিজ্ম্ না-হয় এখনো বিচারসাপেক্ষ।

আমার মনে হয়, তাঁর আলোচনা পাছে আংশিকতায় আক্রান্ত হয় এই আশঙ্কায় অতি সতর্ক হওয়ার ফলেই কার্তিকবাবু তাঁর বিষয়ের প্রতি অবিচার করেছেন। এই সভয় বিহ্বলতাতেই তিনি পা বাড়িয়েছেন গতানুগতিক চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব আলোচনার চোরা-বালিতে। ফর্মালিস্টিক সমালোচনার সঙ্গে তাকে মেলাতে যাওয়া শ্যাম আর কুল রাখার মতোই অসাধ্য। মনে রাখা দরকার, ফর্মালিস্টিক সমালোচনার উদ্ভব প্রধানত প্রচলিত সমালোচনাপদ্ধতির বিরোধিতা করে। একদিকে ভিক্টোরীয় নৈতিকতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক পদ্ধতি, অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক ও মার্ক্সীয়দের বিশ্বাসগত পক্ষপাত—এই চতুরঙ্গ বিরোধিতার মধ্যে ফর্মালিস্টরা একাগ্র হলেন প্রকরণের মধ্য দিয়ে শিল্পীকে চিনে নিতে। কারণ, ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত আবেগ থেকে মুক্ত হতে গিয়েই লেখক আশ্রয় নেন শিল্পের কাঠামোয়—উপন্যাসের ক্ষেত্রে যাকে বলা যায় প্লট। প্লট তাই শব্দরূপের মতো কোনো ছক নয়, বা বীজগণিতের সূত্র, যে সেই আইনেই বেরিয়ে আসবে তার নিষ্পন্ন ফল। লেখকের সঙ্গে চরিত্রের ব্যক্তিত্বের সংঘাতই জন্ম দেয় নতুন-নতুন প্লটের—সময়শৃঙ্খলা তার রক্ষী, কিন্তু নিয়ামক নয় কখনো। যে-উপন্যাসে সেই নিরীক্ষার কোনো চিহ্ন নেই—তা সে যতো ঐতিহাসিক মূল্যসম্পন্ন বা যতো বড়ো প্রতিভার সৃষ্টিই হোক্-না কেন—তা আলোচনার কোনো দায় নেই তাঁর। কার্তিকবাবু ভুলে গেছেন, তাঁর বিষয়বস্তু রূপকল্প ও প্রযুক্তি—বাঙলা উপন্যাসের ইতিবৃত্ত রচনা নয়।

স্বীকার করতে বাধা নেই, জন্মসূত্রেই এই আততির অভাব বাঙলা উপন্যাস উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে ইংরেজি উপন্যাস থেকে। ১৮৮৮-তে ইংরেজি উপন্যাস বিষয়ে হেনরি জেমসের অনুযোগ আজকের বাঙলা উপন্যাস সম্বন্ধেও প্রায় পুরোপুরি সত্য। আর এই 'lack of composition' থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ আজ বোধহয় কবিতার স্বরাট সাম্রাজ্যে প্রবেশের অধিকার অর্জন করা—যে-কবিতা উপন্যাসের পক্ষে বাড়তি নয়, যেখানে কবিতাই হয়ে ওঠে চরিত্র। যেমন, অংশত "কপালকুণ্ডলা"য় বা "চতুরঙ্গ"এ। সেদিকে কার্তিকবাবুর নজর পড়েনি বলেই 'ঔপন্যাসিক ও নীতিবিদের দ্বন্দ্ব' অধ্যায়ে "কপালকুণ্ডলা" এবং 'মননধর্মী উপন্যাস' পর্যায়ে "চতুরঙ্গ" উপন্যাসের আলোচনা স্থান পায়। ভাষার মেজাজে কীভাবে কবিতার ছোঁয়া লাগছে, তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে সাধু-চলিতের অর্থহীন আলোচনায় ঘুরপাক খায়।

শেষ দুটি অধ্যায়ে লেখকের কোনো নতুন বক্তব্যের পরিচয় পাওয়া গেলো না। যেখানেই কার্তিকবাবু সচেতন, তাঁর ভাষায় সুধীন্দ্রনাথের প্রভাব দুর্মর। বাঙলা পরিভাষার অভাবেও তাঁর ভাষা কখনো অস্বচ্ছ মনে হয়েছে, কখনো অতিব্যাপ্ত। সে-দায় কার্তিকবাবুর একার নয়।

স্বপন মজুমদার

কৃষি সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গে সবুজ বিপ্লব কতটা সার্থক হয়েছে এ-সম্পর্কে কিছু তথ্য

১৯৪৭-৪৮ সালে আউস, আমন ও বোরো মিলিয়ে এ রাজ্যে ধান চাষ হয়েছিল মাত্র ৩৯·১ লক্ষ হেক্টর জমিতে, আর সে জায়গায় ১৯৭১-৭২ সালে চাষ হয়েছে ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে। ফলে ফসলের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫·০৮ লক্ষ টন। সত্যি কথা বলতে কি, ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন করার গৌরব অর্জন করেছে। এর মধ্যে বোরো ধানের উৎপাদন বেড়েছে লক্ষণীয় ভাবে। অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে, ১,০৮,০০০ টনের জায়গায় ১৯৭১-৭২ সালে বোরো ধান হয়েছে৯,৩৪,০০০ টন।

অধিক ফলনশীল বীজের প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ রাজ্যে গম চাষেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে ৪,২২,০০০ হাজার কেক্টর জমিতে গম উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯,২১,০০০ টন।

পাট চাষের ক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রগতি রীতিমত বিস্ময়কর। ১৯৪৭-৪৮ সালে এ রাজ্যে মাত্র ৬·৫ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হয়েছিল। আর সে জায়গায় ১৯৭১-৭২ সালে হয়েছে ৩৪·৪২ লক্ষ গাঁট।

একইভাবে আখ, আলু তৈলবীজ, ডাল এবং সয়াবীন চাষের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলেছে।

শুকনো জমিতে চাষের ক্ষেত্রে তুলো, চীনাবাদাম এবং সূর্যমুখী ফুল চাষের ব্যাপারেও যথোচিত অগ্রগতি হয়েছে।

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ একটি জরুরী ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত সেই প্রকল্পে ৩৫০টি নদী থেকে জল উত্তোলন কেন্দ্র, ৫০০০টি অগভীর নলকূপ তৈরী এবং ৯০০০টি পাম্পসেট বিলির কাজ শেষ হয়েছে। ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা সম্প্রসারণের কাজ জোর কদমে চলেছে।

॥ কৃষি অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত ॥

ভারতের
প্রতিরক্ষা ও
উন্নয়নে
অংশ গ্রহণ করুন
সেই সঙ্গে
আয় করুন
৭$\frac{১}{৪}$%
সুদ
৫ বছরের
ডাকঘর নির্দিষ্টকালীন জমার ওপর
৩ বছরের
জমায়.......... ৭%
১ বছরের
জমায়....... ৬%
এই সঙ্গে অন্যান্য করমুক্ত সিকিউরিটী ও ডিপজিটের ওপর
প্রাপ্য সুদ নিয়ে বছরে মোট ৩০০০ টাকা পর্যন্ত সুদের ওপর
আয়কর লাগবে না।
আপনার ডাকঘর কিংবা আপনার জেলার জাতীয় সঞ্চয়
সংক্রান্ত জেলা সংগঠকের কাছে খোঁজ করুন।
জাতীয়
সঞ্চয়
সংস্থা
212

Jamshedpur's new cultural centre

The foundation-stone of Jamshedpur's Rabindra Bhavan was laid in December 1961 by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan in the presence of Dr. Zakir Husain and other distinguished guests. It was a fitting beginning. The Rabindra Bhavan is designed to be a centre not only for the study of music, dance, drama and literature but also for presenting art and cultural shows from different regions of India.

The Rabindra Bhavan symbolises Jamshedpur where, as Dr. Radhakrishnan said, "national integration is seen at work". A city where men and women from all over India live happily, sharing in its amenities and its facilities for self-development, and participating in its social and cultural life.

THE TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

TN [illegible]

শুভবিবাহে
এই
উপহার
অনন্য
অতুলনীয়...

সারা জীবনের সুখের জন্য
উষা সেলাই মেশিন!

শুভ-বিবাহে অন্য কোন উপহারে এমন তৃপ্তি ও উপকার পাওয়া যায়না — সারা জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে একমাত্র উষা সেলাই মেশিন।

উষা সেলাই মেশিন যে কোন গৃহের সাজ-সজ্জার সঙ্গে মানান-সই নানা মনোরম রং ও মডেলে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি মেশিন হাতে পায়ে কিংবা ইলেকট্রিকে চলে এবং প্রত্যেকটি মেশিনের জন্য ভারতের সর্বত্র রয়েছে বিক্রয়োত্তর সার্ভিস ব্যবস্থা। উষা মেশিন চালানো খুব সহজ — এর সাহায্যে নব বধূকে বাড়ীতে সেলাইয়ের আনন্দ ও উপকারিতা উপলব্ধি করার সুযোগ দিন। আজই একটি উষা সেলাই মেশিন কিনে দিন।

কেনা ভাল সবার ভাল

UMG/76-71 BEN

ভারতের শক্তি বিপুল জনসংখ্যায় নয়
তার শক্তি হল স্বাস্থ্যসম্পন্ন, সুশিক্ষিত নাগরিক।
ছোট পরিবারের
* সন্তান স্বাস্থ্যবান
** প্রত্যেকে সমৃদ্ধির বৃহৎ অংশীদার
*** সুশিক্ষা পাবার সুযোগ বেশি

খ

New! Blue top EVEREADY

TRADE MARK

1055

Price Rs.1.55
Taxes extra.

TRANSISTOR BATTERY

Now, get better, distortion-free reception from your transistor with 'Eveready' 1055. Because 1055 contains a unique electrolytic depolarizer that makes for greater, more efficient power generation.

Reduces distortion– Improves reception

গরমে চলুন
হালকা পায়ে
পুরুষদের জন্য বাটার স্যান্ডাল
আর চপ্পলগুলির নকশা এমন, যাতে
সহজে হাওয়া খেলতে পাবে। সুশ্রী
গড়ন দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের
কথা মনে রেখেই তৈরি। প্রত্যেকটিই
গড়নে ও উপকরণে অভিনব। বাটার
দোকানে এ-রকম স্যান্ডাল ও চপ্পলের
যেন মেলা বসে গেছে। এখানে তার
মাত্র কয়েকটি নকশা। আসুন না,
একবার পরে দেখুন।
সানবে
১০.৫০
ক্যাভ্যাডিস
২৭.৯৫
জুবিলি
২০.৯৫
Bata
Bata
Bata
Bata
সানওয়ে
১৯.৯৫
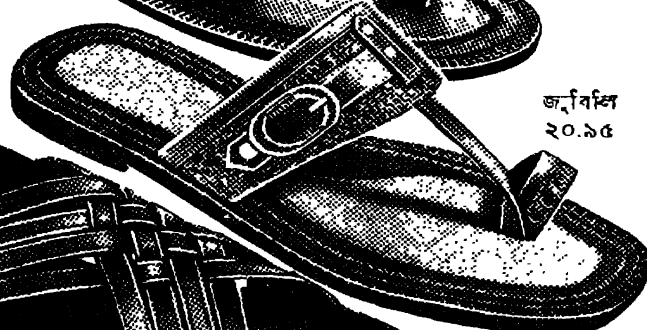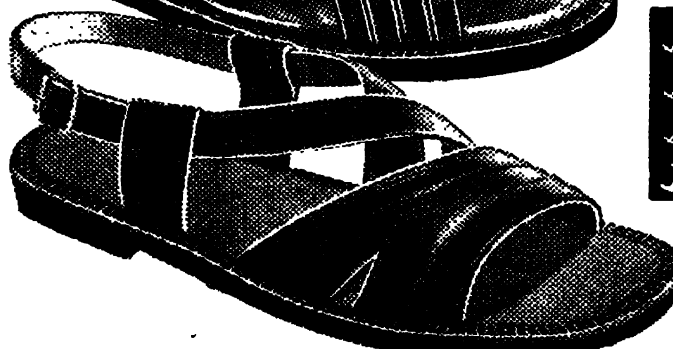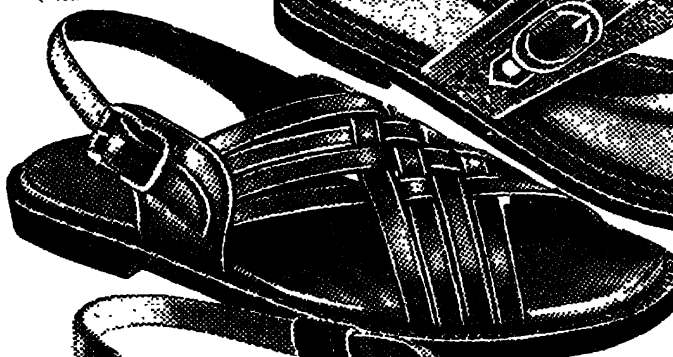
বর্ষ ৩৪ কার্তিক-চৈত্র ১৩৭৯

সূচিপত্র

সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

LG. 11/70

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

বর্ষ ৩৪ কার্তিক-চৈত্র ১৩৭৯

বৈষয়িক উদ্যোগের রীতিপ্রকৃতি: ভারতের অভিজ্ঞতা

শান্তিকুমার ঘোষ

ভারতের পরিকল্পনামূলক উদ্যোগের মূল কথা হ'ল উপাদান-উপকরণের অভাব অনটনের ভেতর কিভাবে একটা উন্নত আর্থিক ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা যায় তার প্রচেষ্টা। দ্বিতীয় যোজনা (প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ছিল বস্তুত কয়েকটি প্রকল্পের সমষ্টিমাত্র) থেকে বৈষয়িক অগ্রগতির যে নীতি গৃহীত হয়েছে তা মহলানবীশ উদ্ভাবিত ভারী শিল্পোন্নয়নের ছাঁচে অনুপ্রাণিত। ফেল্ডম্যান-মহলানবীশ ধারার গঠনতান্ত্রিক নকশায় মূলধন নিয়োগের বাস্তবিক দিকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, মূলধন নিয়োগের হার বাড়াতে হ'লে যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জামের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি দরকার। গোড়ার দিকে, যখন শিল্পব্যবস্থার বনিয়াদ তৈরী হচ্ছে, সে সময় ভোগব্যসনের মান অথবা ভোগব্যসন বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম রাখা চাই। এরকম উন্নয়ন কৌশলের তাৎপর্য হচ্ছে, অনেককেই জীবনধারণের আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে হবে, সম্ভবত ভবিষ্যতে সমৃদ্ধি অর্জনের আশায়। সুতরাং পূর্বোক্ত নীতি অনুসারে সঞ্চয়ের প্রান্তিক হার হবে বেশ উঁচু, অথবা বড়ো বহরে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন। দ্বিতীয় যোজনাকালে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার গোড়ার বছরগুলিতে এই সব শর্ত মোটামুটি বজায় রাখা গেছে।

ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে আমদানী অপসারণের জন্য উপযুক্ত শিল্পবিকাশকে উন্নয়নের মুখ্য ক্ষেত্র হিসাবে ধরা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থার সম্প্রসারিত একটি কাঠামো (যথা, জলসেচ, রেলপথ, রাস্তা, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি) নির্মাণের চেষ্টা করা গেছে প্রধানত প্রসারণশীল কারখানাশিল্প অংশটির প্রয়োজন মেটাতে। দ্বিতীয় যোজনায় গুরুত্ব দেওয়া হ'ল মৌল কারখানাশিল্পগুলি, বিশেষত যন্ত্র তৈরীর জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের শিল্পের উপর। ১৯৫৬-৫৭ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনা শুরু হওয়ার সময় থেকে যে শিল্পোন্নয়ন হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, ইঞ্জিনীয়ারিং, রাসায়নিক দ্রব্য, সার ও পেট্রোলিয়ম সামগ্রীর উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যসাধন শিল্প-ব্যবস্থাকে মজবুত করেছে। কারখানা শিল্পের বিন্যস্ত অংশে গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন হয়েছে ধাতু, যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যের অনুকূলে এবং ভোগপণ্যের বিরুদ্ধে।

বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় কৃষির রূপান্তরের গুরুত্ব সাম্প্রতিক কয়েক বছরের আগে উপলব্ধি করা হয়নি এবং যাতে আর্থিক ব্যবস্থার এই অতিপ্রয়োজনীয় অংশের বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয় সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনাকালে আবশ্যক উপকরণ যোগানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নীট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪৬ ভাগ কৃষির অবদান। আর্থিক ব্যবস্থার অন্যান্য অংশগুলিতে খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করে ব'লে কৃষি বৈষয়িক অগ্রগতি রোধ করতে পারে। এই কৃষি বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাতের মুখাপেক্ষী এবং এখনো খাদ্যশস্য উৎপাদনে কেন্দ্রীভূত। বস্তুত, কৃষি উৎপাদন বেড়েছে মন্থর গতিতে এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি থেকে বার্ষিক গড় হারে যে লাভ হয়েছে তা বাতিল ক'রে দিয়েছে জনসংখ্যাস্ফীতি। কৃষি উৎপাদন যেখানে বছরে গড়ে শতকরা ২·৫ হারে বেড়েছে, ভারতের জনসমষ্টি সেখানে প্রতি বছর ২·৫ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলে জমির উপর অত্যধিক চাপ পড়েছে।

উন্নয়নমূলক নিবিড় চাষবাসের উদ্যোগ খুব সম্প্রতি ফলপ্রদ হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। ভারতের কৃষি অবশেষে আগেকার নিস্তেজ অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। উন্নত ধরনের চারা উদ্ভাবনের ব্যাপারে সাফল্য লাভ করা হয়েছে। মেক্সিকো থেকে বিপুল পরিমাণে গম আমদানী করা হয়েছিল অধিক ফলনের শস্য পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য। রাসায়নিক সার, পতঙ্গ-নাশক দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণের চাহিদা এবং ব্যবহার বেশ বেড়ে গেছে। চাষীর খেতে যে সব নিরীক্ষা-পরীক্ষা চালানো হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, হেক্টর প্রতি ৩৪ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন এবং ফসফেট প্রয়োগ ক'রে ৬৬০ কিলোগ্রাম অর্থাৎ শতকরা ৫২ ভাগ ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। জলসেচ-বহুল জমিতে একই পরিমাণ সার দিয়ে গমের ফলন শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

১৯৬৫ সনে যা প্রবর্তিত হয় কৃষি উন্নয়নের সেই নতুন কলাকৌশলের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রথমত, অধিক ফলনের শস্যের অধীন জমি বাড়িয়ে তোলা এবং সার ও পতঙ্গ-নাশক দ্রব্যের প্রয়োগ; এবং দ্বিতীয়ত, স্বল্পকালীন মেয়াদের নতুন বীজের সহযোগে বহু রকম শস্য উৎপাদন। এই উন্নয়ন-কৌশলের জন্য চাই চিরাচরিত চাষবাসের চাইতে প্রচুর পরিমাণে জল এবং বিশেষ ক'রে জলের উত্তমরূপ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে বৃদ্ধি হালে ঘটেছে তা মূলত গমের ফলন চমকপ্রদভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলেই হয়েছে। ধানের বেলা কিন্তু এরকম শস্য উদ্ভাবন করার চেষ্টা চলছে, যা অবশ্য জমির প্রকৃতি, জলহাওয়া এবং ভোক্তাদের রুচি ও পছন্দের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। কৃষি-পণ্যের মূল্য কারখানাজাত দ্রব্যের দামের তুলনায় বেশী বেড়ে যাওয়ায় চাষী উৎসাহিত হয়েছে। আগে খাদ্যসংকট এবং পরে সরকার কর্তৃক ন্যূন সংগ্রহ মূল্য বেঁধে দেওয়ার দরুণ খাদ্যশস্যমূল্য চাষীর অনুকূলে হয়েছে। সব চাইতে আশার কথা, সার প্রভৃতি দ্রব্যের বেশী ব্যবহার নয়, ভারতীয় কৃষক আজ মান্ধাতা আমলের রীতিতে কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য চাষবাস না ক'রে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত ধারায় কৃষিকর্ম সম্পন্ন করতে চাইছে।

আগের চাইতে কৃষি উৎপাদনের একটা বড়ো অনুপাত কৃষি ছাড়া আর্থিক ব্যবস্থার অন্যান্য অংশে বিক্রী করা হয়েছে। ১৯৫১-৫২ সনে উৎপন্ন কৃষিদ্রব্যের যেখানে শতকরা ৩৯ ভাগ বাজারে বিক্রী হয়েছে, ১৯৬৫-৬৬ সালে সেখানে ঐ অনুপাত ৪৪-এ দাঁড়িয়েছে। স্পষ্টত, কৃষিজাত খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি শিল্প ব্যবস্থা অংশের ক্রমিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।

দেখা যাচ্ছে, বৈষয়িক সমৃদ্ধি বহুলাংশে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য ঘটেছে এবং কৃষির ভেতর আবার উন্নতি গম এবং আরো সম্প্রতি ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে। শতকরা ৩·৮ হারে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে প্রধানত খাদ্যশস্যের বেশী ফলনের জন্য। আধুনিকীকরণ এখনো খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ আছে। তৈলবীজ, কাঁচা তুলা, ডাল প্রভৃতির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন এখন পর্যন্ত আসে নি।

আর্থিক ব্যবস্থার খনি ও ভারী শিল্প অংশ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। চতুর্থ যোজনার মধ্যকালীন মূল্যায়ন থেকে জানা যায় যে, প্রথম দু বছরে শিল্পের বিকাশ হয়েছে শতকরা ৪·১ গড় হারে। উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার না হওয়ায় ভারী শিল্প পেছিয়ে রয়েছে। ইস্পাত, রাসায়নিক সার, কলকব্জা, রেল ওয়াগন, কয়লা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিল্পে উদ্বৃত্ত উৎপাদন-ক্ষমতা আছে। যে দেশে মূলধনের যোগান কম, সেখানে এমনতর অবস্থা নিশ্চয় উদ্বেগজনক। মূলধন ব্যবহারে অপব্যয় হয়েছে—মৌল শিল্পগুলিতে নির্মিত উৎপাদন-ক্ষমতা কাজে লাগানোর ব্যাপারে মিতব্যয়িতার অভাব দেখা গেছে। অপরিবর্তিত মূল্যে নির্ণীত মূলধনের উৎপাদন অনুপাত ১৯৫০-৫১ ও ১৯৬১-৬২ সালের ভেতর ১.৯ থেকে বেড়ে ২·১ হয়েছে (তৃতীয় যোজনাকালে ঐ অনুপাত ২·৩-এ দাঁড়িয়েছে)। সেইরকম, মূলধন-শ্রম অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় শ্রমিক পিছু যথাক্রমে ৪,১৩৩; ৭,১০৫ এবং ৭,১০৩ টাকা লেগেছে।

ভারী শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার লক্ষণ দেখা গেছে। সরকারী লাইসেন্স নীতি তা বন্ধ করতে পারে নি। বৈষয়িক শক্তির কেন্দ্রীভবন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একচেটিয়া ব্যবসা রীতি নিয়ন্ত্রক আইন ও একটি বড়ো সরকারী শিল্প অংশের উপস্থিতি সহায়ক হবে আশা করা যায়। বড়ো বহরের কারখানা-শিল্প ও বাণিজ্য, বিশেষ ক'রে ভারী ও মৌল শিল্প এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সংক্রান্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থা উত্তরোত্তর গ'ড়ে ওঠা চাই। বেসরকারী অংশেরও আর্থিক ব্যবস্থায় একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে, যা পালন করা যাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার অনুযায়ী। সমাজের দিক থেকে প্রয়োজনীয় উৎপাদন সম্প্রসারণে বেসরকারী শিল্পের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হ'তে পারে। সেই রকম, কৃষি, ছোট বহরের শিল্প ও খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান থাকবে।

আভ্যন্তরীণ বাজারের আয়তন বড়ো হওয়ায়, রপ্তানী জাতীয় উৎপাদনের অস্বাভাবিক রকম কম (শতকরা ৪·৫) অংশ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপর, আমদানীর পরিবর্তে উৎপাদনে সরকার আচ্ছন্ন থাকায় রপ্তানী অবহেলিত হয়েছে। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার অনটন এসেছে এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কড়াকড়ি করতে হয়েছে। দ্বিতীয় যোজনার প্রথম দু বছর অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারত ৫০০ কোটি টাকার মতো স্টার্লিং সঞ্চয় খুইয়েছে এবং বৈদেশিক সাহায্যের জন্য তাকে বিশ্বময় প্রচণ্ড সন্ধান চালাতে হয়েছে।

টাকার মূল্যহ্রাস, দেশের ভিতরে চাহিদার অবনতি এবং সরকার কর্তৃক নানারকম উৎসাহ ও সুবিধাদানের দরুন রপ্তানী সম্প্রতি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। চিরাচরিত নয় এমন দ্রব্য, যেমন কলকব্জা, কার্পাস বস্ত্র ও চিনি উৎপাদন-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও হালকা ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী বিদেশে পাঠানো শুরু করা গেছে। রপ্তানী সম্প্রসারণ ঘটেছে চা, পাট ও কার্পাস বস্ত্রের মতো বাঁধিবদ্ধ ক্ষেত্রে নয়: কৃষিজাত দ্রব্যের বদলে কারখানা-নির্মিত সামগ্রী

বিদেশে বিক্রী করার ফলে রপ্তানীর বৈচিত্র্যকরণ সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক রপ্তানী দ্রব্যের উপর ভারতের নির্ভরশীলতা এখনো প্রচুর, বিশেষত পাট, চা ও বোনা কাপড় যখন মোট রপ্তানীর শতকরা ৩৫ ভাগ। লোহা, ইস্পাত ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানী বাড়া সত্ত্বেও, ঐগুলি এখনো মোট রপ্তানীর শতকরা ১০ ভাগেরও কম। প্রকৃতপক্ষে ভারত আজো প্রাথমিক দ্রব্য রপ্তানীর মুখাপেক্ষী, সুতরাং বিশ্বের বাজারে ঐ সব সামগ্রীর জন্য চাহিদা এবং দেশের অভ্যন্তরে কৃষি উৎপাদনের অবস্থার সঙ্গে দুর্বলভাবে সম্পর্কযুক্ত। সন্দেহ নেই, রপ্তানী বৃদ্ধি নির্ভর করে তুলনামূলক ব্যয় অনুযায়ী স্বদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা-শক্তির উপর।

বস্তুত, বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে সম্প্রতি যে উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা আমদানী-সংকোচনের দরুন সম্ভব হয়েছে। স্পষ্টত, খাদ্যশস্য, কৃষিজাত কাঁচা মাল, মূলত কাঁচা পাট, কাঁচা তুলা ও বনজ তৈলের আভ্যন্তরীণ যোগানে উন্নতি হওয়ায়, ঐ সব সামগ্রীর আমদানী কমে গেছে। বর্তমানে প্রধান আমদানীর ভেতর ২০০ কোটি টাকার মতো ইস্পাত, প্রায় ১৩৫ কোটি টাকার রাসায়নিক সার এবং ২০০ কোটি টাকার কাছাকাছি অশোধিত ও পেট্রোলিয়ম দ্রব্য উল্লেখ-যোগ্য। তা ছাড়া, যন্ত্রপাতি ও পরিবহণ-সংক্রান্ত সরঞ্জাম, লোহা ও ইস্পাত, লোহা ছাড়া অন্যান্য ধাতু এবং রাসায়নিক দ্রব্য বাইরে থেকে আনা কমে গেছে, যা অংশত আমদানীর পরিবর্ত উৎপাদনে অগ্রগতি সূচনা করে। অন্য দিকে, রাসায়নিক সার ও খনিজ তৈলের আমদানী বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয় যোজনা শেষ হবার মুখে স্বভাবত প্রশ্ন উঠলো উদ্যোগ-কৌশলের কোনো মৌল পরিবর্তন দরকার, অথবা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রবর্তিত নীতি আরো অনুসরণ করা হবে কিনা। তখন স্বাবলম্বনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হ'ল এবং পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কৌশলে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য রূপ নিল- পরিমিত সময়ের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর অত্যধিক নির্ভর ক'রে কালক্রমে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার চেষ্টা। যথেষ্ট ও অব্যাহত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার অনুমান বা প্রত্যাশা অবশ্য বেশী দিন টেকে নি। বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিতে যে বৈদেশিক সাহায্য এখন আশা করা হয় তা খুব সীমিত। উদ্যোগনীতির উপর এটা একটা নতুন নিষেধাজ্ঞা, যা আগে স্পষ্ট ভাবা হয় নি।

আর্থিক উদ্যোগের শুরুতে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ৫·৫ ভাগ মূলধন খাটানো হয়েছে; এবং তা পুরোপুরি আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে সম্ভব হয়। চতুর্থ যোজনার মধ্যকালীন মূল্যায়ন অনুসারে, আর্থিক ব্যবস্থায় মূলধন নিয়োগ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে শতকরা ১৪ ভাগ থেকে বর্তমানে শতকরা ১১ ভাগে কমে এসেছে; আংশিক ভাবে সরকারী সঞ্চয় ও বৈদেশিক সঞ্চয় হ্রাস তার জন্য দায়ী। জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত হিসাবে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ১৯৬৫-৬৬ সনে শতকরা ১১·১ থেকে ১৯৭০-৭১ সালে শতকরা ৮·৬ ভাগে নেমে গেছে। সরকারী অংশে সঞ্চয়ের অবনতি লক্ষ্য করবার মতো। সম্প্রতি দেশের ভিতরে সঞ্চয়ের সামান্য উন্নতি ঘটেছে। ১৯৭১-৭২ সালে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধন নিয়োগ জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১০·০ ও ১১·৫ ভাগ হয়েছে।

বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ যেহেতু ক্রমশ কমে এসেছে, আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অনটন দূর করার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক সঞ্চয়কে আর বিকল্প হিসাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ১৯৬০-৬১ সনে মূলধন নিয়োগ ছিল জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১২·০ ভাগ; তার ৮·৯ ভাগ এসেছে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে এবং ৩·১ ভাগ সংগৃহীত হয়েছে বৈদেশিক সঞ্চয় হ'তে। ১৯৭০-৭১ সালে শতকরা ৯·৬ ভাগ মূলধন খাটানো হয়েছে কিন্তু দেশের

ভিতরের সঞ্চয় ও বৈদেশিক মূলধন যোগান দেয় তার যথাক্রমে ৮·৩ ও ১·৩ ভাগ।

১৯৬৭-৬৮ সালে বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ ৮৬৩ কোটি টাকা থেকে কমে ১৯৭১-৭২ সনে ৩২৮ কোটি টাকায় নেমেছে। বৈদেশিক সাহায্য উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে, এখন তা জাতীয় আয়ের শতকরা ১ ভাগেরও কম। আশা করা হচ্ছে যে, পঞ্চম যোজনার শেষ বছরে অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯ সনে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ শূন্যে পেঁছিবে। কিন্তু ঐ সময়ের ভেতর বৈদেশিক সাহায্য পরিহার করতে হ'লে স্পষ্টত পঞ্চম পরিকল্পনাকালে মোটা হিসাবে বেশ কিছু বৈদেশিক মূলধন লাগবে। ইস্পাত, রাসায়নিক সার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি যথাসময়ে সম্পূর্ণ করবার জন্য কয়েক বছর ধ'রে অগ্রিম (প্রকল্পের সংগে যুক্ত) সাহায্য চাই। প্রসংগত, সেপ্টেম্বর ১৯৭২ পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮,৪৭৬ কোটি টাকা, যার ভেতর চতুর্থ যোজনাকালে দেয় সুদের দরুন লাগবে ২,৩১৭ কোটি টাকা। ১৯৭২ সালের ৩১ সেপ্টেম্বরে বৈদেশিক মুদ্রার মোট সঞ্চয় ছিল ৭৯৮·৫ কোটি টাকা।

প্রকৃত প্রস্তাবে, তিন বছরব্যাপী পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজকর্ম স্থগিত রাখা হ'ল। চতুর্থ পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ নির্ধারণে তিন বছর দেরী হ'য়ে যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ যোজনার মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এযাবৎ চাহিদা বৃদ্ধির আগেভাগেই ভারী শিল্পের যাতে সম্প্রসারণ হয় সেই উদ্দেশ্যে ভোগের নিয়ন্ত্রণ অনুমোদন করা হ'ত। এখন ভারী শিল্পের সংগে ভারসাম্য রেখে ভোগপণ্য শিল্পের বিকাশের উপর জোর দেওয়া হ'ল।

ইদানীং উন্নয়ন পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও প্রকৃত জাতীয় আয় বার্ষিক শতকরা ৫·৫ হারে বাড়িয়ে তোলা মনে হয় সম্ভব। কিন্তু তা বাস্তবে অনুদিত করতে হ'লে অন্তত তিনটি প্রধান সমস্যার জরুরী সমাধান প্রয়োজন: (১) জনসংখ্যার বিস্ফোরণ; (২) অর্থসংগতির সংকট, বিশেষত বৈদেশিক মুদ্রার অনটন; এবং (৩) বৈষয়িক অগ্রগতি যাতে গ্রাম ও শহর অঞ্চলে সমাজের অনুন্নতদের জীবনযাত্রা উন্নীত করতে পারে তা দেখা। জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে ভারতের দারিদ্র্য দূর করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। বস্তুত, জাতীয় আয়ের যৎসামান্য যা বৃদ্ধি ঘটেছে তা জনসংখ্যাস্ফীতি দ্বারা সম্পূর্ণ নিঃশোষিত হয়েছে। ভারতের জনসংখ্যা এখন ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ; ১৯৬১-৭১ দশকে জনসংখ্যা শতকরা ২৪·৬৬ ভাগ হারে বেড়েছে। মাথাপিছু প্রকৃত আয় বার্ষিক শতকরা ১ হারে বাড়লে ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষার সংগে তাল রাখা যাবে না। টাকাকড়ি-সংক্রান্ত সংকট আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দু রকমেরই এবং তা মূলধন নিয়োগকে সীমাবদ্ধ রাখবে। মূলধন খাটানোর ব্যাপারে হের-ফেরেরও বিশেষ অবকাশ নেই। দেশের ভিতরে মূলধন নিয়োগের যে উর্ধ্বসীমা আছে তা শ্রম-নির্ভর নির্মাণকার্যের বিপুল প্রসার ব্যাহত করবে।

সাধারণ পটভূমি ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তনের সংগে সংগে উৎপাদন ও বণ্টন, উন্নয়ন ও কর্ম-সংস্থানের মধ্যকার পরস্পর-বিরোধী দাবীগুলি প্রকট হয়েছে। রাষ্ট্র কর্তৃক সরাসরি হস্তক্ষেপের অভাবে আর্থিক উন্নয়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মুষ্টিমেয়র হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হল। নগরকেন্দ্রগুলির অস্বাভাবিক প্রসার, শহর অঞ্চলে প্রকাশ্য কর্মহীনতা ও পল্লী অংশে প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যা প্রয়োজন সেটা মোট উৎপাদন থেকে বাদ দিলে গড়ে মাথাপিছু সমৃদ্ধি ঘটেছে বার্ষিক শতকরা ১ হারে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি কেবল গড় আয় বাড়ার সূচক, কিন্তু ইতিমধ্যে যদি আয় বণ্টনে অসাম্য বেড়ে থাকে তাহ'লে ঐ বৃদ্ধি মুষ্টিমেয়র ভোগে

আসবে এবং বৃহত্তর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কোনো লক্ষণ দেখা না যেতে পারে। আয় ও সম্পদের বণ্টনে সমতার অভাব কমিয়ে আনার প্রধান দুটি উপায় হচ্ছে: প্রগতিশীল হারে কর বসানো এবং সরকারী ব্যবস্থার প্রসার। কর থেকে রাজস্ব এবং জাতীয় আয়ের মধ্যকার অনুপাত যেখানে ১৯৫০-৫১ সনে শতকরা ৬·৬ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে শতকরা ১৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে, সরকারী অংশ সেখানে দেশের পুনরুৎপাদনক্ষম বাস্তব ধনের (১৯৫০-৫১ সালে) শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৬৫-৬৬ সনে শতকরা ৩৫ ভাগ হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৫-৬৬ সনে (চলতি মূল্যে) মোট সম্পদ হচ্ছে ১,০৪,৪৯৮ কোটি টাকা। জমি, স্থায়ী মূলধন, গৃহস্থালি দ্রব্য ও মজুত উপকরণ ও সামগ্রী ঐ ধনের মধ্যে ধরা হয়েছে। দেখা গেছে, ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ সনে অধিগম্য ধন শতকরা৫৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্ণীত ঐ অংক থেকে জমির মূল্য বাদ দিয়ে মোট উৎপাদনক্ষম বাস্তব ধন হিসাব করা হয়েছে—১৯৬৬-৬৭ সালের তুলনায় তা শতকরা ৫৭ ভাগ বেড়ে ১৯৬৫-৬৬ সনে ৭৩,১২০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, কর থেকে সংগৃহীত মোট রাজস্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অংশ যেখানে ১৯৫০-৫১ সালে শতকরা ৪৯·৯ থেকে কমে ১৯৬৫-৬৬ সালে ২৭·৬ হয়েছে, পরোক্ষ কর সেখানে শতকরা ৫০·১ থেকে বেড়ে ৭২·৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসাবে পরোক্ষ কর থেকে রাজস্ব যেখানে ১৯৫০-৫১ সালে শতকরা ৪·২ থেকে বেড়ে ১৯৭০-৭১ সালে শতকরা ১১ ভাগ হয়েছে, প্রত্যক্ষ করের অনুরূপ অনুপাত একই সময়ের ভেতর সেখানে শতকরা ২·৪ থেকে শতকরা মাত্র ৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

অসাম্যের প্রকৃত উৎস হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানা ব্যাপারে বিরাট পার্থক্য। আয়ের বৈষম্যকে উৎপাদন-ক্ষমতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করতে হ'লে গ্রামদেশ, শহর অঞ্চল ও কারখানা-শিল্পে সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ ও সংক্ষেপীকরণ দরকার। ভূমি-সংস্কার, বিশেষ ক'রে জমির ঊর্ধ্বসীমা নিরূপণ ও জমিদারির বিলোপ সাধনে যতটা আশা করা হয়েছিল ততটা পূরণ হয় নি। যাতে দুটি শস্য ফলানো যায় জলসেচসমন্বিত এরকম জমির বেলা ১৮ একরের ঊর্ধ্বসীমা প্রস্তাবিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ জমি মোট জমির সামান্য একটা অংশ ব'লে কার্যকরী সীমা ২৭ একরে নির্দিষ্ট করতে হবে—একটা ফসল উৎপাদন করতে পারে এমন জলসেচবহুল জমির প্রতি সেটা প্রযোজ্য হবে। ভূমি-সংস্কার মূলত জমির পুনর্বণ্টন ও মূলধননির্ভর চাষবাসকে শ্রমনির্ভর পরিবার-কেন্দ্রিক কৃষিকর্মে রূপান্তরিত করবে।

যাতে শহর অঞ্চলের লোকের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রভেদ কমে আসে সেই উদ্দেশ্যে সেখানে ঐরকম ব্যবস্থা এযাবৎ নেওয়া হয় নি। উপরন্তু, প্রত্যক্ষ কর তদন্ত কমিটির হিসাব অনুসারে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় প্রতি বছর ১৪০০ কোটি কালো টাকা চালু থাকে। কমিটির মতে, রপ্তানীর সাফল্য থেকে আমদানীর অধিকার লাভের যে ব্যবস্থা আছে তা কালো টাকা সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী। অবিভক্ত হিন্দু পরিবার থাকার ফলে ব্যাপকভাবে কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কৃষি, ফলের বাগান, গব্যশালা ও কুক্কুটাদি পালনে বড়ো বহরে কালো টাকা খাটিয়ে প্রতারণা করা হয়।

সম্প্রতি বৈষয়িক নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার চেষ্টা হয়েছে—জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকে কর্মসংস্থানের বিস্তারণ এবং সমাজের দরিদ্রতমদের ন্যূন দ্রব্যসামগ্রী যোগানের সঙ্গে সমান ভিত্তিতে বিচার করার কথা উঠেছে। বৈষয়িক অগ্রগতির বার্ষিক হার যাতে শতকরা ৫ হারে পৌঁছয় ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশ সেদিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে

কিন্তু দারিদ্র্য দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে। শিল্পোন্নয়ন সত্ত্বেও বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তাই জাতীয় উৎপাদনের উপযুক্ত গঠন এবং যা উৎপন্ন হ'ল তার বণ্টনের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখন কেবল বেশী উৎপাদন নয়, (কতিপয়ের ভোগের জন্য নয়) জনগণের ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে। উৎপাদনের ঝোঁকটা বদলে দিতে হবে যাতে দেশের অভ্যন্তরে অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যরক্ষার মতো ন্যূন প্রয়োজনগুলি মেটানো যায়।

এই দায়িত্ব একবার স্বীকার করলে শিল্পোন্নয়ন-সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন আসতে বাধ্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে, খাদ্য সংস্থানের তাৎপর্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করা, যার জন্য চাই রাসায়নিক সার, পতঙ্গনাশক দ্রব্য প্রভৃতি তৈরী করার কারখানা।

দারিদ্র্য অপসারণ করতে হ'লে, প্রথম কাজ হবে আংশিক ও পুরো সময়ের বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। যে আর্থিক ব্যবস্থায় কর্মহীনদের সংখ্যা বিপুল, সেখানে কর্মসংস্থান বেড়ে গেলে আয়ের পুনর্বণ্টন করতে হবে। জনসমষ্টির দরিদ্রতম অংশকে মোট উৎপাদনের একটা বৃহত্তর অংশ দেবার বস্তুত এটাই হচ্ছে কার্যকর উপায়।

নতুন কাজের যোগানের বেশির ভাগ করতে হবে পল্লী অঞ্চলে। একবার খাদ্য সরবরাহের সুরাহা হ'লে গ্রামের বেকারদের কাজের সুযোগ করা হবে সংগঠনের ব্যাপার। অবিলম্বে যারা ন্যূন মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের সরাসরি জমির উন্নয়ন, জলসেচ, রাস্তা তৈরি, বনে পরিণত করা প্রভৃতি প্রকল্পে নিযুক্ত করা যাবে। এর ফলে উন্নত জমি ও জলসরবরাহ-সংক্রান্ত সামাজিক সম্পদ নির্মাণ সম্ভবপর হবে, যা যথাসময়ে আর্থিক ব্যবস্থার উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে।

এভাবে ন্যূন প্রয়োজন পূরণ এবং কর্মসংস্থান যুগপৎ বাস্তবে রূপায়িত করা যেতে পারে। সেজন্য জনসাধারণের আবশ্যিক দ্রব্য উৎপাদনের শিল্পে বড়ো রকমের মূলধন নিয়োগ চাই। ইস্পাত, রাসায়নিক সার, পেট্রোলিয়ম শোধন, যন্ত্রপাতি তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে মূলধন খাটানোর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের দরকার লাগে এমন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়। প্রকল্প ও উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচনে আমাদের এমন কার্যক্রম নিতে হবে যা আরো কাজের যোগান এবং অপেক্ষাকৃত সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবে। ন্যূন প্রয়োজন পরিকল্পনা জনগণের কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তুলবে আশা করা যায়—এবং সেই অনুপাতে যোজনাকে কার্যে পরিণত করা যাবে।

উদ্যোগনীতির আরেকটি দিক হচ্ছে, বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য মুদ্রাস্ফীতি যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় তা লক্ষ্য রাখা। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার (বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু আগমন ও ১৯৭১ ডিসেম্বরের যুদ্ধ) ফলে টাকার যোগান উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ কতটা স্থিতিস্থাপক তা বুঝে ব্যাংক থেকে কর্জ নিয়ে ঘাটতি পূরণ করা উচিত। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগের বেশী হারে বেড়ে চলেছে। সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কাঁচা-মালের অনটন, পরিবহণের অভাব, বিদ্যুৎ ইত্যাদি শক্তি যোগানের অপ্রতুলতা সংকটের সৃষ্টি করছে।

মজুরী, দ্রব্যমূল্য ও আয়ের মধ্যে একটা সংগত ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। উদ্বৃত্ত চাহিদার উৎপত্তি যাতে না হয় এবং শ্রমিকদের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের উৎপাদন যেন বাড়ে সেদিকে চেষ্টা করতে হবে। কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত যাতে আধ ডজন আবশ্যিক দ্রব্য

অপরিবর্তিত মূল্যে শ্রমিক ও জনসাধারণ পেতে পারে। যারা সম্পত্তি ও উদ্যম থেকে উপার্জন করে তাদের যেমন নিয়মানুবর্তিতা পালন করা চাই, সেই রকম, উৎপাদন-ক্ষমতা না বাড়লে যেন মজুরী বৃদ্ধি পরিহার করা হয়। কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব, বাজার থেকে সরকারী ঋণগ্রহণ এবং সরকারী সংস্থাগুলিতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য যথাসম্ভব প্রয়াস বাঞ্ছনীয়। এভাবে দেশের বৈষয়িক নীতি আপেক্ষিক স্থিতি বজায় রেখে উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে, সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষার সহায়ক হবে।

সত্যের দাপটে

আল মাহমুদ

আমাদের এ সংসার সত্য হয়ে ওঠে কি কখনো?
তবু কেন সত্য সত্য বলা?
সত্যের দাপটে যেন না ভাঙে এ-ঘরের দেয়াল।

খাটের বিছানা জুড়ে ঘুমিয়েছে যে গরিমা, তাঁর
দ্যাখো চেয়ে বুক দুলছে, নিঃশ্বাসে কাঁপছে দুটি বুক
বাহুতে জমেছে ঘাম। কাতানের ওপরে বাতাস
আস্তে উড়িয়েছে পাড়। ঊরুর প্রান্তরে
একটি তিলের শোভা অনাবৃত হয়েছে দৈবাৎ।
তাকে কি জাগাতে চাও মহত্তম সত্য সংবাদে?
তাহলে জাগিয়ে দ্যাখো, উঠবে সে চোখে নদী নিয়ে
সত্যের বিদ্যুতে তার ঝলসে যাবে ঘরের পাঁচিল।
একটিমাত্র শিশুর কান্নায়
ছিঁড়ে যাবে টেলিফোন, পাখার ঘূর্ণন
অকস্মাৎ বেড়ে গিয়ে উল্টে দেবে লতাকুঞ্জময়
বুদ্ধের মস্তকসহ ধাতুর পাখিটি।
আর পাড়ার লোকেরা
প্রতিবেশী গৃহস্থের ঘরে অকস্মাৎ
সত্যের সৌন্দর্য দেখে
দমকল, দমকল বলে ছুটবে রাস্তায়।

তেত্রিশ বছর পরে

দিব্যেন্দু পালিত

যতিচিহ্ন হয়তো সকলেরই
ভালো লাগে।
আমারও তা লেগেছিল ভালো
সেই সন ঊনোচল্লিশে।

তেত্রিশ বছর পরে আজ
মনে হয় ইক্ষ্বাকু সমাজ
এখনো অলব্ধ হয়ে আছে—
ক্লেদে তৃণে শিথিল বিশ্বাসে।

আজও দরকার একবার
ক্লোমে মিশমিশে অন্ধকার,
চোখেমুখে শাখার প্রবাহ
যতিচিহ্ন শুরুতে ও শেষে।

মনস্তাপ

জাহিদ হায়দার

সখা. আর কোরো না নান্দীপাঠ,
দেখো, কান্তিমান যায় অসুখের মোহন মালা পরে।
উষ্ণ সূর্য পরেছে মেঘের মাফলার,
গলে পড়া আলোয় মেতেছে অরণ্যের সবুজ চিত্রমালা।

চেতনায় কি অসুখ তোমার?
অলংকারের চন্দন ফসল তুলবো বলে
গড়েছি অমল সোপান,
কার্নিশে নামহীন গাছ,
তার শেকড় নেমেছে ধ্যানের সিঁড়ি বেয়ে।

আবার বিজয়ে আচ্ছন্ন হবে হেমন্ত,
আচ্ছন্ন হবো আমি,
—অথচ কমে যাবে স্পৃহার স্বাপ্নিল আয়তন।
তারপর,
স্বগত তৃষ্ণায় স্রোত চলে যাবে
তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

রশ্মিপাত ঠেলে সকরুণ বিস্ময়ে দাঁড়ায় ছায়া,
আমি অপেক্ষমান অন্তর্গত ঋতুর আকর্ষণে,
রেখেছি খুলে নাতিদীর্ঘ সবুজ সড়ক।
অকস্মাৎ জানালা হাওয়ায় খুলে যায়,
যেন ঘুম থেকে উঠে এলো,
সন্ধ্যার গভীরে গোপন দেশে
ঝরে পড়ে উজ্জ্বল চাবি।

এলে তুমি কোন্ দ্রাঘিমা থেকে?
নির্মম যন্ত্রণা ঝরায় পেন্ডুলাম,
চিন্তায় নত মহানগরী আজ,
সন্ধানীতারা কম্পিত বিহ্বল,
দেখো অসুখের বীজ ছড়ানো চারদিকে।

ভীড় ও সে

দেবী রায়

ভীড়—ভীড়· গিজগিজে এতো ভীড় কেন চারিদিকে
আর কেন এতো গোলমাল
ছড়িয়ে—ছিটিয়ে উৎসুক আগন্তুক, খুউব সকাল
থেকেই চীৎকার, ওরা কি চায়
রাত্তিরে-ই বা কোথায় হাওয়া হয়ে যায়—
এসব এড়াতে চেয়ে সটান সে নেমে যায়
সবুজ মাঠের গভীর—গভীরতম অত্যন্ত প্রদেশে
এখানে-ই কী সে নিঃসঙ্গ একাকী
ফাঁকি, প্রকৃতপক্ষে সবি ফাঁকি
না, তারো সঙ্গ দিতে চায় সে অর্থাৎ দ্বৈতসত্তা!
আর বিপুল সম্ভার নিয়ে আসে হাওয়ার চীৎকার
আন্দোলিত মাথাও অবশেষে নুইয়ে ফেলে—
স্বস্তির নিঃশ্বাস
ক্রমক্ষয়িষ্ণু সবুজ—সবুজ অর্থাৎ ঘাস
আকাশ—তার চোখ ঠেকে আকাশে বিদ্যুৎ জ্বলে যায়
যেন মাতালে হল্লাচিল্লা মেঘে মেঘে এমনি সংঘাত
ক্রমে ক্রমে বাড়ে রাতের গভীরে আরো সুপক্ক গাঢ় রাত
রক্তে বয়ে যায় শিহরণ হিল্লোল
কে একা এই বিপুল অন্ধকারে
অবশেষে নামে বৃষ্টি যেন মৃদঙ্গের বোল

বৃষ্টির সঘন আলিঙ্গন এড়াতে চায়
ধড়ে-মাথা নিয়ে সে ছুটে যাচ্ছে ঐ দ্যাখো
ভীড়ের-ই পাশে সে আরেক ভীড় করে দাঁড়ায়

আর যতোদূর সম্ভব, যেভাবে পারে, সে তার—
মাথা বাঁচায়!!

দাহ

অরূপ তালুকদার

তবে কি চলেই যাবো
দাঁড়াবে না একটুও অতিচেনা পুরনো চাতালে
নির্বিকার ঘুরিয়ে নেবো মুখ, চোখের দৃষ্টি
যেন অচেনা পথিক এক
পথভুলে পুনর্বার ফিরে যাবো নির্ভুল গন্তব্যে?
পেছনে পড়ে থাকবে মলিন চরণরেখা, দৃষ্টির ওপারে
ঘাসের বিস্তার লতাপাতা পাখি ফুলের কেয়ারী
নির্জন জলের রেখা
সুনীল কল্লোল
পড়ে থাকবে স্মৃতিময় স্পন্দিত হৃদয় বিফল স্বপ্নের মতো...

সব ছেড়ে চলে যাবো তর্জনীতে ধরে নিয়ে দুটি হরিণী নয়ন
বর্ণিল রাতের কথামালা তুলে রেখে সুনীল চিঠির মতোন
সযতনে বুকের নিভৃত খামে
এ যেন বারবার সেই ভুলে যাওয়া
কৈশোরিক হঠকারী প্রেম, অস্ফুট আশ্বাসের বাণী কিংবা কোন
ভাড়াটে মেয়ের নিত্য নতুন দুরন্ত সংরাগ, বুকের নীচে
কামার্ত দোলা নগ্ন গ্রীবা বাহু সুঠাম ঊরুর নিবিড় চুম্বন...

এই সবকিছু নির্বিকার ভুলে গিয়ে তবে কি চলেই যাবো আজ
আসবো না ফিরে আর কোনদিন, কখনো বলব না আর
ঘরে ফিরে এসে, সবকিছু ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ!

ঘর

রবীন সুর

ঘরে কেউ থাকুক বা না থাকুক
জীর্ণতা মেরামত করার সময় এসেছে
ঘুলঘুলির ফাঁকফোকরে চামচিকে বাদুড়ের দিনের আস্তানা
পাখিরা আসে না
রাতে কালো ডানার দুঃস্বপ্নের ঝট্‌পটানি
মেজাজ ও মগজের খাঁজে খাঁজে
ভৌতিক বাতাসে পেঁচার ভয়ংকর আর্তনাদ থেকে থেকে বাজে
ভাঙা পলেস্তারার ফাঁকে ফাঁকে
নোনাধরা ইঁটের খয়াটে শরীর সময়ের ধুলো ধোঁয়ায়
আপাত আচ্ছন্ন এই ঘরের পরিত্যক্ত শূন্যতায়
কেউ থাকুক বা না থাকুক
জীর্ণতা মেরামত করার সময় এসেছে
কড়ি বরগার ফাটলে ফাটলে
ছাদ ভেঙে পড়ো পড়ো অবস্থার সমাপ্তি দরকার
কোনো ঘরই চিরকালের জন্য নতুন থাকে না
ঘর ভাঙতে শুরু হলে
ছাদ মেঝে দুর্মুশ পিটিয়ে ভাঙা দেওয়ালের নতুন পলেস্তারায়
কলি ফিরিয়ে নতুন ঘরের নির্মাণের সময় এসেছে।

জন্ম এবং জীবন মানে অজ্ঞাতবাস

অমিতাভ দাস

জন্ম মানে অহর্নিশি নফর সেজে রাত জাগরণ
চুক্তিপত্রে সই করে ত হাটের গরু বিকিয়ে যাওয়া
অষ্টপ্রহর গাধার বোঝা বইতে হবে কাঁটায় হেঁটে
রোদ্দুরে পথ বৃষ্টিতে পথ ছুটতে হবে কামাই ত নেই
প্রতিবাদের পথ রাখোনি প্রতিশ্রুত মুখবন্ধ
অহল্যা-রাত পোহাবে না
তেলামাথায় তেল মাখান ঘুমপাড়ানী গণতন্ত্র
অন্ধকারে বুক পেতেছো ভেবেছো এই দীনদয়াল
উত্তরণের পথ দেখাবে
কালো ঘোড়ার পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যায় গার্হস্থ্যপাঠ
চীৎকারে হীনপ্রভুত্বকে নাড়া দেওয়ার সাহস কোথায়?
মাথার বালিশ চোরাচালান নষ্ট পায়ে সাজিয়ে আছো
ভরদুপুরে ভর করেছে ভুতনাগরের চতুরালি
সিংহাসনে গোলাম হোসেন সেলাম কুড়োন
চোখপাকানো সন্ত্রাসে সব ভাসিয়ে দিলাম বৈধ শিশু
দাবিদাওয়ার লালপতাকা কোন্ নরকে হারিয়ে এলাম?
মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না...
তবুও তোমার পান থেকে চুন খসলে সোজা বধ্যভূমি
জীবনটাকে কাঁচের চুড়ির মতোন ভেঙে আদেশ পালন
দুঃখকে সব নিরস্ত্রতায় হাল্কা করে লালন ফকির

সব হারানোর শ্মশানচিতায় মাছের মতোন শীতল চোখে
চৈত্রবেলার নদীর দিকে থাকবে চেয়ে নিঃস্ব উজান
পর্দা কি আর কাঁপবে কারো করুণ হাওয়ায়? কালমৃগয়া
দুঃখ কি কেউ মুছিয়ে দেবে? কোন্ মহাজন! কৃষ্ণসখা!

জন্ম মানে নেড়ি কুকুর. আজন্ম বুট্ মাথায় রাখার
জীবন মানে বাহক সেজে নিজেরই শব বহন করার
জন্ম এবং জীবনটা এক অজ্ঞাতবাস জতুগৃহ

প্রব্রজ্যা

মানসী দাশগুপ্ত

পাটুলির গঙ্গার ঘাটের দিকটা যতদূর সম্ভব ছেড়ে সে বসেছিল, মাথা সম্পূর্ণ মুড়োনো, কপালে তিলক, রোদ লেগে রেঙে যাওয়া দেহ কটি পর্যন্ত অনাবৃত, গলায় তুলসীমালা, হাতে জপ চলছে মালায়, কোরা থান তার কটিবাস, আঘাটায় বসে বসে সেটি ধূলিধূসর হয়ে উঠেছে. কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে, মন রয়েছে তার জপের মালায়—নাকি গঙ্গার দিকে? সঙ্গিনী তার কাছ থেকে খানিকটা দূরত্ব রক্ষা করে বসেছে. ছোট ছাঁটা চুলে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিকে সে তার তুল্য বিশ্বাসের অংশীদার এ কথা বোঝা যায়, এ-ও বোঝা যায় যে সে আর তার সঙ্গিনী একদেশের দেশোয়াল নয়। তাতে কি. বিশ্বাসের মিল কি অনেক বড় মিল নয়—দেশ, বর্ণ, জাতিকুলের চেয়ে?

সঙ্গিনী বললে—আজ তুমি বলবে, বলবে তো?

সে মালাজপা থামাল না, চোখও ফেরাল না এ কথায়।

খানিকক্ষণ চুপ করে কেটে গেল এমনি, তারপর সে অস্ফুটে জপের মন্ত্র শ্বাসে এনে মালা তুলে কপালে ঠেকাল, মুখ ফেরালো সঙ্গিনীর দিকে, বললো—নাও, এবার পড়া ধরো।

—পড়া তো ধরব না আর, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ, শুধু গুরুদক্ষিণা দিতে চাইছ না বলে বুকে বল পাচ্ছ না নিজের বিদ্যা নিজে পরখ করে নেবার।

সে যেন যথার্থ বিশ্বাস করল এ কথা, মাথা হেঁট হলো তার পলকের জন্য, তারপর বললো,—ভেবেছিলাম আগে তাঁর কাছে অনুমতি নেব, সংসারাশ্রমের কথা বলব, কানে শুনব ফের, এতে যদি তাঁর রোষ হয়?

সঙ্গিনী বললো,—তিনি আছেন তোমার মনের মধ্যে, মন শুদ্ধ থাকলে কিছুতে কিছু হয় না, বলেন নি তিনি এ কথা তোমায়?

—তুমি কেমন করে জানলে? তুমি তো দেখনি প্রভুপাদকে?

সঙ্গিনী বললো,—'অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী—' —বললো সুরে গেয়ে। সে আবার তার নিজের কপালে দুহাত ঠেকিয়ে প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করল। বললো,—তোমার সঙ্গে তর্ক করব না, তুমিই তো এখন পথ দেখাচ্ছ আমায়, এ সুর এ রস আমি কোথায় পেতাম তুমি কৃপা না করলে, আমার গুরুদেবই তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন গুরু করে। দক্ষিণা তোমায় দেব, কিন্তু এ দক্ষিণায় কী হবে তোমার সে কেবল তুমি জান।—বলে সে খানিক থামল। তারপর সুরু হলো তার কথা ফের নিজের ভাষায়, সঙ্গিনী বললো,—বাংলায় বল, বলতে বলতে জোর পাবে, নিজের কানে শুনবে নিজের নতুন ভাষায় পুরোনো জীবন, বল, বল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সে তাকাল সঙ্গিনীর দিকে, তারপরে ফের বলতে লাগল,—তখন আমি মস্ত রোজগারী। ফ্রিস্কোতে দারুণ সুন্দর বাড়ি আমার, রূপসী বউ, ছোট দুটি বাচ্চা আমায় দেখতে পেলেই খুশিতে অস্থির হয়ে যায়, দেখতে পায় না বেশি, ঘুরে ঘুরে বেড়ানর কাজ তো, ব্যবসার টান বাড়ির চেয়ে বেশি, নইলে বাড়ি রাখব কিসের জোরে? কোথায় না যাই—ইয়োরোপের সর্বত্র, দক্ষিণ থেকে উত্তর আমেরিকা, তিন বছরে যে কটা রাত্রি বাড়িতে ঘুমিয়েছি, আকাশে চলতে চলতে তার চেয়ে ঢের বেশি রাত কাটিয়েছি, না, পাইলট নই, আমি ছিলাম

বিখ্যাত এক বিমানব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত, নামটা না বলা থাক? ন্যান্সির ভাল লাগত না নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি যে অত অল্প বয়সে বড় কাজ পেয়েছি এ তো কম কথা নয়, তাই আমি এই বিচ্ছেদ নিয়ে খেদ করে কিছু ব্যবস্থা করতে চাইলে ও হেসে উড়িয়ে দিত সে সব। ওকে নিয়ে আমি ভয় পাই নাকি—এরকম রঙ্গ রহস্যও করত কখনো কখনো। ভাবা মূর্খতা জেনেও আমার ভাবতে ভাল লাগত যে বিরহরাত্রিতে ও কেবল আমার কথা ভেবেই নিশিযাপন করত, আর কাউকে ভেবে নয়, আর কাউকে নিয়ে তো নয়ই। না, তুমি যা ভাবছ তা নয়—আমার এ বিশ্বাসে চিড় ধরল বলে আমি সংসার ছেড়ে শান্তির খোঁজে এসেছি তা নয়, ন্যান্সির তুলনা হয় না, তার বিশ্বস্ততা অসাধারণ। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল খুব মজার একটা ব্যাপার নিয়ে। সেটা এপ্রিল মাস, আমি যাচ্ছি জরুরি এক কনফারেন্সে নিউ ইয়র্ক—পথে ঘুরে যেতে হয়েছে মিশিগান আর ডেট্রয়েট, সঙ্গে দলের অন্য কেউ কেউ ছিল, তারা হুড়োহুড়ি করে চলে গেল নিউইয়র্কে একদিন আগে—সেবারের সেই বিখ্যাত বিশ্বমিলনমেলা দেখবে বলে, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ ওয়র্ল্ড ফেয়ার এই আনফেয়ার ওয়র্লডে সেবার খুব লোক টানছে। আমাকে ওরা সঙ্গে নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছিল, কিন্তু আমি তখন আরো উন্নতি করব বলে বদ্ধপরিকর—একটা সাক্ষাৎকার আমাকে সারতেই হবে ডেট্রয়েটে, গোপন জরুরি ব্যাপার, সহকর্মীদের কাছেও লুকিয়েছি সে কথা, 'শরীর ভাল নেই, মেলা কনফারেন্স হয়ে গেলে দেখব, কী আর করা' বলে ওদের এড়ালাম। না এড়ালেই হতো, কিংবা হয়তো এই ভাল হয়েছে। হ্যাঁ, এই ভাল হয়েছে। দেখাশোনার কাজ আমার হয়ে গেল বিকেলের ভিতরেই, ভোরে উড়ে যাব—কেমন করে যে দেরি হয়ে গেল আমার এয়ারপোর্টে পৌঁছতে; সেইটেকেই আমার বোঝা উচিত ছিল ইঙ্গিত বলে—কিছু একটা ঘটবে তার ইঙ্গিত, কখনো তো আমার এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়নি—দেরির জন্য ফ্লাইট হারানো. খুব খানিক ছুটোছুটি করে পরের যে ফ্লাইট যাচ্ছে নিউইয়র্কে—সে এয়ারলাইনস আমি ব্যবহার করতাম না বেশি, অন্যটাতেই কাজও চলতো, পছন্দও আমার—তবু ঠেকায় পড়ে তারই জন্যে ধরাধরি সাধাসাধি করে একটা আসন পেয়ে খুব খুশি ল্যাগল মনটা। সহকর্মীরা ঠাট্টা করবার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে জানি—কে আমায় পিছু টানছিল ডেট্রয়েটে তাই নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলবে ন্যান্সিকে। নানা জায়গায় ঘুরলে অমন নানা বন্ধু জোটে মানুষের, আমার কখনো মন চঞ্চল—না, মন না শরীর, —শরীর চঞ্চল হয়নি কোথাও এমনও নয়, কিন্তু সে সব তুচ্ছ ব্যাপার, তা নিয়ে সময় দিয়ে আমার উন্নতি মাটি করব এমন সম্ভাবনা ছিল না আদৌ। উন্নতি থাকলেই আমি আছি, আমার ন্যান্সি আছে, আমার সুখ শান্তি সব আছে, ঠাট্টা, ফালতু ঠাট্টায় আমার কী হবে, তবু, সুযোগ ওরা একটা পাবে ভাবতে আমার যেন অস্বস্তি হতে লাগল, খুব বড় হওয়ার বাসনা যার তার ওরকম হয় কি না, কে কোথায় ছোট ভেবে ফেললো, এই ভেবে—যাকগে, তারপর কী হলো শোন, আমি গেলাম আমেরিকান এয়ার লাইনসের প্লেনে উঠতে। অল্প অল্প বৃষ্টি আর হাওয়া। প্লেন সময়মত ছাড়বে কিনা শুনে নিজের সীট দেখছি, এমন সময় এক লম্বা বেণী ভারতীয় মেয়ে হাতে জেব্রা কোট—বিষম ভারি, আর কাগজ দস্তানা জিনিস উপচে পড়া ভারী ব্যাগ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে সীট নাম্বার দেখতে লাগল। উইন্ডো সীট তার কিনা জিজ্ঞাসা করলাম, জানতাম তার হবেই, মেয়েরা জানলা ছাড়ে না কখনো, তার সে সীট হোক না হোক। এ মেয়ে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললো,—না তোমারই, বলে সরে এল। বুঝছি ওর খুব ইচ্ছে ও পায় সীটটা, বলে দিলাম বি মাই গেস্ট, তখুনি সে হেসে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল, বললো,—অসুবিধে হলো তো তোমার।

সঙ্গিনী বললো,—চালু মেয়ে, বাঙালিনী অবশ্যই?

সে উত্তর দিল না। নিজের মনে গল্পের খেই ধরে বললো,—ওরকম বাদামী চকোলেটের মতো হাসি আমি দেখিনি কখনো তার আগে। আমারও নিজের সেদিন কেমন মজা আর অপ্রস্তুত লাগছিল বলেছি, আমরা খুব হাসলাম আর কথা বললাম। খুব কাঁপছিল প্লেনটা, সমস্তক্ষণ বেল্ট বাঁধো বেল্ট বাঁধো, তারই মধ্যে কফি দিতে কফি ঢেলে ফেল্লাম নিজের গায়ে, আর হাসি, কী হাসি। মেয়েটি বললো,—তুমি সারাদিন ধরে প্লেনে কাটাও কেউ বিশ্বাস করবে না, আমি বললাম,—তুমি একটা মস্ত ফাউন্ডেশনের টাকায় পণ্ডিতী করে বেড়াচ্ছ তাও কেউ বিশ্বাস করবে না, তোমাকে দেখলে পণ্ডিতনী মনেই হয় না। রাগ করতে পারত তার বদলে সে হাসতে হাসতে বললো, হাসছি কি না তাই। হাসলেই মান সম্মান সব মাটি—দেখছ না সবাই এদিকে তাকাচ্ছে, হাসাহাসি দেখলেই ওইরকম বাঁকা চোখে তাকায় লোকে, সৎ কিংবা মান্যগণ্য লোক হলে তাকে হাসতে নেই, হাঁড়িমুখো হতে হয়। এই সময়ে প্লেনের পাগলা ঝাঁকুনিতে তার উপছানো ব্যাগ থেকে একটা লম্বা পাকানো শক্ত কাগজ পড়ে পিছনের সীটের দিকে গড়িয়ে গেল। মেয়েটি বললো,—যা, গেল আমার সাধের সম্পত্তি।—আমি কেবল ইংরেজী বলে ফেলছি, মাপ করো।

সঙ্গিনী বললো,—নেভার মাইন্ড। অন্ধকারে সঙ্গিনীর গলা হঠাৎ অন্যরকম শোনালো।

সে বললো,—আমি জানতাম তখন বেল্ট ফেল্ট খুলে উঠতে গেলে সবাই অস্বস্তিতে পড়বে, তাই আমি একটু দেরি করলাম, জানতে চাইলাম কাগজখানা সত্যি জরুরি কিনা। সে বললো, ভীষণ, কিন্তু কী আর করা যাবে, আমি তো এখন ওটার পিছনে দৌড়তে পারব না, এমনিতেই সবাই যেমন ফিরে ফিরে দেখছে, অমন নেচে বেড়াতে দেখলে আর রক্ষে থাকবে না, আমি জীবনেও শুনিনি তোমাদের দেশে লোক এত কৌতূহলী হয়, আসলে তোমাকে দেখতে ভাল বলে আর আমি একমাত্র বিদেশী যাত্রী করুণ মুখে বসে থাকার বদলে তোমার পাশে বসে একনাগাড়ে হাসাহাসি বকাবকি করে যাচ্ছি, বেচারীদের খুব উদ্বেগ হচ্ছে। বলে সে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে লাগল কাগজটা গেল কোনদিকে—সে কি আর দেখা যায়? আমি উঠে গেলাম তার সম্পত্তির সন্ধানে, তিনসারি পেরিয়ে সীটের তলায় থেমেছিল সেটি, হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে নিয়ে এলাম যখন দেখলাম সকলে সত্যিই দেখছে আমাকে আর আমার সহযাত্রিণীর মুখ হাসিতে ভরে গিয়েছে। নিজেকে ভীষণ ভাল লোক মনে হলো জান, তারপর যতক্ষণ প্লেনে থাকলাম ততক্ষণ মনে হলো এমন ভাল যেন অনেকদিন লাগেনি, ঠিক ছোটবেলার মতো। সেদিন প্লেন নামতে দেরি করলো, আকাশে থাকে থাকে জমে গিয়েছিল উড়োজাহাজের সারি, ট্রাফিক জ্যাম যাকে বলে, ক্ষণে ক্ষণে ঘোষণা শোনা যাচ্ছিল আরো দেরি হবে নামতে, আরো দেরি। মেয়েটি বললো,—এত বলে কেন বল দেখি? না জানলে যে অজানার তৃপ্তি তা বুঝি এরা আমাদের পেতে দেবে না ভেবে রেখেছে?

আমি ততক্ষণে শুনে নিয়েছি সে কেন যাচ্ছে নিউইয়র্কে, এয়ারপোর্টে কে আসবে তাকে নিতে, ও যে কী দুর্ধর্ষ মেয়ে বুঝতে আমার বাকি নেই। কোনো মার্কিনী মেয়ের কথা আমি ভাবতেই পারি না যে একা গিয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছবে হোটেল বুকিং কিংবা ওসব কিছু না করে কেবল এক পুরোনো বন্ধু এয়ারপোর্টে আসবার ভরসায়—তাও আবার সে বন্ধু কি না এক সাইকোলজিস্ট, দায়িত্বজ্ঞান নেই—ও নিজেই বললো সে সব কথা, অথচ তাই নিয়ে যে তাকে ভাবিত দেখলাম তা নয়। কেমন যেন বানানো ব্যাপারের মতো—

সঙ্গিনী অস্ফুটে কী যেন বললো। সে বলে চললো,—হ্যাঁ, তারপরে কি হলো শোন

না। প্লেন নামে না নামে না করে শেষ পর্যন্ত নামলো। এয়ার হোস্টেসদের মধ্যে যে আমাদের সব যাত্রীদের লিস্টি মিলিয়ে নিয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিল যে ওর আর আমার নাম আলাদা, সে একফাঁকে ওকে শুধিয়ে নিল ওর স্বামী কি ওকে নিতে আসছেন নিউইয়র্কে। আসছেন না শুনে তার মুখ যেমন গম্ভীর হয়ে গেল আমারও তেমনি হতো যদি না আমি এর ভিতরে এঁচে নিতাম ও কী অদ্ভুত অন্যরকম মেয়ে। কোথায় যাচ্ছ তুমি তাহলে? ও নিরুদ্বেগে বললো, দেখি ফোন করে আমার জন্যে ওয়াই ডবুতে রিজার্ভেশন করেছে কিনা আমার বন্ধু, না কি ভোলামন ভুলে গেছে। কাজ সারা হলে সে গেল ফোন করতে কোন ডায়ানের বাড়ি—যদি তাদের কাছে আশ্রয় পাওয়া যায় আজকের মতো, কাল তো চলে যাবে ইথাকায়, শুধু আজকের জন্যে, এত কী চিন্তা, আমি শুধু শুধু দাঁড়িয়ে আছি কেন এমনি সব কথা চলছিল। আমি কিন্তু রাত্তির পৌনে এগারোটায় তাকে ফেলে শহরে চলে আসতে পারছিলাম না। তার ভোলামন বন্ধু না হয় তাকে ঠিক চিনেছে, বিনা দুশ্চিন্তায় এয়ারপোর্টে না এসে, রিজার্ভেশন না করে বাড়িতে ফোন ধরবার জন্যও অপেক্ষা না করে কোথায় বসে আছে, হয়তো ফেয়ারে, আমি তা বলে এ বিদেশিনীকে পথে ফেলে রেখে যাই কী করে? ফোন সারা করে সে যখন সেই রাত্রেই শহর ছেড়ে ভিতরের দিকে যাবার বাসের সন্ধানে যাবে বলে পরিকল্পনা করছে, আমি বললাম পাগলের মতো এখুনি আর একটা জার্নি নিতে যেও না, খোঁজ নিই আমি যে হোটেলে উঠছি সেখানে জায়গা আছে কিনা, তাহলে আমরা একসঙ্গে শহরের ভিতরে যাব—কী বল?

মেয়েটি বললো,—জায়গা থাকবে কি, মেলা মেলা করে যা ভিড় হয়েছে! জায়গা অবশ্য মিললো, দামী হোটেল, যে কেউ এসে উঠবে এমন নয়, ফোন করে ব্যবস্থা করে তাকে বললাম সে কথা, ঘরের দর শুনে সে মনে মনে হিসেব করল একবার—এই প্রথম—তারপর বললো, তাহলে যাওয়া যাক, ট্যাক্সি ভাড়া কিন্তু আধাআধি। আমি বললাম মাথা খারাপ? আমি তো তোমার সাইকলজিস্ট বন্ধুর মতো উন্মাদ নই। দুজনে ট্যাক্সিতে উঠলাম, কেনেডি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ছেড়ে শহরের দিকে যাচ্ছি, মেলার আলো আভাস দিচ্ছে, আমার মন এতক্ষণে আকাশ ছেড়ে মাটিতে ফিরে এল। ফ্রিস্কোতে আমার বাড়ির কথা ভাবলাম, ন্যান্সির কথা ভাবলাম, ন্যান্সি কি এ কাহিনী শুনলে বিশ্বাস করবে? আমি সম্পূর্ণ অচেনা বিদেশিনীকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে সাবধানে সাগ্রহে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাচ্ছি—এর কি কোনো মানে আছে? কেউ করে তা? আমি কি আর কখনো করেছি এমন? সমস্ত ব্যাপারটা যে কী অবাস্তব তা যেন একপলকে পরিষ্কার হয়ে উঠলো আমার কাছে। আমি বললাম, তুমি এ গল্প বলবে তোমার স্বামীর কাছে? মেয়েটি যেন অবাক হয়ে বললো, কোন গল্প?

—এই যে আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ের গল্প?

—বাঃ, বলব না, আমাদের হাওয়ার্ডের অন্যায়ের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে তুমি আমার এত উপকার করলে, আমি বলব না আমার স্বামীকে? নিশ্চয় বলব।

—বিশ্বাস করবেন তোমার স্বামী?

—অবশ্যই করবেন। বিশ্বাস না করার কী আছে? তাঁর সঙ্গে কি আমার আজকের চেনা?

আমার মনে হলো কে বলে ভারতবর্ষের সমাজ অনুন্নত, এমন উদার বিশ্বাস যেখানে স্বামীস্ত্রীর ভিতরে সে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য উন্নত সমাজ। আমি সে কথা বললাম তাকে। সে উত্তরে বললো,—আমার স্বামী খুব উদার কিন্তু এ গল্প বিশ্বাস করার জন্য খুব উদারতা লাগে না। আমি বললাম, লাগে, আমি জানি আমার স্ত্রী বিশ্বাস করবে না, অথচ আজকের

কথা তাকে আমি বলব না ভাবতে খারাপ লাগছে।

মেয়েটি সহজভাবে বললো,—আহা, এত মুস্কিল হয় জানাতে, তবে আমাকে আবার তোমার হোটেলেই যেতে বললে কেন?

—কেন যে ভাবিনি, এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে, যতই ভাবছি বুঝতে পারছি তোমার গল্প আমার বাড়িতে পৌঁছলে খুব শক্ত হবে আমার পক্ষে প্রমাণ করা যে আমার দিক থেকে কোনো অপরাধ হয়নি।

মেয়েটি বললো,—কী কান্ড!

আমি বললাম,—দেখা যাক, আমার সহকর্মীরা যদি লাউঞ্জে না থাকে তাহলে হয়তো লুকোনো যাবে সবটা। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমি কেন যে ভাবি নি। এই কুড়ি মিনিটে আমার মনে হচ্ছে আমার বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর, হয় না কি এক একটা অভিজ্ঞতায়? আগে শুনেছি এবার নিজে টের পেলাম।—বলে আমি হাসতে চেষ্টা করলাম, মেয়েটিও হাসল কিন্তু গাড়ির ভিতরে অন্ধকার বলেই হোক কি ক্লান্তিতেই হোক উজ্জ্বলতা ছিল না সে হাসিতে টের পেয়ে আমি সহজ হবার চেষ্টায় আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে, বললাম, দেখ, আমার হাত কিরকম ঠান্ডা হয়ে গেছে। সে আমার হাত ধরে স্নিগ্ধস্বরে বললো, বেচারী। আমাদের ট্যাক্সি এসে থামল হোটেল কমোডরের দরজায়, কাঁচের ওধার থেকে আমার সহকর্মীরা তার দিকে চেয়ে রইল, আমি তাদের দিকে চেয়ে মামুলি কথা বলে চেক ইন করতে গেলাম। মেয়েটিকে তার ঘরের নম্বর জানিয়ে দিলেই আমার কর্তব্য শেষ, তারপর আমি আমার সহ-কর্মীদের কটাক্ষ সামাল দেব, হোটেলকাউন্টার থেকে মোটা লোকটি বললো,—এ মহিলার ঘর তো দেব বলেছি, কিন্তু ডবল বেড ঘর দিতে পারছি না। আমি সামান্য প্রতিবাদ করায় বললো, —পাশাপাশিও নেই বুঝলে, অন্য ফ্লোরে যদি তোমাকেও সরিয়ে দিই? এই সময়ে মেয়েটি বলে উঠল,—আহা, অত দরকার নেই বলা হলো তো, যে কোনো সিংগল রুম দিন আমায়। লোকটি তার দিকে একপলক তাকিয়ে আমায় বললো, তুমি বলতে চাও ইনি যে তলায় ইচ্ছে থাকুক তোমার কিছু এসে যায় না? আমি তার কথার উত্তর দেবার আগে মেয়েটি বললো,— ঠিক তাই। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম হাসিতে তার চোখ টলটল করছে, একেবারে পাগল। একে নিয়ে লজ্জা পাওয়াও মিছে, আমিও তাই একটু হেসে আমার নাম সই করে সরে এলাম। সে তার কাগজপত্র বের করতে করতে শেষ প্রস্থ ধন্যবাদ দিল আমাকে। পরদিন ভোরে তাকে দেখলাম একবার লাউঞ্জে, তারপর কোথায় গেল সে, গেল কি না তার খবরও নিই নি, নেবার কথাও নয়।

—তারপর?

—বুঝতেই তো পারছ, আমি যা যা বলেছিলাম সব হলো। কিছু বেশি হলো, কেন না আমার সহকর্মীদের ভিতরে একজনের বড় টান ছিল ন্যান্সির উপরে, সে এ ঘটনার সুযোগ কিছুতেই ছাড়ল না, ন্যান্সি বিশ্বাস করল আমি আমার ভারতীয় প্রণয়িনীকে নিয়ে এতদিনে বন্ধুদের সম্মুখে ধরা পড়ে গেছি, তার দাবী হলো আমি শুধু সত্যি কথাটা স্বীকার করে তার নাম ঠিকানা ন্যান্সিকে যেন বলি, তাহলেই প্রমাণ হবে যে আমি যথার্থ অনুতপ্ত, আর, অনুতপ্ত স্বামীকে ক্ষমা করবে না এমন মেয়ে সে নয়।

—বলে দিলে না কেন কিছু একটা বানিয়ে?

—ইচ্ছে করল না। একেবারেই ইচ্ছে করল না। সেই যে আকাশে উড়ে একদিন নিজেকে একটুক্ষণের জন্য নিজের চেয়ে ঢের বেশি বড় আর ভাল বলে জেনেছিলাম তাকে সত্য বলে

পেতে ইচ্ছে করল, তাই মাটির খোলসটা পালটাতে চাইলাম।

—সোজা চলে গেলে আশ্রমে?

—না, প্রথমে একবার এলাম এ দেশে, কেমন কৌতূহল হলো যদি দেখা হয়ে যায়, দেখি—সেও মুশকিলে পড়েছে কোনো! নামটা মনে ছিল, ঠিকানা ছিল না কাছে, শুধু কলকাতা, কলকাতায় কি মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়? যোগাযোগ হয়ে গেল আশ্রমের সঙ্গে—এখানেই প্রথম,—তারপর, দেখছি যা খুঁজেছি, তার চেয়ে বেশি পেয়ে গেলাম, মন বসে গেল।

এতক্ষণ পুরোনো কথায় লিপ্ত হয়ে ক্লান্ত হয়েছিল সে, চুপ করে রইল, জপের মালা ফের হাতে তুলে নিল।

সঙ্গিনী বললো,—যদি কৌতূহল একেবারে না মরে গিয়ে থাকে, তোমায় বলতে পারি আর একটুখানি এ গল্পের, শুনবে?

সে হাতে মালা স্থির রেখে বললো,—কী বলবে? বলবে যে তুমি সেই সহযাত্রিণী, আমারই মতো সংসার থেকে ছিটকে এসেছ এখানে? শুনে আমার কিছু হবে না, আমার সত্যিই কৌতূহল নেই আর।—তার হাতের ভিতরে মালা ঘুরতে সুরু করল।

সঙ্গিনী প্রাণখোলা হাসি হাসল, সে সম্মুখে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকল। সঙ্গিনী বললো,—পরচুলো সরিয়ে নিয়েছি, অন্ধকারেও তাকালে দেখতে পাবে—আমি নিতান্তই সংসারাশ্রমের বাসিন্দা। এসেছিলাম তোমাদের এই আশ্রমের কিছু চিত্তাকর্ষক গল্প সংগ্রহ করতে, উদ্দেশ্য নির্দোষ সাংবাদিকতা। শুনছ, না মালা জপ করছ? তোমার সেই সহযাত্রিণীর নাম ছিল শমিতা চৌধুরী, তাই তো?

সে গলা দিয়ে সামান্য শব্দ করল।

সঙ্গিনী বললো,—তুমি যে তুমি জেনে পরিচয় দিলাম, নইলেই যে অন্যদের ঠকাচ্ছিলাম তা কিছু নয়, সংবাদ দিতে নিতে অমন নানা সাজ ধরতেই হয়, কোনো ক্ষতি হয় না ওতে। সেবার তোমাদের দেশ থেকে ফিরে প্রথম রীতিমতো লিখতে সুরু করি, ক্রমে সাংবাদিক হয়ে গেছি, কে জানত এ ভাবেই ফের যোগাযোগ হবে তোমার সঙ্গে।

সে বললো,—আমি আশ্রমে ফিরে এসব বললে তোমাকে আশ্রমে হয়তো সবাই সাদর অভ্যর্থনা দেবে না।

সঙ্গিনী বললো,—আমার আশ্রমের গল্প নেওয়া হয়ে গেছে, তোমার গল্প পেতেই দেরি হচ্ছিল, তা-ও পেলাম, আশ্রমে আর আমি যাব না তো, বাড়ি যাব। আপত্তি না করো তো তোমাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাই, আমার স্বামী খুব খুশি হবেন তোমাকে দেখে। তোমারও ভালো লাগবে তাঁকে দেখে।

সে বললো,—আমার ভাল লাগছে না এসব কথা।

সঙ্গিনী বললো,—কেন বল তো? রাগ হচ্ছে?

সে বললো,—না, সুর কেটে গেছে। কেন শুধু শুধু এসব কথা বললে?

সঙ্গিনী বললো,—কী জানি, কেন যেন মনে হলো আমাকে নিয়ে এক রকম মজার গণ্ডগোলে তো তোমায় ঠেলে এনেছে গঙ্গাপারে, অন্যরকম গোলটা বাধিয়ে দিলে যদি তোমায় সমুদ্রপাড়ি দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া যায়?

সে হাসবার চেষ্টা করে বললো,—তুমি সাংবাদিক, না, সমাজসংস্কারক?

সঙ্গিনী বললো,—দুই-ই।

বাংলা কাব্যে বাঁশি

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

কাব্য মূলত বাক্-শিল্প, বাক্-নির্ভর শিল্প। কবির যা কিছু কলাকৌশল—সবই বাক্ ও বাক্য নিয়ে। এই কথাটি প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের জানা ছিল, য়ুরোপীয় আলংকারিকরাও জানতেন। একালে কোলরিজ ও মালার্মে নতুন করে এই কথাটি আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন। এই বাক্ ও বাক্য ব্যবহারের ভিতর দিয়ে যে কবিভাষা বা বাক্-শৈলী গড়ে ওঠে, কবির যে বিশিষ্ট শব্দরুচি প্রকাশিত হয়ে ওঠে, তার পারম্পর্য-সূত্রে তৈরী হয় কাব্য-ভাষার ঐতিহ্য। বস্তুত, এই অর্থে, বলা উচিত গভীরতর অর্থে, কাব্যের ইতিহাস আসলে ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের ইতিবৃত্ত ছাড়া আর কী?

এবং, এই শব্দব্যবহারের, চাই কি কাব্য-ভাষার বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে, প্রত্যেক কাব্য-ভাষাতেই এমন কিছু শব্দ থেকে গেছে, যাকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ ভাবানুষঙ্গ অথবা বিশেষ আবহ সৃষ্টি হয়েছে। কবিরা এমন কিছু শব্দ ব্যবহার বা সৃষ্টি করেন, যা পূর্বাপরতাসূত্রে বা রিক্‌থ হিসেবে সেইসব শব্দ ক্রমান্বয়ে ব্যবহৃত হতে থাকে, হতে হতে এইসব শব্দকে ঘিরে গড়ে ওঠে বিশেষ ভাব-ঐতিহ্য; এইসব শব্দ তখন নিছক সামান্য অর্থবহ শব্দ মাত্র থাকে না, সেগুলি ঐতিহ্যবহ গভীর তাৎপর্য লাভ করে। অভিধার্থ ছাড়িয়ে তখন এইসব শব্দ হ'য়ে ওঠে সংকেত-শব্দ এবং তার ভিতর দিয়ে কবির বিশেষ মর্জিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা কাব্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে স্বভাবতই এমন অনেক না হোক বেশ কিছু সংখ্যক শব্দ চোখে পড়ে। এমনি একটি শব্দ বাঁশি।[১] এর সমার্থক শব্দগুলি যথাক্রমে বংশী, বাঁশরী, মুরলী, বেণু। কীভাবে বাঁশি শব্দটি বাংলা কাব্যে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, ব্যবহৃত ও বিবর্তিত হয়েছে এবং ব্যবহার বা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে তার রূপান্তর ঘটেছে, এখানে সেই আলোচনা করা গেল।

বাংলা কাব্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে বাঁশি বা তার সমার্থক শব্দের ব্যবহার নেই, ব্যবহৃত হয়েছে 'বীণা'। যেমন, ১৭ সংখ্যক পদে—'বাজই অনো সহি হেরুঅবীণা' (ওলো সখি [নৈরাত্মা] হেরুক বীণা বাজাচ্ছে।)

অবশ্য, শূন্যপুরাণে[২] শব্দটির ব্যবহার রয়েছে: 'বাঁসর আকুড়সি হাতে বাসর ফুলসাজি।'

জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এ বাঁশি শব্দটি (বেণু সমেত) তিনবার ব্যবহৃত হ'তে দেখি:

১. করতলতাল তরলবলয়াবলিকলিত কলস্বন বংশে।
(শ্রীকৃষ্ণের বসন্তলীলা)

২. সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনি মুখরিত মোহন বংশম্॥
(শ্রীকৃষ্ণের রামোচরিতরূপ)

---

[১] বাঁশি শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য। বঙ্গীয় শব্দকোষ (২য় খণ্ড)—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[২] শূন্যপুরাণের রচনাকাল নিয়ে মতান্তর আছে, সে বিষয়ে অবহিত।

৩. নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
(অভিসারিকা। শ্রীরাধার প্রতি সখী)

এখানে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে বংশম্ শব্দটি মূলে সংস্কৃতজ এবং তার বিশেষণরূপে মোহন শব্দটি ব্যবহৃত। পরবর্তীকালে, জয়দেবের অনুগামী কবি-সমাজ যখনই এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, প্রায় সর্বত্রই এই বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, বাঁশি এখানে লৌকিক অর্থেই অর্থাৎ বিশেষ বাদ্যযন্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত। এইভাবে, জয়দেবের কাব্য থেকে এই শব্দটিকে কেন্দ্র ক'রে একটি বিশেষ আবহ সৃষ্টি হয়েছে; তা' আধুনিক কালের কাব্যেও চলে এসেছে। আরো লক্ষ্য করার বিষয়, বাঁশি শব্দটির সঙ্গে কৃষ্ণ ও প্রেমের একটি সম্পর্ক রচিত হয়েছে জয়দেবের আমল থেকেই। গভীরভাবে দেখলে, হয়ত এই শব্দটির মধ্যে সূক্ষ্ম একটি সংকেতও থেকে গেছে, যা' পরবর্তীকালে বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যায় অভিব্যক্ত। এইভাবে, জয়দেবের কাব্যে শব্দটির যে ভাবগত ও রূপগত ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করি, পরের যুগে তা' একটা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বাঁশি শব্দটির প্রয়োগ, বেণু ও মোহারী সমেত, বহুল। মোট ১৯ বার ব্যবহৃত। এই কাব্যে বাঁশির সমার্থক বা তার প্রতিশব্দ হিসেবে 'মোহারী' শব্দটি লক্ষ্য করার মতো (যতোদূর চোখে পড়ে, এই শব্দটি পরবর্তীকালে অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে)। এর মধ্যে বংশীখণ্ডের অন্তর্গত আক্ষেপানুরাগের একটি পদেই (শ্রীরাধার উক্তি) 'বাঁশি' শব্দটি ৭ বার ব্যবহৃত: একটি নতুন বিশেষণও ব্যবহৃত হতে দেখি:

বাজা এ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥

অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োগ:

১. কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥ (বংশীখণ্ড)

২. কোণ দিগেঁ মোহারী বাজে (বংশীখণ্ড)

৩. তোহ্মার সঙ্কেতবেণু বাজা এ যতনে (বৃন্দাবনখণ্ড)

এছাড়া, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বাঁশি শব্দটির ২৫ বার ব্যবহার রয়েছে। শব্দটির রূপান্তর: বংশী ও মুরলী। একটি পদে বাঁশি শব্দটিকে বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে:

মরি মরি যাই শ্যাম বাঁশিয়া নাগরে।
কুল ছাড়া বাঁশীটি কলবা হৈল মোরে॥

অন্যান্য পদের মধ্যে, 'মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে' শীর্ষক পদটিতেই ৭ বার শব্দটি ব্যবহৃত। কয়েকটি নতুন বিশেষণেরও ব্যবহার দেখা যায় পদাবলীতে। যেমন: 'দারুণ বাঁশরী', 'সুলভ বাঁশী', 'অমার বাঁশী', 'তরল বাঁশী'। এমন কি, 'দারুণ[১] মুরলী' ও 'বিষম বাঁশী'র ব্যবহার রয়েছে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে।

দেখা যাচ্ছে, জয়দেব-ব্যবহৃত 'মোহন' শব্দটির পরিবর্তে চণ্ডীদাস নতুন কতকগুলি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন যার ভিতরে একটা আর্তি বা বেদনার ভাব ফুটে উঠেছে। চণ্ডী-দাসকে রবীন্দ্রনাথ যে দুঃখের কবি[২] বলে চিহ্নিত করেছেন, এই বিশেষণটি তার প্রমাণ-পরিচয় বহন করছে।

---

[১] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিশেষণরূপে ব্যবহৃত কথ্যভাষায় 'দারুণ' শব্দটির যথেষ্ট প্রয়োগ রয়েছে। যেমন, 'দারুণ শীত, দারুণ খিদে পেয়েছে', দারুণ রোদ, দারুণ ভালো', ইত্যাদি। চণ্ডীদাস সম্ভবত কথ্যভাষার বাক্-ভঙ্গীর অনুসরণেই এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

[২] 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি'। সমালোচনা।

বাংলা বৈষ্ণব-পদাবলীর মুখ্য কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির নামটিও উল্লিখিত হয়ে আসছে। বিস্ময়ের কথা, বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদগুলিতে সরাসরি বাঁশি শব্দটির প্রয়োগ নেই, শুধুমাত্র মুরলী শব্দটি একবার ব্যবহৃত:

নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরুতলে/ধিরে ধিরে মুরলী বোলাব।

এর থেকে সম্ভবত এ-কথাই প্রমাণ হচ্ছে যে, বাঁশি শব্দটির ভিতর দিয়ে বাংলা কাব্যে যে ভাবানুষঙ্গ রচিত হয়েছে, বিদ্যাপতি তার সঙ্গে অপরিচিত বা বিদ্যাপতির সঙ্গে তার যোগ নেই। অর্থাৎ তিনি বাঙালী কবি নন।

চৈতন্য-পূর্ব যুগের অন্যতম বৈষ্ণব কবি গুণরাজ খানের পদাবলীতে ৭ বার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। গুণরাজ খান 'বংশীনাদ' শব্দটি ৪ বার প্রয়োগ করেছেন:

বৃন্দাবন মাঝে বংশীনাদ পূরে। ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ২৫ জন পদকর্তার[৫] রচনায় বাঁশি শব্দটি নিম্নোক্তরূপে ব্যবহৃত হয়েছে,

রায় রামানন্দ—০	শিবানন্দ সেন—২
মুরারি গুপ্ত—০	শিবাই—১
নরহরি সরকার—৫	শিবরাম—২
গোবিন্দ ঘোষ—৩	অনন্ত—৩
মাধব ঘোষ—০	অনন্ত রায়—০
বাসুদেব ঘোষ—৮	অনন্ত আচার্য—০
শ্রীরূপ গোস্বামী—৭	অনন্ত দাস—৩
বসু রামানন্দ—৬	বংশীদাস—০
রামানন্দ দাস—৩	বংশীবদন—১
যদু কবিচন্দ্র—১	পরমানন্দ—১
যদুচন্দ্র দাস—১০	প্রসাদ দাস—০
যদুনন্দন—১৩	গোবিন্দ আচার্য—৫
মাধব দাস—৫	

এই কবিসমাজের ৫২৫টি পদে বাঁশি (বা তার সমার্থক শব্দ) মোট ৭৯ বার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এর মধ্যে যদুনন্দন, যদুনাথ সেন, বাসুদেব ঘোষ ও শ্রীরূপ গোস্বামীর[৬] পদাবলীতে যথাক্রমে ১৩, ১০, ৮ ও ৭ বার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। চণ্ডীদাসের মতো গোবিন্দ আচার্যও বাঁশি শব্দটিকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করেছেন:

জাগিতে ঘুমিতে দেখি বাঁশিয়া বয়ান॥

তাছাড়া, এ'র পদে পুনরায় 'মোহন' বিশেষণটির প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি: 'ঈষৎ হাসিয়া/মোহন বাঁশরী/মধুর মধুর বায়'॥ অবশ্য, শুধুমাত্র গোবিন্দ আচার্যই নন, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, বসু রামানন্দ প্রমুখ পদকর্তা এই বিশেষণটি প্রায়শই ব্যবহার করেছেন। বস্তুত, জয়দেব থেকেই কবিপরম্পরায় এই বিশেষণটি বাঁশির সঙ্গে প্রযুক্ত হয়ে আসছে।

[৫] বৈষ্ণবপদাবলী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ সংস্করণ অবলম্বনে এই তালিকা গৃহীত।

[৬] শ্রীরূপ গোস্বামীর পদগুলি মূলত সংস্কৃতে রচিত। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে অন্যান্য বাঙালী পদকর্তাদের সঙ্গে তাঁকেও স্থান দিয়েছেন।

চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরবর্তী ও পরবর্তীকালের ৮৩ জন পদকর্তার পদাবলীতে নিম্নলিখিতরূপে বাঁশি শব্দটির প্রয়োগ করা যায়,

কবিরঞ্জন—১
রায়শেখর (কবিশেখর)—৪০
কানু রামদাস—০
জ্ঞানদাস—৭৭
লোচনদাস—১০
বৃন্দাবন দাস (১)—০
বৃন্দাবন দাস (২)—২
নয়নানন্দ (ভরতপুর)—১
নয়নানন্দ (মঙ্গলডিহি)—১
নয়নানন্দ (শ্রীখণ্ড)—০
গোকুলানন্দ—৩৪
বসন্ত রায়—১০
প্রেমদাস—৪
বল্লভ দাস—৪
শঙ্কর ঘোষ—০
নীলাম্বর—০
নীলকণ্ঠ—২
বলরাম দাস—১৫
দীন বলরাম—৩
বলাই দাস—২
বলরাম দাস (নরোত্তমভক্ত)—০
পরশুরাম—২
গোপাল ভট্ট—১
গোপাল দাস—০
রাধাবল্লভ দাস—০
সিংহ (ভূপতি)—০
ঘনশ্যামদাস কবিরাজ—৬
হরিবল্লভ—১
ভূপতিনাথ—০
নরহরি চক্রবর্তী—২
পুরুষোত্তম দাস—১
সর্বানন্দ—০
বিন্দুদাস—০
কৃষ্ণকান্ত দাস—০
কৃষ্ণানন্দ—২
গোবর্ধন দাস—২
উদ্ধব দাস (১)—০
উদ্ধব দাস (২)—৭
চম্পতি—১
চৈতন্যদাস—০
তরণীরমণ—০
দুঃখী দীন কৃষ্ণদাস—৫
নরোত্তম দাস—২
জগন্নাথ দাস—১
শ্যামানন্দ—০
গোবিন্দ দাস (১)—২৮
গোবিন্দদাস (২ চক্রবর্তী)—১১
মনোহর দাস—১
মাধবী দাস—০
মোহন দাস—১
রাধামোহন—১২
রাধা দাস—৭
নন্দ দাস—০
নন্দকিশোর—২
নন্দদুলাল—১
নটবর দাস—০
দেবকীনন্দন—০
হরেকৃষ্ণ দাস—৭
যাদবেন্দ্র—২
দীনবন্ধু—২৯
নিমানন্দ দাস—৬
ঘনরাম—৭
বৈষ্ণব দাস—০
কমলাকান্ত—২
চন্দ্রশেখর—৫
শশিশেখর—২
পূর্ণানন্দ—৮
দামোদর—০
গদাধর দাস—৮
অকিঞ্চন—৩০
মথুরেশ—১
রামানন্দ—০

জগদানন্দ—৭	সেবাচান্দ—৫
মধুসূদন—৬	ধনঞ্জয়—১
গোপীকান্ত—১	রামনারায়ণ—৩
গোপীচরণ—০	মাণিকচান্দ—১

মোট ৪৩৪ বার ব্যবহৃত।

অন্যান্য প্রকীর্ণ পদাবলীর ৯৬ জন পদকর্তার নামও প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। এঁদের এই-জাতীয় পদে বাঁশি বা তার সমার্থক শব্দটি ৩৩ বার ব্যবহৃত হতে দেখি। এই কবিসমাজের মধ্যে পদকর্তা হিসেবে খ্যাত: যশোরাজ খান, শ্রীনিবাস আচার্য, ভুবনদাস, আলাওল প্রমুখ কবি। তবে, ভুবনদাস ছাড়া (ইনি ১২টি পদ রচনা করেছেন) এঁদের কেউই চার-পাঁচটির বেশী পদ রচনা করেন নি। প্রায়শই একটি অথবা দুটি।

তাহলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমেত বৈষ্ণব পদাবলীতে বা বৈষ্ণব কাব্যে বাঁশি (বা তার সমার্থক) শব্দটি মোট ৫৯৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে। চন্ডীদাস ছাড়া অন্যান্য যে-সব পদকর্তা শব্দটি বহুল ব্যবহার করেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানদাস। ইনি ৭৭ বার শব্দটি বিচিত্রভাবে প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া কবিশেখর, গোকুলানন্দ, গোবিন্দদাস, দীনবন্ধু ও অকিঞ্চনের নামও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকেই নয়, প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিকটিও এক্ষেত্রে স্মরণ-যোগ্য। বিশেষত বিশেষণের ব্যবহার, শব্দটির সঙ্গে। জয়দেবের আমল থেকে 'মোহন'এর ব্যবহার চলে আসছিল; সেইসঙ্গে বৈষ্ণবকাব্যে আরো বেশ কয়েকটি নতুন বিশেষণেরও প্রয়োগ মিলছে। যেমন,

১. মনোহর মুরলী/সঙ্কেত মুরলী/গুণময় বাঁশী (কবিশেখর)
২. মুরলী রসাল/মধুর মুরলী স্বরে/অবিরত মুরলী
মধুর গান গায়/মোহন বংশ/বাঁশিয়া (জ্ঞানদাস)
৩. অবেকত/মুরলি নিসান/বিনোদিয়া বাঁশী (গোবিন্দদাস)
৪. অপরূপ বাঁশী (গোবিন্দদাস চক্রবর্তী)
৫. দারুণ মুরলী স্বরে (বলরাম দাস)
৬. বর মাধুরি বাঁশী নিসান (কৃষ্ণকান্ত দাস)
৭. মন্দ-মুরলী-রব (চন্দ্রশেখর) ইত্যাদি।

এছাড়া, শব্দটির কয়েকটি নতুন ব্যবহারও চোখে পড়ে। যেমন, বংশ (মূল সংস্কৃত অর্থে), বেণুক, (মোহন) বংশিকা; বাঁশিয়া অর্থে কৃষ্ণকে বোঝানো হয়েছে। চন্ডীদাস-কৃত এই শব্দটি পরে অনেকেই ব্যবহার করেছেন।

জ্ঞানদাসের ৩১১টি পদে ৭৭ বার শব্দটি ব্যবহৃত। কিন্তু, সংখ্যার দিক থেকেই নয়, লক্ষ্য করা যায়, তিনি নানা অর্থে বিচিত্রভাবে এই শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন। গড়ে প্রায় ৪টি পদে একবার ক'রে 'বাঁশী'র ব্যবহার এসে পড়েছে। এর থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, শব্দটি জ্ঞানদাসের অন্যতম সঙ্কেত-শব্দ।

বৈষ্ণব পদাবলী থেকে শব্দটির প্রয়োগগত বৈচিত্র্যের কিছু দৃষ্টান্ত,

১. মনোহর অধরে/মনোহর মুরলী
২. সো গুণময় বাঁশী কাহে লাগি গেল (কবিশেখর)
৩. কোটি ইন্দু জিনি/বয়ান মনোহর/অধরে মুরলী রসাল

৪. হাসি হাসি পূরে মন্দ বেণু
৫. মধুর মুরলী স্বরে/তরুণী পরাণ হরে/না চাহিতে যৌবন যাচায়
৬. পক্ক বিম্ব অধরে গাহিছে মৃদু বংশে॥
৭. হাসির মিশালে/বাঁশীর নিশাসে/রসের দান্দে কয়।
৮. মোহন বংশ/নিহিত অংস/মধুর মধুর গায়নি॥ (জ্ঞানদাস)
৯. বাঁশিনিশাসে মধুর বিষ উগরই/গতি অতি কুটিল অধীর॥
১০. বেণুক শবদ/দূত মঝু অন্তর/পৈঠল শ্রবণক বাট। (গোবিন্দদাস)
১১. কিবা সে চূড়ার ঠাট/নখে দশ চান্দ নাট/অপরূপ
বাঁশী বাজাইতে। (গোবিন্দদাস চক্রবর্তী)
১২. চাতকী চাতকে/পিব পিব বলি ডাকে/শুনিয়া
জলদরব বাঁশিয়া। (দীনবন্ধু)
১৩. বিষম বাঁশীর কথা কহিলে না হয়।
১৪. বাঁশিয়া দংশিল তোমায় আমি করিব কি॥
১৫. সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥ (চণ্ডীদাস)

ইত্যাদি। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তৎসম-শব্দবহুল পদে সাধারণত মুরলী শব্দটি বাঁশির সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল[৭] কাব্যে সরাসরি বাঁশি শব্দটির ব্যবহার নেই, তবে বেণু শব্দটি ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে,

১. বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-বাদিনী
২. সুশঙ্খ-বেণু-বীণা
৩. শঙ্খ বেণু-বীণা

বাইশ কবির মনসামঙ্গল[৮]-এ উল্লিখিত ৯ জন কবির সংকলনে, অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বিষ্ণুপালের রচনায় রয়েছে—

জয় জয়, পরে ঊষা কাচের বসন।
গঙ্গা-যমুনা বন্দে সাথে মোহন বাঁশী নিল হাতে
ভাঁড়াইল ইন্দ্রের সভায়॥
কোঙর মৃদঙ্গ নিল্যা, ঊষা মোহন বাঁশী। (অভিশাপ, পৃঃ ১৩৫)

এই সংকলনে সংকলিত আর কোন কবির রচনায় শব্দটির ব্যবহার চোখে পড়ে না। দেখা যাচ্ছে, বিষ্ণুপাল মোহন বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন।

মৈমনসিংহ গীতিকা[৯], প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় মোট ১০টি গাথা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'মহুয়া'য় ৯ বার এবং 'কঙ্ক ও লীলা'য় ৭ বার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাকী গাথাগুলিতে শব্দটি অব্যবহৃত। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা গেল,

১. আর না শুনবাম রে বন্ধু তোমার গুণের বাঁশী।
২. ওই শুন বাজে বাঁশী দূরে শুনা যায়।
৩. দূর বনে বাজল বাঁশী শুন্যাছ যে কানে। (মহুয়া)

---

[৭] ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত সংস্করণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৮] বাইশ কবির মনসামঙ্গল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত সংস্করণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৯] দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত সংস্করণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাঁকে।
৫. ওই শোনা যায় বাজে বন্ধুর বাঁশরী॥
৬. বাথানে যখন বাজে কঙ্কের মোহন বেণু।
৭. কোথাও নি শুনিতে পাও নদী সেই বাঁশীর গান॥
৮. বহুদিন নাহি শুনি বঁধুর বাঁশরী॥ (কঙ্ক ও লীলা)

৬-সংখ্যক উদ্ধৃতির 'মোহন' বিশেষণটি ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো, যেমন ৮-সংখ্যক দৃষ্টান্তের 'বঁধুর বাঁশরী'। এ-সব ক্ষেত্রে স্বভাবতই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বা কাব্যভাষার প্রচলিত বাক্‌শৈলীর প্রভাব অনুভব করা যায়।

ভারতচন্দ্র[১০] তাঁর রচনায় মোট ১৪ বার বাঁশি বা তার সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে "অন্নদামঙ্গল" কাব্যেই ১১ বার ব্যব ব্যবহৃত হয়েছে এই শব্দটি। এবং "রসমঞ্জরী"তে ৩ বার। দৃষ্টান্ত হিসেবে—

১. বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে/গান করে কামতন্ত্রে (বিষ্ণুবন্দনা)
২. কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে/মধুর মুরলী গেয়ে/রাসক্রীড়া
গোপিনী লইয়া॥ (হরিনামাবলী)
৩. মৃদু মধু হাসি/বাজাইছে বাঁশী (গড়বর্ণন)
৪. জানে নানামত খেলা/দিবস দুপুরবেলা/চুরি করে
বাঁশী বাজাইয়া॥ (কোটালগণের স্ত্রীবেশ)
৫. ওই শুন বংশীধ্বনি করয়ে ললিত লো। (মুদিতা/রসমঞ্জরী)

বিশেষণের ব্যবহার পূর্বানুগ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যধারার অবসানে মধ্যযুগের শেষপর্বে রচিত 'কবিগান'-গুলিতে, দেখা যাচ্ছে, বাঁশি শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান'[১১]-এ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সমেত ৮২ জন কবিওয়ালার গান সংকলিত। এই সংকলন অনুসরণে বাঁশি শব্দটির ব্যবহারের একটি তালিকা দেওয়া গেল:

কবিওয়ালার নাম	গান/পদ সংখ্যা	'বাঁশি'র সংখ্যা
রঘুনাথ দাস	২৪	১৩
লালু নন্দলাল	২৮	৫
রামজী দাস	৮	৭
রাসু নৃসিংহ	৯	৩
হরু ঠাকুর	৫১	২০
সাতু রায়	৮	১
নিত্যানন্দ বৈরাগী	৫৩	১৭
ভবানীচরণ বণিক	১০	২
রাম বসু	১৬১	১০
নীলমণি পাটুনী	৬	১
নীলু ঠাকুর	৪	২
এন্টনী সাহেব	৪	২

[১০] ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ।
[১১] প্রাচীন কবিওয়ালার গান—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কবিওয়ালার নাম	গান/পদ সংখ্যা	'বাঁশি'র সংখ্যা
গোরক্ষনাথ	৪	২
ভোলাময়রা	৪	২
মাধব ময়রা	৩	৪
কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য	১২	৫
গদাধর মুখোপাধ্যায়	২৭	৮
ঠাকুরদাস চক্রবর্তী	১০	২
রামকমল	২	১
পরাণচন্দ্র সিংহ	৩	২
নবাই ঠাকুর	১	১
ভীমদাস মালাকার	১	১
চিন্তামণি ময়রা	১	৪
রামসুন্দর রায়	৩	১
রামমোহন দাস	৪	১৬
গোবিন্দচন্দ্র তন্ত্রধর	১	১
বিরিঞ্চি মুখোপাধ্যায়	১	২
পঞ্চানন দত্ত	১	২
লাল মামুদ	২	১১
কৈলাস ঘটক	৩	২
চণ্ডীকালী ঘটক	১	১
সৃষ্টিধর	৪	২
রাধানাথ	১	১
সারদা ভাণ্ডারী	৭	২
উদয়চাঁদ	৪	১
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	১
রামু সরকার	৪	১৪
মনোমোহন বসু	৩	১
অজ্ঞাত	২৯	৮

এই তালিকায় উদ্ধৃত ৩০ জন কবিওয়ালার রচনায় বাঁশি শব্দটি ১৮১ বার ব্যবহৃত, বিচিত্রভাবে। যেমন, পরাণচন্দ্র সিংহের পদে 'সঙ্কেত-বাঁশরীর স্বরে', বা লাল মামুদের পদে 'বাঁশী নিদারুণ'; কিংবা রামু সরকারের পদটিতে 'মুখ্যযন্ত্র বাঁশী', ইত্যাদি। অবশ্য, প্রচলিত ব্যবহারও বহুল, যেমন রামমোহন দাসের পদে 'মোহন বাঁশী', বা লাল মামুদের 'মোহন বাঁশী', অথবা চণ্ডীকালী ঘটকের 'শুনাইয়ে বাঁশীর গান', ইত্যাদি।

এই তালিকায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে ধরা হয়নি। অন্যান্য কবিওয়ালাদের রচনায় শব্দটির ব্যবহার চোখে পড়ে না। রামু সরকারের ৪টি গানের মধ্যে একটি গানেই শব্দটি ১৪ বার ব্যবহৃত। তেমনি রামমোহন দাসের 'বংশী সাধন' শীর্ষক গানটিতে ৯ বার এবং 'সখীসংবাদ' গানটিতে ১১ বার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, সাধারণত 'সখীসংবাদ'এর গানেই শব্দটির বহুল প্রয়োগ ঘটেছে,

অন্য শ্রেণীর বা পর্যায়ের গানে তেমন ব্যবহার নেই। আসলে, অধিকাংশ কবিওয়ালাই, যাঁরা 'সখী সংবাদ'এর গান রচনা করেছেন, তাঁরা কৃষ্ণের প্রসঙ্গে বা রূপ-বর্ণনায় 'মোহন বাঁশী/বেণু/মুরলী/বাঁশরী'-র কথা উল্লেখ না করে পারেন নি। যদিও সাধারণত মোহন ও মধুর বিশেষণ দুটিই বেশী ব্যবহৃত, তথাপি দু-একটি, মাঝে মাঝে, নতুন বিশেষণও চোখে পড়ে। যেমন,

সঙ্কেত বাঁশরীর স্বরে (পরাণচন্দ্র সিংহ)
বাঁশী নিদারুণ (লাল মামুদ)
মুখ্যযন্ত্র বাঁশরী (রামু সরকার)

এক্ষেত্রে, বলা বাহুল্য, এই 'কবি' সম্প্রদায় কাব্যধারার ঐতিহ্য গ্রহণ করেছেন। যেমন ভাবের ক্ষেত্রে, তেমনি বাক্‌শৈলীর ক্ষেত্রে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কবিতাবলীতে[১২] মোট ২৪ বার শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। এর মধ্যে ১৩ বার বাঁশি শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত। লক্ষণীয়, ঈশ্বর গুপ্ত কয়েকটি কৃষ্ণবিষয়ক কবিতা লিখেছেন। যেমন, 'শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন দর্শন', 'কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা।' এই দুটি কবিতায় ৭ বার বাঁশি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। গতানুগতিক ভাবে 'মোহন' বিশেষণটিরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

১. কোথায় এখন সেই মোহন মুরলী (শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন)
২. সঙ্কেতে না বাজাতে মধুর মুরলী („)
৩. বংশী ধ্বনি যেন হে ফণী (কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা)
৪. নিদয় বাঁশী হৃদয়-ফাঁসী/করে উদাসী ছুটিয়া আসি। („)
৫. মুখে মৃদু মৃদু হাসি/সঘনে বাজাও বাঁশী (রাজার তপোবনে প্রবেশ/শকুন্তলা)
৬. বাঁশী কত গুণ ধরে, আমার অধরে (হাফ আখড়াই গীত)

মাইকেল মধুসূদন তাঁর তিনটি কাব্যে (তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা) মোট ২৯ বার যথাক্রমে ৫, ১২ ও ১২ বার শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যে শব্দটির প্রয়োগ সর্গ অনুসারে নিম্নরূপ—

১ম সর্গ	৪ বার	৪র্থ সর্গ	১ বার	৭ম সর্গ	০ বার
২য় „	০ „	৫ম „	২ „	৮ম „	১ „
৩য় „	৪ „	৬ষ্ঠ „	০ „	৯ম „	০ „

মোট ১২ বার।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ষষ্ঠ সপ্তম ও নবম সর্গে শব্দটির প্রয়োগ নেই। দেখা যাবে, এই সর্গ তিনটিতে মধুসূদন বিশেষভাবে গভীর বেদনা বোধ করেছেন। সম্ভবত সেই কারণেই শব্দটি অব্যবহৃত থেকে গেছে। অর্থাৎ শব্দটির ব্যবহারের অবকাশ ছিল না এই সর্গগুলিতে।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যটির বিষয়বস্তুর দিকে তাকিয়ে শব্দটির বহুল ব্যবহার প্রত্যাশিত হলেও বস্তুত মাত্র ১২ বার, বেণু, বাঁশরী ও মুরলী সমেত, ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়া বীরাঙ্গনা কাব্যে ৫ বার, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে ১ বার মাত্র (বেণু) ব্যবহৃত এবং "বিবিধ কাব্য"[১৩]-এ বেণু শব্দটির প্রয়োগ ১ বার মাত্র চোখে পড়ে। মধুসূদন সর্বত্রই প্রচলিত অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত—

---

[১২] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী। বসুমতী সংস্করণ।
[১৩] মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী। সাহিত্য পরিষদ্‌ সংস্করণ।

১. বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে! (১ম সর্গ)
২. নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা। (৩য় সর্গ)
৩. আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা (৮ম সর্গ)
৪. আর কি বাজে লো/মনোহর বাঁশরী/নিকুঞ্জবনে? (কুসুম ৪, ব্রজাঙ্গনা)
৫. মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ
বাজায়ে বাঁশরী, নাচি তমালের তলে!
(তৃতীয় পত্র, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী (বীরাঙ্গনা) ইত্যাদি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[১৪] তাঁর কবিতাবলীতে (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) মোট ১৯ বার যথাক্রমে ১৬ ও ৩ বার শব্দটি ব্যবহার করেছেন। চিন্তাতরঙ্গিণী কাব্যে শব্দটি অব্যবহৃত এবং বীরবাহু কাব্যে মোট ৩ বার শব্দটির ব্যবহার দেখি। বিস্ময়ের কথা, তাঁর সুবিশাল বিপুলায়তন মহাকাব্য বৃত্রসংহার-এ শব্দটির প্রত্যক্ষ ব্যবহার নেই, যদিচ বেণু শব্দটি এক-বার ব্যবহৃত হতে দেখি।

অবশ্য, হেমচন্দ্র একটি সুন্দর বিশেষণমালা রচনা করেছেন শব্দটিকে ঘিরে: 'মধুর ললিত মোহন বাঁশরী'। অন্যান্য কবির মতো তিনিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাঁশির সমার্থক শব্দ-গুলি ব্যবহার করেছেন।

একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, মধুসূদনের সমকালীন কবিসমাজের মুখ্য ও গৌণ অন্যান্য কবিদের রচনাতেও এই শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। তবে, সম্ভবত সকলেই লৌকিক প্রচলিত অর্থেই শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন।

দৃষ্টান্ত—
১. আন বীণা, বেণু, মন্দিরা মুরজ (১৬ সর্গ, বৃত্রসংহার, ২য় খণ্ড)
২. খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই? (অন্নদার শিবপূজা, কবিতাবলী ১ম খণ্ড)
৩. উঠুক মানব-কণ্ঠে ললিত-সঙ্গীত/বাজুক অর্গান বাঁশী
(শিশুর হাসি/কবিতাবলী ২য় খণ্ড)

শেষের দৃষ্টান্তটিতে বাঁশি শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী[১৫] তাঁর পাঁচটি কাব্যে নিম্নলিখিতরূপে শব্দটি ব্যবহার করেছেন—
নিসর্গসন্দর্শন—০
বঙ্গসুন্দরী—৭
সারদামঙ্গল—৩
সাধের আসন—১০
সঙ্গীত শতক—২
মোট: ২২ বার

সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম তিনটি সর্গে ১টি ক'রে, চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গে শব্দটির প্রয়োগ নেই। সাধের আসন কাব্যের মোট ১০টি সর্গের মধ্যে ১ম, ৩য়, ৮ম ও ১০ম সর্গে শব্দটির ব্যবহার হয়নি। ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম সর্গে ১ বার করে এবং ৪র্থ সর্গে ৪ বার ও ৭ম সর্গে ২ বার ব্যবহৃত। মোহন, মধুর ও ললিত—মূলত এই তিনটি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

[১৪] হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড)। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ।
[১৫] বিহারীলাল রচনাসম্ভার—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত। মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত।

১. পাখিরা ললিত বাঁশরী বাজায় (১০ সংখ্যক, বঙ্গসুন্দরী)
২. এ নহে প্রলয়ধ্বনি, বাঁশরী-বাজনা (৩য় সর্গ, সারদামঙ্গল)
৩. কি যেন মধুর বাঁশী সদাই শুনিতে পাই (২য় সর্গ, সাধের আসন)
৪. বাজায় মধুর বাঁশী/অলির সুধা গুঞ্জনে! (৯৯ সংখ্যক, সঙ্গীত শতক)

বিহারীলালের সমকালীন কবিবৃন্দও অল্পবিস্তর এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, প্রচলিত অর্থেই। এবং এই শব্দটিকে ঘিরে বিশেষণ প্রয়োগের যে রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বা ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল, রবীন্দ্র-পূর্ব কবিসমাজের রচনায় তারই গতানুগতিক অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। এই সব গৌণ কবিদের রচনায় শব্দটির ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে না।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রকাব্যে বাঁশি শব্দটির ব্যবহার কী পরিমাণে ও কীভাবে হয়েছে, সংখ্যার দিক থেকে তার একটি তালিকা দেওয়া গেল,

কাব্যগ্রন্থের নাম	কতবার বাঁশি (বা সমার্থক শব্দ) ব্যবহৃত	কাব্যগ্রন্থের নাম	কতবার বাঁশি (বা সমার্থক শব্দ) ব্যবহৃত
সন্ধ্যাসঙ্গীত	৩	শিশু ভোলানাথ	১৫
প্রভাতসঙ্গীত	৫	পূরবী	৩১
ছবি ও গান	১০	লেখন	২
ভানুসিংহের পদাবলী	১৮	মহুয়া	১৩
কড়ি ও কোমল	৪২	বনবাণী	৫
মানসী	১২	পরিশেষ	১৯
সোনার তরী	৪	পুনশ্চ	১৯
চিত্রা	১২	বিচিত্রিতা	৪
চৈতালী	২	শেষ সপ্তক	৪
কণিকা	১	বীথিকা	১৬
কথা	১০	পত্রপুট	৫
কাহিনী	০	শ্যামলী	১২
কল্পনা	৩	খাপছাড়া	২
ক্ষণিকা	১২	ছড়ার ছবি	৩
নৈবেদ্য	১	সেঁজুতি	১
স্মরণ	১	প্রহাসিনী	৩
শিশু	৪	আকাশপ্রদীপ	৪
উৎসর্গ	৯	নবজাতক	২
খেয়া	১৪	সানাই	৮
গীতাঞ্জলি	১৪	রোগশয্যায়	০
গীতিমাল্য	২৪	আরোগ্য	০
গীতালি	৭	জন্মদিনে	৩
বলাকা	৮	ছড়া	০
পলাতকা	১৩	শেষ লেখা	৩

মোট ৩৫৬ বার ব্যবহৃত

কাব্য ছাড়া, গীতবিতান-এ পৃথকভাবে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে সর্বসমেত ২২৫ বার, যথাক্রমে ৩০, ১৫০ ও ৪৫ বার বাঁশি বা তার সমার্থক শব্দগুলি, বাঁশিই বেশী, ব্যবহৃত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গানে এই শব্দটি মোট ৫৭১ বার ব্যবহৃত হতে দেখি। প্রায় সমগ্র বৈষ্ণবকাব্যের সমান। এদিক থেকে, 'বাঁশি' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় শব্দ; গভীরতর অর্থে সঙ্কেত-শব্দও বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে দেখা গেল, এই শব্দটির অর্থ-প্রসার ঘটেছে, এর ফলে অভিধানার্থ ছাড়িয়ে গেছে। জয়দেবের আমল থেকে এতোকাল যে লৌকিক অর্থবহ হয়ে শব্দটির ব্যবহার চলে আসছিল, এবার, এতোদিনে, একদিকে যেমন সেই লৌকিক অর্থের বস্তুধর্মিতা ঘুচিয়ে শব্দটি হয়ে উঠল আত্মধর্মী, অন্যদিকে তেমনি অর্থান্তরে হয়ে উঠল সংকেতময়। তাছাড়া, রবীন্দ্র-পূর্ব কাব্যে, বিশেষত বৈষ্ণবকাব্যে বাঁশি শব্দটিকে ঘিরে যেমন একটি বিশেষ ভাবানুষঙ্গ রচিত হয়েছে, রবীন্দ্র-কাব্যে প্রবেশ করে শব্দটি আর তেমন সীমাবদ্ধ রইল না; বিচিত্র-রূপে, বিচিত্র ভাবানুষঙ্গের ভিতরে, নব নব ক্ষেত্রে তার আত্মপ্রকাশ ঘটল। এইভাবেই শব্দটির ভাবগত ও ব্যবহারগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে: এই হচ্ছে শব্দটির বিবর্তনের মূল কথা।

রবীন্দ্র-কাব্য থেকে শব্দটির বিচিত্র প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করা গেল :

১. এমন জোছনা সুমধুর/বাঁশরি বাজিছে দূর দূর
(সুখের বিলাপ/সন্ধ্যাসঙ্গীত)

২. এই বিশ্বজগতের/মাঝখানে দাঁড়াইয়া/বাজাইবি সৌন্দর্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবনপথে/খুঁজিয়া চলিব তোরে/প্রাণমন হইবে উদাসী।
(প্রতিধ্বনি/প্রভাতসঙ্গীত)

৩. শূন্য গৃহ জনহীন/পড়ে আছে কত দিন/আর হেথা বাঁশি
নাহি বাজে। (স্মৃতি-প্রতিমা/ছবি ও গান)

৪. যে জন পড়ে থাকে/একা ডাকে মরণে,/সুদূর হতে হাসি
আর বাঁশি শোনা যায়। (ক্ষণিক মিলন/মানসী)

৫. মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি/বিশ্বের প্রান্তর মাঝে;
(যেতে নাহি দিব/সোনার তরী)

৬. সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। (এবার ফিরাও মোরে/চিত্রা)

৭. যেদিন জগতে চলে আসি
কোন্ মা আমাকে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি। (এবার ফিরাও মোরে/চিত্রা)

৮. কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা/শুনেছিল দুটি বক্ষোমাঝে
বাসনা বাঁশরি (বসন্ত/কল্পনা)

৯. বিশ্ব-বাঁশির ধ্বনির মাঝে/যেতে কি সাধ আছে? (যথাস্থান/ক্ষণিকা)

১০. দুটি চক্ষে বাজিবে তোমার/নবরাগের বাঁশি, (অসাবধান/ঐ)

১১. আমি শুধু একলা প্রাণে/অতি সুদূর বাঁশির তানে/গেঁথেছিলেম
আকাশ ভ'রে/একটি কাহার নাম। (বিরহ/ঐ)

১২. এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক/তব নয়নের পরসাদ; (আবির্ভাব/ঐ)
১৩. ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর;/তুমি যে বাজাও
ব্যাকুল বাঁশরী। (৮ সংখ্যক, উৎসর্গ)
১৪. আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি/আমার প্রাণে বাজালো
আজ বাঁশি (বিদায়/খেয়া)
১৫. কত মায়ার বাঁশির সুরে/ডাকছে আমায় মিছে।
(৬৩ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি)
১৬. জীবন লয়ে যতন করি/যদি সরল বাঁশি গড়ি/আপন সুরে
দিবে ভরি/সকল ছিদ্র তার। (১২৫ সংখ্যক, ঐ)
১৭. কত যে গিরি কত যে নদীতীরে/বেড়ালে ছোটো
এ বাঁশিটিরে/কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে/কাহারে তাহা
কব। (২৩ সংখ্যক, গীতিমাল্য)
১৮. পথিকেরা বাঁশি ভ'রে/যে সুর আনে সঙ্গে ক'রে/তাই সে
আমার দিবানিশি/সকল পরাণ লয় রে কাড়ি। (৭৪ সংখ্যক/ঐ)
১৯. দিন-রজনীর বাঁশি পুরে/যে গান বাজে অসীম সুরে/তারে
আমার প্রাণের তারে/বাজানো চাই। (৭৮ সংখ্যক/ঐ)
২০. শেষ বাজিয়ে দাও গো চিতে/অশ্রুজলের রাগিণীতে/পথের
বাঁশিখানি তোমার/পথতরুর মূলে। (৬৬ সংখ্যক, গীতালি)
২১. আনন্দগান উঠুক তবে বাজি/এবার আমার ব্যথার
বাঁশিতে। (২০ সংখ্যক, বলাকা)
২২. বুকে যে তার বাজল বাঁশি বহু যুগের ফাগুন-দিনের সুরে—
(পলাতকা/পলাতকা)
২৩. সাগরপারের নিকুঞ্জ হতে এনেছি বাঁশরিখানি। (ইটালিয়া/পূরবী)
২৪. নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনি/করবে ঘোষণ প্রেমের
উদ্বোধনী, (অর্ঘ্য/মহুয়া)
২৫. যে নিশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুর হাসিতে/তারে আমি ধরেছি
বাঁশিতে। (বর্ষশেষ/পরিশেষ)
২৬. বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে/ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে/
এক বৈকুণ্ঠের দিকে! (বাঁশি/পুনশ্চ)
২৭. বৈকুণ্ঠের সুর সবে বেজে ওঠে মর্তের গগনে/মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন
রচে খেলাঘর। (মাটিতে-আলোতে/বীথিকা)
২৮. এমন সময় বাজে তোমার বাঁশি/ভরা জীবনের সুরে।
(বাঁশিওয়ালা/শ্যামলী)
২৯. দুঃখ দেখা দিয়েছিল/খেলায়েছি দুঃখনাগিনীরে/ব্যথার বাঁশির
সুরে। (৭ সংখ্যক, প্রান্তিক)
৩০. আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার ওঠে যত ধ্বনি/আমার বাঁশির
সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি, (১০ সংখ্যক, জন্মদিনে)

রবীন্দ্র-কাব্যে (ও গানে) শব্দটির বিচিত্র প্রয়োগের এ অতি অল্প দৃষ্টান্ত মাত্র, কিন্তু

এই আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট। বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যা না করেও বলা যায়, এই দৃষ্টান্তগুলিতে বাঁশি শব্দটির প্রয়োগ প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ভিন্ন, স্বতন্ত্র। এবং, প্রায়শই তা' লৌকিক অভিধার্থ ছাড়িয়ে এমন এক সূক্ষ্ম সংকেতময় ভাবধর্মী অর্থ বহন করছে, যা রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কাব্যে অপরিচিত ছিল। হয়ত বা অভাবনীয়। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই, তিনি এই শব্দটির পরিসীমা ও পরিমণ্ডল বহুদূর ব্যাপ্ত করেছেন।

অবশ্য, একথা নয় যে, তিনি লৌকিক অর্থে এই শব্দটি কোথায় ব্যবহার করেননি। তারও প্রয়োগ আছে রবীন্দ্রকাব্যে, অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু লক্ষণীয়, প্রায়শই শব্দটি সাংকেতিক ও প্রতীক-ধর্মী, নতুন নতুন অর্থে ও রূপে অভিব্যক্ত। এবং, যেখানেই কবি একটু বেশী আত্ম-মনস্ক, কিংবা গভীরতর অনুভবে আত্মমগ্ন, সেখানেই বাঁশি শব্দটির ব্যবহার অব্যবহিতভাবে এসেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে (ও গানে) কতো যে বিচিত্র প্রয়োগ ও প্রকাশ ঘটেছে শব্দটির, সে বিষয়েই একটি স্বতন্ত্র আলোচনা হতে পারে।

অতঃপর বিষয়টির পর্যালোচনা। দেখা যাচ্ছে, এই শব্দটি (বা তার সমার্থক শব্দ) বাংলা কাব্যের আদিলগ্ন থেকেই আধুনিক কাল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এবং এই শব্দটিকে কেন্দ্র ক'রে একটি ঐতিহ্য রচিত হয়েছে। প্রায় সব কবিই, মুখ্য অথবা গৌণ, কোনো-না কোন প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে না-ক'রে পারেননি। এদিক থেকে বাংলা কবিতার শব্দ-ভান্ডারে অথবা কবিভাষার ক্ষেত্রে শব্দটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রথমেই যে কথাটা মনে হয়, তা হচ্ছে এই, বাঁশি শব্দটি আখ্যায়িকা-মূলক কাব্যে বেশী ব্যবহৃত না হলেও, গীতিধর্মী কবিতায় বা গীতিকবিতায় শব্দটির ব্যবহার বহুল। এইটেই হয়ত স্বাভাবিক। কেননা, গীতিকবিতার প্রাণধর্মের ও প্রকৃতির সঙ্গে এই শব্দটির যোগ নিগূঢ়। হয়ত সেই কারণেই বাংলা গীতিকবিতার সঙ্গে বাঁশি-শব্দটির আত্মীয়তা এতো গভীর, যেন এই শব্দটির ভিতরেই বাংলা গীতিকাব্যের আত্মার অধিষ্ঠান। তাই দেখবো, কবিস্বভাবে যে কবি একটু বেশী আত্মগত বা আত্মমনস্ক, যা গীতিকবির মৌল লক্ষণ, তিনি তত বেশী এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। জ্ঞানদাস থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এমন অনেক কবির কবি-স্বভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাই এই শব্দটি বিশেষ সহায়ক। এদিক থেকে, এই শব্দটি বাঙালী কবির স্বভাব-নির্ণয়ের চাবিকাঠি।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, মূলত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের বা কৃষ্ণের রূপ-বর্ণনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে এই শব্দটিকে কেন্দ্র ক'রে একটি ভাবানুষঙ্গ রচিত হয়েছিল। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে কেন্দ্র ক'রে জয়দেবের হাতেই বাংলা রোমান্টিক কাব্যের বীজ রোপিত হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই, সমগ্র বৈষ্ণব কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিক-মূর্তির অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে শব্দটির ব্যবহার চলে এসেছে। আবার, পরবর্তীকালে যখনই কোন কবি প্রেমের কথা ভেবেছেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ এসেছে এবং বাঁশি শব্দটির ব্যবহার অব্যবহিত-ভাবেই ঘটেছে। এইভাবে, বাঁশি ও প্রেম অন্যোন্য হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ যখনই কোন কবি, বিশেষত মধ্যযুগের কোন কবি, প্রেমের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি শব্দটির কথাও মনে হয়েছে, যেন, এই শব্দটি ছাড়া প্রেমের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একথা অবশ্য আংশিকভাবে আধুনিক কবিদের, অন্তত প্রথম যুগের, ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন ও বিহারীলালের ক্ষেত্রে। নচেৎ, এ'দের মন ও মননের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, শব্দটির ব্যবহার এ'দের কাব্যে প্রত্যাশিত, তা হয়ত বলা যায় না। দেখা যাচ্ছে, য়ুরোপীয় কাব্যধারার পাঠে অভ্যস্ত মধুসূদনের মতো কবিও প্রেমের বর্ণনা করতে গিয়ে গতানুগতিক-

ভাবে বা ঐতিহ্য অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের কথা ভেবেছেন। স্বভাবতই বাঁশি শব্দটিও ব্যবহার করেছেন, না ক'রে পারেননি। এইভাবেই এই শব্দটিকে কেন্দ্র ক'রে এক বিশিষ্ট ভাবমণ্ডল বা আবহ গ'ড়ে উঠেছে।

আবার, শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকাকে কেন্দ্র ক'রে রচিত প্রেমমূলক এই বিষয়বস্তু ব্যতিরেকেও শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, সেটা ঘটেছে মূলত আধুনিক গীতিকাব্যে। মধ্যযুগের কবি-সম্প্রদায় ঐ বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ হয়ে শব্দটির ব্যবহারের কথা ভাবতে পারতেন না, কিন্তু আধুনিক কালে এই মধ্যযুগীয় মানসিকতার অবসান ঘটার ফলে শব্দটির বন্ধন-মুক্তি ঘটেছে বলতে হবে। বিহারীলালের কয়েকটি কবিতায় তার সূক্ষ্ম আভাস রয়েছে। যেমন,

তুমিই প্রাণেতে পশি'
জাগায়েছ পূর্ণশশী,
কি যেন মধুর বাঁশী সদাই শুনিতে পাই!

অথবা,

দিগঙ্গনা দিকে দিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে।
বাতাসে বাঁশীর স্বরে
প্রাণ খুলে গান করে। ইত্যাদি।

অবশ্য, এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান। 'ভানুসিংহের পদাবলী'র কথা বাদ দিলে, প্রায় সর্বত্রই পূর্বোক্ত বিষয়বস্তু-নিরপেক্ষ রূপে শব্দটি ব্যবহৃত। অর্থের দিক থেকেই নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও শব্দটির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

পুনরায়, শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে তাকালে দেখবো, জয়দেব ও তাঁর অনুগামী বৈষ্ণব কবিসমাজ শব্দটি মূলত লৌকিক বস্তুগত অর্থেই প্রয়োগ করেছেন, যদিচ বাঁশির সুরের বা বংশীধ্বনির একটা দার্শনিক ব্যাখ্যাও সম্ভব। যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ প্রতীক্ষা করছেন শ্রীরাধার জন্য। শ্রীরাধা আসেন না, তিনি যে গৃহ-বন্দিনী কুলবধূ। অকস্মাৎ যমুনার তীর থেকে শোনা গেল বাঁশির স্বর, মোহন বংশীধ্বনি। সব বাধা তুচ্ছ ক'রে শ্রীরাধা তখন অভিসারে বেরিয়ে এলেন। এর পরেই বৈষ্ণব-দার্শনিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলবেন, শ্রীরাধা হচ্ছেন জীবাত্মার প্রতীক, যে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ পরমাত্মার আহ্বানে সব বন্ধন ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তাহলে, এই দার্শনিক ব্যাখ্যা অনুসারে বাঁশি শব্দটির ব্যবহার লৌকিক অর্থ ছাড়িয়ে অনেকাংশেই প্রতীক-ধর্মী হয়ে পড়েছে। কিন্তু, তথাপি, এর দার্শনিক ব্যাখ্যা যা'ই হোক না কেন, রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কাব্যে শব্দটি প্রধানত স্থূল বস্তুগত প্রচলিত অর্থেই গৃহীত হয়ে এসেছে।

উনিশ শতকের বাংলা কাব্যের ভাষায় য়ুরোপীয় কাব্যের প্রভাবের পরিমাণ যে কতো গভীর, তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় হলেও, দেখা গেল, সেই প্রভাবের সর্বপ্রথম সার্থক প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্যেই ঘটেছে। মধুসূদন য়ুরোপীয় কাব্যে পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও, বলতে বাধা নেই, য়ুরোপীয় নব্য-রোমান্টিক কাব্যধারার ভাষা, যা আধুনিক বাংলা কাব্য-ভাষার বনিয়াদ, আয়ত্ত করতে পারেননি, যদিচ বায়রন শেলী, মুর প্রমুখ রোমান্টিক কবিদের কাব্য তাঁর কবি-স্বভাবের বা রুচির বিন্দুমাত্র প্রতিকূল ছিল না। তিনি আসলে যে ভাষা বা বাক্‌শৈলী আয়ত্ত করেছিলেন তা' ক্লাসিক কাব্যের ভাষা, যে ভাষার সঙ্গে আধুনিক কাব্যভাষার বৈলক্ষণ্য বহুল পরিমাণেই। শুধু কবি-কল্পনার বিস্তারের ক্ষেত্রেই নয়, কাব্যভাষার নিজস্ব একটা ব্যঞ্জনার দিক আছে যা আধুনিক বিশেষত ইংরেজি লেক-স্কুলের কাব্যের ভাষায় মূর্ত। এই কবি-

সমাজের কাব্যভাষার স্বাদ ও মেজাজ স্বভাবতই পূর্ববর্তী পোপ-ড্রাইডেন, চাই কি মিলটনের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। আমার নিজের গভীর বিশ্বাস, উনিশ শতকের তরুণ বাঙালী ছাত্র ও কবিদের মানসিক গঠন ছিল রোমান্টিক। এবং, দেখা যাবে, তাঁরা প্রায় সকলেই রোমান্টিক কাব্য-রসেই নিজেদের দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, তখন এ'দের সামনে একদিকে ছিলেন রোমান্টিক শেক্সপীয়র্, অন্যদিকে স্কট বা বায়রন মুর প্রমুখ কবি। পাঠ্যতালিকায় মিলটনের স্থান ছিল কিন্তু তরুণ মনে এই মহামান্য কবির স্থান কতোখানি ছিল, তা বলা শক্ত। মধুসূদনের দীক্ষাও এই রোমান্টিক স্কুলেই। এমনকি ঔপন্যাসিক বঙ্কিম-চন্দ্রও এর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু কেমন ক'রে মধুসূদনের মাথায় মহাকবি হবার সাধ জাগল জানি না, দেখা গেল, তিনি প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক স্কুলে দীক্ষা নিয়েও গুরু ক'রে বসলেন মিলটনকে; মিলটনকে সামনে রেখে মহাকাব্যের তাবৎ কবিসমাজকে। হোমার, বাল্মীকি, কালি-দাস, কৃত্তিবাস প্রমুখ কবিসম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণা প্রার্থনা করলেন। তাই দেখলাম, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দাঁড়িয়েও মধুসূদন যে কাব্যভাষা উপহার দিলেন, সে ভাষা বহুলাংশে স্থূল, সামান্য পরিমাণেও সংকেতধর্মী বা ব্যঞ্জনাধর্মী নয়। তাই দেখবো, বাঁশি শব্দটির ব্যবহারে তিনি প্রচলিত অর্থই দেখলেন, তার গভীরে কোন নতুন সংকেত বা ব্যঞ্জনা তিনি ফোটাতে পারলেন না।

অথচ, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, সংকেতময়তা, কুন্তকীয় বক্রোক্তির মতো ইংগিতময় বাচনভঙ্গীই আধুনিক বা একালের কাব্যভাষার মৌল লক্ষণ। পরে অবশ্য এসেছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কথিত 'Language of the Common People' সদৃশ ভাষার আদর্শ। আধুনিক-পূর্ব কাব্য-ভাষায় Tenor ও Vehicle[১৬]এর মধ্যে কোন সমস্যা ছিল না, একালে এ দুয়ের মধ্যে গড়ে উঠল উঁচু পাঁচিল। আগেকার যুগে কবিরা বলতেন সরাসরি, অভিধার্থ ছাড়িয়ে শব্দের গূঢ়ার্থ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ ছিল না তাঁদের। একালের কবিরা আর তাঁদের বক্তব্য সরাসরি বলতে চাইলেন না, কাব্যভাষার অন্বয় বদলে দিলেন। এমনভাবে বললেন যা পাঠকের কল্পনাকে উদ্দিপ্ত করে অথচ সে-ভাষা তার কাছে দুরধিগম্য। তখন থেকেই, একালে, সম্ভবত শব্দের সাংকেতিকতার পালা সুরু, আধুনিক ব্যঞ্জনার সূত্রপাত। এবং এই সূত্রেই হয়ত-বা দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন উঠেছে।

আধুনিক কাব্যভাষার এই আদর্শ বা দীক্ষা যে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় কাব্যপাঠ থেকেই পেয়েছিলেন, এমন অনুমান কি ভ্রান্ত? তাঁর কাব্যভাষা প্রথম দিকে কিছুকাল অস্ফুট থেকে গেলেও ক্ষণপরে প্রভাতের আলোর মতো সহজভাবে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এবং তার মধ্যেই আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি অনুভব করা গেল, বা সমতুল্য স্বাদ পাওয়া গেল। তাঁর কাব্যভাষা পুরোপুরি কাব্যিক ভাষা, যার মৌল লক্ষণ সূক্ষ্ম ইংগিতময়তা, সংকেত বা প্রতীকধর্মিতা এবং ব্যঞ্জনা। বস্তুত, বাঁশি শব্দটি মূলত এই কারণেই তাঁর হাতে হয়ে উঠল সংকেতধর্মী, নিল এক নতুন রূপ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের হাতে বহু ও বহুল ব্যবহৃত শব্দটি কয়েক শতাব্দী অতিক্রম ক'রে বিবর্তনের ভিতর দিয়ে নবরূপে নির্মিত হল, তার অর্থেরও পরিবর্তন ঘটল।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, অসংখ্য শব্দের মাঝে বাঁশি শব্দটি কি সত্যিই রবীন্দ্রকাব্যে কোন

---

১৬ *A Linguistic Guide to English Poetry* গ্রন্থে Geoffrey N. Leech বিশেষ অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন।

বিশেষ অর্থ বহন করছে, অর্থাৎ তা কি সত্যিই সংকেত-শব্দ[১৭] হয়ে উঠেছে? কেননা, এমন একটি সাদামাটা আটপৌরে শব্দের পক্ষে এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা দায়িত্ব পালন করা কঠিন বৈকি। কিন্তু, শব্দটির সত্যিই যদি এমন গুরুত্ব থাকে, তবে তার বিশেষত্ব কোথায়?

মিলটন তাঁর প্যারাডাইস্ লস্ট কাব্যেই 'all' শব্দটি মোট ৬১২ বার ব্যবহার করেছেন। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র কবিতা ও গানে এই শব্দটি ৫৮১ বার ব্যবহার করেছেন মাত্র। শেকস্পীয়র্ও fool শব্দটি ক্রমাগত ব্যবহার করেছেন। সংখ্যার দিক থেকে মিলটনের all-এর তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' শব্দ-ব্যবহার যত-না গুরুত্বপূর্ণ হোক, অর্থের দিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যে তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। উইলিয়ম্ এমপ্সন্ মিলটনের all সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন[১৮], ঠিক সেইভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত 'বাঁশি' সম্পর্কেও বলা যায়। বস্তুত, সামান্য একটি সহজ সরল শব্দ হয়েও তা সমগ্র রবীন্দ্র-জীবন ও কাব্যের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যে, শব্দটিকে রবীন্দ্রকাব্যে (ও গানে) একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে হয়। রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা ও স্বরূপ-উদ্ঘাটনের পক্ষে এই শব্দটি একান্তই অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথের মনের গভীরে ছিল একটি 'একা', এক নিঃসঙ্গ সত্তা। সেই সত্তাটিকে কবি মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করতে দিতেন। মাঝে মাঝে, সব সময়ের জন্য নয়। কিংবা বলা উচিত, সেই নিঃসঙ্গ সত্তাটিই মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করতো। অথচ বহুবিচিত্র কর্মময় জীবন তাঁর। এই দুটি সত্তার দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রজীবন সব সময় ঘড়িব পেন্ডুলামের মতো দুলে চলেছে। একদিকে বিচিত্র জীবনের আহ্বান, অন্যদিকে সেই নিভৃত সত্তার নীরব ডাক। একদিকে কবি আত্মবিস্মৃত, আর-একদিকে আত্মমনস্ক। যেখানে বিচিত্র জীবনের কলতানের প্রতিধ্বনি জেগেছে তাঁর জীবনে, সেখানে ব্যবহার করেছেন 'বীণা' শব্দটি। আর, যেখানে সেই নিভৃত আত্মগত সত্তাটির আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে, সেখানেই অবশ্যম্ভাবী ও স্বতোৎসারিত আবির্ভাব ঘটেছে 'বাঁশি' শব্দটির। কদাচিৎ প্রচলিত অর্থেও শব্দটি হয়েছে, কিন্তু সর্বত্র, রবীন্দ্রজীবনের ঐ দ্যোতনার প্রতীক হিসেবে, জীবনের গভীরতর সংকেতময় অনুভবের ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখি। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি তারই পরিচয় বহন করছে।

একথা হয়ত কবির নিজের কাছেও স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছিল। নিজের আত্মপ্রকাশের জন্য এমন একটি শব্দ তাঁর প্রয়োজন ছিল। এবং, এই শব্দটির ব্যবহারে তাঁর সেই সচেতন মনের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বস্তুত, সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য জুড়ে যে একটি আত্মগত গীতিময়তা উপলব্ধি করি, বাঁশি শব্দটি ক্ষণে ক্ষণে তারই উৎসার। রবীন্দ্রকাব্যের সর্বত্র একটি আত্মমনস্কতার ছবি বারবার চোখে পড়ে। এর থেকেই এসেছে আত্মমগ্নতা। আর, এই আত্মমগ্নতালব্ধ কবির যে জীবনচর্যা, তা গভীরতর অর্থে একক সুরের ধ্যান বা সাধনা। 'আমি পৃথিবীর কবি। যেথা তার ওঠে যত ধ্বনি/আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি!' তাই, রবীন্দ্রকাব্যে কবি যেখানেই আত্মমগ্ন, নিজের জগতে, সেখানেই বাঁশির প্রসঙ্গ এসেছে। এইভাবে, এই শব্দটিকে ঘিরে রবীন্দ্রকাব্যে এক বিশিষ্ট আবহ সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের

---

[১৭] Key word এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংকেত শব্দ' ব্যবহারের প্রস্তাব করা যেতে পারে।

[১৮] 'To be sure, its prominence in *Paradise Lost* is not surprising: the poem is about all time, space, all men, all angels, and the justification of Almighty. বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন উইলিয়ম্ এম্প্সন, 'Thus the word has a good many connections with the whole theme of the poem, though its meaning remains very simple.'

—The Structure of Complex Words—William Empson, Ch 4: *All In Paradise Lost*, pp 101-102. (1952)

বিরুদ্ধে, তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে সমালোচনাসূত্রে একসময় অভিযোগ উঠেছিল যে, তাঁর ধর্ম নাকি 'বাঁশির তালেই মোহিত।'[১৯] কবি তার উত্তরে যা ব্যাখ্যা বা আলোচনা করেছেন, তা 'মোহিত তানের' 'বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার'[২০] হলেও মূলত তাঁর মন্তব্যের মধ্যেই 'বাঁশির সুর' কথাটির ব্যাখ্যা রয়ে গেছে। এই প্রবন্ধেই তিনি তাঁর আত্মগত জীবনের বিশ্লেষণ করেছেন।

১৯ আত্মপরিচয়, ৩য় প্রবন্ধ। দ্রষ্টব্য : গ্রন্থপরিচয়

২০ তদেব।

রাজনগর

অমিয়ভূষণ মজুমদার

বাগচী বললো,—এখন কি আমরা বিশ্রাম করবো ডার্লিং?

—যদি কাজের কথা মনে না হয়। কেট হাসলো।

—বেশ লাগছে। সুন্দর লাঞ্চ, সুন্দর আলাপ। কেমন লাগলো কীবলকে?

—মিশুক, না?

বাগচী লক্ষ্য করলো না একটা হাল্কা চিন্তার ছায়া কেটের ভ্রূতে।

সে বললো,—অন্যদিকে দেখো, কেট, মানুষ আবার তার ঈশ্বরকে ফিরে পাচ্ছে। নিছক অভ্যাসের ব্যাপারের চাইতে বেশী। ইংল্যান্ডের যাঁরা রোম্যান ক্যাথলিক নিদেন অ্যাংলো ক্যাথলিক হচ্ছেন, কলকাতার যাঁরা খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম হচ্ছেন, তাঁরা একটা পিপাসা নিয়ে চলেছেন —এমন মনে হয় না? মনে হয় না যে কি লন্ডনে, অক্সফোর্ডে, কি কলকাতায় যেন একই ঈশ্বরের প্রভাবে মানুষ ধর্মের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। একটা কথা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়নি বিলেতের ওরা ইন্টারশেসনকে মূল্য দেন কি না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ যেন তেমন এক অবস্থা যখন মানুষমাত্রেই বলবে গড্ ইজ্ ইন হিজ হেভেন্ অলস্ রাইট উইথ দা ওয়ার্লড। কি কলকাতায় কি ইংল্যান্ডে সে সময়ে ধর্মই, ধর্মচিন্তা, ধর্ম আন্দোলনই প্রাধান্য পাচ্ছিলো যেন একই চন্দ্রের আকর্ষণে বিভিন্ন স্থানের জলরাশি উদ্বেল হয়।

পরে একদিন বাগচী এই প্রশ্ন তুলেছিলো : বিলেতের ইভাঞ্জেলিক্স আন্দোলন তাদের দেশের সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। মধ্যবিত্তদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা তার পিছনে। কলকাতায়? এখানে এই দেশে কেউ কি বলবে না, ধর্ম আছে, যথেষ্ট ধর্ম আছে। তখন তার মন কালো হওয়ায় সে ধর্মআন্দোলনটাকে বিলেতিআনা বলে অনুভব করেছিলো। বিলেতে যা হচ্ছে এখানে তা হক এমন বিলেতিআনা। কিন্তু এ ভাবনা পরে।

নয়নতারা বললো,—দূরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাই কি তোমার শীকারের সঙ্গী?

ইতিমধ্যে কখন ঘোমটা উঠেছে খোঁপা ঢেকে। নয়নতারা একটা হাতে ঘোমটার দুপাশ ধরলো, তাতে রগ, কান, চিবুক আর একটু ঢাকা পড়লো।

—ওদিকে হাতি ক্রমশই লোকগুলির দিকে এগোচ্ছে।

নয়নতারা বললো,—রাজকুমার, শুনেছি কুমীর শীকার নাকি জলের বুকে করতে হয়। ওই সরু সরু নৌকোগুলোকেই ব্যবহার করা হবে?

দূরে বিলের বুকে সরু সরু কয়েকটি নৌকা বটে।

নয়নতারা আবার বললো,—জানো কুমীর ইচ্ছা করলেই কাঠের গুঁড়ি হতে পারে।

রাজু বললো,—শুনেছি বাঘও ঝোপঝাড় হতে পারে।

—জানো দেখছি। কিন্তু—

—কি কিন্তু?

—আমি কিন্তু ক্ষত্রিয়া নই। দোহাই তোমার, রাজকুমার।

রাজু দেখলো নয়নতারার ঝুঁকে পড়া মুখটায় পাড়ের ঘের বাঁহাতে চিবুকের উপরে ধরা। ঠোঁট দুটো হাসছে। কিন্তু চোখ দুটি যেন বেশী টানা আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। নয়নতারা এই প্রথম রাজুর হাতের উপরে হাত রাখলো যেন স্পর্শেও তেমন স্নিগ্ধ কিছু বলবে। চাপা গলায় বললো—এটুকুই বিনতি।

কিন্তু ততক্ষণে হাতি দেখে গ্রামবাসীরা হৈচৈ করে এগিয়ে এলো।

নয়নতারা বললো,—আর কখনও মই ছাড়া হাতি বার করার কথা ভেবো না। কি মুস্কিল!

রাজু নামলো শুঁড় বেয়ে। মাটিতে দাঁড়িয়ে হেসে বললো—তা হলে ঠাকুরাণী তোমার নতুন পত্তনীটাকে পছন্দ হয় কিনা তা দেখো। মাহুতকে বললো,—কাছারীতে তহশীলদার না থাকে অন্য কেউ থাকবে, মোড়লদের বাড়িতে খবর দিও, সাহেবান কাছারীর খাস কামরায় থাকবেন। আমরাও কাছারীর ঘাটে উঠবো বিকেলে।

কেউ কেউ বলে কুমীরের নানা জাত আছে এবং তারা নাকি হিংস্র। তাদের গায়ের চর্ম বর্ম, চোয়ালে বসানো সারিসারি বল্লমের ফলা, এবং জলের তলায় ডুবো জাহাজের গতিবিধি—এসবই নাকি তার গোপন হিংস্রতার কিছু কিছু প্রমাণ যা গোপন রাখতে পারেনি। কিন্তু কুমীর যে বোকা সে বিষয়েও অনেক গল্প আছে, বাঁদর, শিয়াল কার কাছেই না সে ঠকেছে। সুতরাং মানুষের সঙ্গে যারা সশস্ত্র এবং বন্দুকও আছে তারা যখন দলবদ্ধ তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাময়িকভাবে আতঙ্কজনক হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তীব্র ব্যথা যা সমস্ত শিরা উপশিরা স্নায়ুকে পাগল করে তোলে, লুকানোর পালানোর চেষ্টা যা শরীরের সব যন্ত্রকে একসঙ্গে পুরোদমে চালাতে চেষ্টা করে, তারপরের সেই বিস্ময় যখন কোন যন্ত্র চেষ্টা সত্ত্বেও কোনদিনই যেমন অচল অকেজো দেখা যায়নি তার চাইতেও অকেজো হয়ে যায়, আর নিজের চারপাশেই সেই রংটা দেখা দেয় জলে যা খাদ্য সংগ্রহের সার্থক চেষ্টার লক্ষণ হিসেবেই তার পরিচিত, এবং তখন খাদ্যসংগ্রহ হয়েছে কি না হয়েছে, শরীরের ভিতরের সেই জ্বালা খাদ্যসংগ্রহের সার্থকতাবোধই কি না এমন অনুভব করতে করতে রোদ পোহানোর অনুভূতি আর আগ্রহ এসে মিশে যায় সেই অনুভূতিতে, স্থির হয়ে যায় কুমীরটা।

কিন্তু এর বেশী কুমীরের কথা আমরা কি বলতে পারি?

আর বিল, তা যেন একটা আলাদা জগৎ। কোথাও দুচার দশ বিঘা পরিমাণ দাম। দামে কাষা, হোগলা প্রভৃতি ঘাস তো আছেই, আসসেওড়া, আকন্দ, এমন কি বাবলাও জন্মেছে কোথাও কোথাও। কোন কোন ক্ষেত্রে এদিকের অধিবাসীরা দাম কেটে জলের গলিপথ বার করেছে। অন্য কোথাও টলটলে পরিষ্কার জল। সে জলে কোথাও কলমি, কোথাও শাপলা, অন্য কোথাও দশবিশ বিঘা পরিমাণ পদ্মবন। দামের উপরে বক, হাড়গিলে, মাছরাঙা; কলমি, শাপলার মাঝে মাঝে পানকৌড়ি আর মাছরাঙা।

রাজু যেখানে দাঁড়িয়েছিলো তার কাছাকাছি পারের সমান্তরাল একটা চর জেগেছে যেন। চরটার ওপারে অন্তত এক ঝাঁক বুনোহাঁস।

বিলমহলে রাজুদের কাছারী আছে বটে। গ্রামের লোকেরা বললো তা প্রায় একক্রোশের পথ হবে। কিন্তু কুমীরের আড্ডা সামনের বাঁকটা থেকেই দেখা যাবে।

রাজু জানালো কাছারিতে তার কোন কাজই নেই, এখনই বরং কুমীরের খোঁজে যাওয়া যেতে পারে। গ্রামের লোকেরাও বললো সেটাই ঠিক হবে। রোদের তাপ কমলে কুমীরকেও

ডাঙায় পাওয়া যাবে না। তারাই স্থির করলো যতলোক জমেছে সবাই গেলে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে, কুমীর তো এক চোখ খুলেই ঘুমায়। সুতরাং শালতি আর তার সঙ্গে দুখানা ডোঙ্গা মাত্র যাবে। রাজুর সামনের যে চরের কথা বলা হয়েছে সেই চর আর এ পারের মধ্যে বিলের জল একটা ছোটখাট নদীর মতো। শালতি বা ডোঙ্গার পক্ষে যথেষ্ট গভীরও বটে।

শালতি একটু এগিয়ে যেতে রাজু দেখতে পেলো চর একটাই নয়, আর প্রথমটিই সব চাইতে উল্লেখযোগ্য নয়। কোন চর পারের সমান্তরাল, কোনটি বা কোনাকুনি পারের দিকে এগিয়ে এসেছে। যেখানে চরটা বড় এবং খালের পরিসর বরং কম সেখানে দু-তিনটি বাঁশ পাশাপাশি বেঁধে সাঁকো করা হয়েছে। সাঁকোগুলো উঁচুতে এখন, কারণ খালের জল কম। এমন একটা সাঁকোর নিচে দিয়ে শালতিটা অনায়াসে গলিয়ে গেলো।

এদিকের চরগুলোর বৈশিষ্ট্য আছে। নদীর নয় যে কোথায় বালি আর কোথায় পলি খুঁজতে হবে। যেদিন চর জাগে সেদিনই চাষ দেয়া যায়, কলাই আর ধান হবেই। যেখানে চরটা বড়ো সেখানে চাষ হয়েছে। কোন কোন চরে দুচারটি ছোট ছোট ঘরও চোখে পড়ছে।

রাজুর ট্যাঁকঘড়িতে তখন বেলা দুটো পার হয়েছে। দিনটা পরিষ্কার। অনেক দূর পর্যন্ত খোলা আকাশ চোখে পড়ছে। নীল উঁচু আকাশে কোথাও সাদা তুলো ছড়ানো। দুএক জায়গায় উত্তরপূর্বেই হবে হাল্কা কালোর কুণ্ডলী। টিটিভের ডাক কানে এলো একবার।

কোথাও জল একেবারে শান্ত কাচের ফলকের মতো। অন্য কোথাও, যেখানে জলটা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে সেখানে, বিগৎ পরিমাণ উঁচু ঢেউ উঠছে বাতাস লেগে। কোথাও শালতি দেখে জলের ধারের হাড়গিলে আকাশে উঠলো বিরক্ত হয়ে। কোথাও চাষ থামিয়ে কৃষক জলের ধারে এগিয়ে এলো শালতি-ডোঙ্গার ছোট বহরটাকে ভালো করে দেখতে। একবার একটা চর ঘুরে যেতে না বুঝে এক ঝাঁক বুনো হাঁসের মধ্যে গিয়ে পড়লো শালতি। ডাহুক, হাঁস, করণ্ডের সে কি প্রতিবাদ!

রাজুর সঙ্গীরা স্থির করেছিলো কুমীরকে তারা গ্রামের বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করবে। কারণ দেখিয়েছে—তাড়া খেলে গভীর জলের দিকেই ঝুঁকবে সে। যদি বা গ্রামের দিকে যায় সেখানে যে জোলা তাতে এক কোমরের চাইতে বেশী জল নেই, ভাল্লা টেঁটায় সেখানে কুমীরকে ঠেকানো যাবে।

আরও আধঘণ্টা শালতি এদিক-ওদিকে চলে একটা বড় চরের দুতিনশ' গজের মধ্যে এসে পড়লো। বড় চরটার কাছে ভিতে আরও কতগুলি ছোট ছোট চর কুমীরের পিঠের মতোই জেগে আছে। এসব চরগুলোর কোন কোনটির মধ্যে জল একহাঁটুও নয়। এবং এটাই বিপদের কারণ। গরু বলদ ঘাসের লোভে এ চর থেকে ও চর যায়, তখনই কুমীর শীকার ধরে।

কিন্তু কুমীর তো মাটির তৈরি নয়। কোন চরেই তার লেশমাত্র দেখতে পাওয়া গেলো না। প্রায় একঘণ্টা ধরে এ চর সে চরকে বেষ্টন করে ঘোরা হলো। কাদাখোঁচা পাখি আর টিটিভকে নড়তেচড়তে দেখা গেলো, মাছধরার আশায় ডুবিয়ে রাখা ডোঙ্গাকে ভুল বুঝে একবার খুব সন্তর্পণে এগিয়েও গেলো শালতি, কিন্তু কুমীরকে গল্প বলেই মনে হলো।

তখন রাজু আবার ঘড়ি বার করে দেখলো। চারটে বাজতে চলেছে। অনুমান হয় দিগন্তর বিস্তার ছোট হয়ে আসছে। জলে লগিওয়ালাদের এবং তাদের লগির যে ছায়া পড়ছে তা থেকে বোঝা যায় সূর্য ইতিমধ্যে পশ্চিমে নেমে পড়েছে। ঠিক এমন সময়ে লগিওয়ালাদের একজন চাপা গলায় ইশারা করলো। অন্য লগিওয়ালারা ইশারা বুঝে উল্টোদিকে লগি বসালো। সামান্য একটা ঝাঁকি দিয়ে শালতি থামলো। হাতের ইশারায় ইশারায় জানাজানি হয়ে গেলো।

শালতির দিকে মুখ করে একটা আর তার পেটের দিকে মুখ করে আর একটা।

শালতির গলুইএর কাছে খানিকটা পাটাতন, তার উপরেই বসেছিলো রাজু। তার উপরেই হাঁটুতে ভর দিয়ে বসলো সে। দুটো তো আর সম্ভব নয়। যেটিকে আড়াআড়ি পাওয়া গেলো সেটির সামনের পা আর ঘাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় লক্ষ্য করে একবার, গুলি খেয়ে সেটা যেন লাফিয়ে উঠেই চলতে সুরু করতে না করতে পা ও পেটের মাঝামাঝি নিশানা পেয়ে আর একবার গুলি করলো রাজু। অন্য কুমীরটি ভয় পেয়ে শালতির দিকেই ছুটতে শুরু করলো। তার সুচলো মাথা ওপাশের ডোঙ্গার হাত আটদশের মধ্যে এসে পড়লো। ডোঙ্গার লোকেরা চিৎকার করে উঠলো। কুমীরের মুস্কিল হলো, কিংবা সেটা তার দুর্ভাগ্য। যেখান থেকে সে জলে নামতে ছুটছে সেখানে জল এক কোমরের বেশী নয় আর একটু ঘুরে হাত-দশেক দূর দিয়ে গেলে সে গভীর জলই পেতো। ডোঙ্গার মানুষরা তখন মরিয়া, কুমীর উপরে এসে পড়লে, জলে পড়বে মানুষ; আর জলে কেউ কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে না। টেঁটা আর বল্লমের (সবগুলোতেই দড়িবাঁধা) খোঁচায় কুমীরকে রুখতে চেষ্টা করলো তারা। কুমীর ছুটে আসছিলো তার ভারি শরীরের ওজনের সঙ্গে সেই গতি গুণ হচ্ছে। একটা ধারালো টেঁটা বিঁধতে তার শরীরের চাপেই সেটা তার মর্মে পেঁছালো। মুহূর্তে দিক বদলালো সে, টেঁটার রশিতে টান পড়লো, আর সেই টানে ডোঙ্গা কুমীরের ডোঙ্গায় উঠে পড়লো। রাখ-রাখ, গেলো গেলো করতে করতে অন্য ডোঙ্গাটা লগি ঠেলে, শালতিকে ধাক্কা দিয়ে প্রথম ডোঙ্গাটাকে সাহায্য করতে এগোলো। সে ডোঙ্গা থেকেও টেঁটা ছোড়া হলো দু-তিনটি। দৈবাৎ তার একটি মানুষকে না বিঁধে কুমীরকেই বিঁধলো। দু-দড়ির টান পড়লো কুমীরের উপরে।

চরের উপরে আড়াআড়ি দুটো নালা। অল্পজল বলেই মনে হয়। সেই নালার দিকে ততক্ষণে চলছে গুলিখাওয়া কুমীরটা। শালতি থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়েছে। সেটা লেজ আছড়াচ্ছে। রাগে কিংবা, একটা পা ভেঙেছে বলেই চলতে গিয়ে লেজের অমন ব্যবহার হচ্ছে।

ডোঙ্গার লোকরা গেলো গেলো রাখ রাখ করছে, রাজু একবার সেদিকে চেয়ে দেখলো। শালতিকে চরের উপরের নালায় নিতে বললো। পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করলো। এক-মুহূর্তে কিই বা বোঝা যায়। মাথার উপরে বন্দুক আর টোটার বেল্ট একহাতে উঁচু করে ধরে সে জলে লাফিয়ে পড়লো। ওদিকেও কুমীরের টানে ডোঙ্গা জলে ধাক্কা মারছে।

কি করবে তা শালতির লোকরা বুঝে উঠতে পারলো না। জল এখানে খুব বেশী না থাকার কথা, তা হলেও এককোমর জল কেন হাঁটুজলেও কি মানুষ কুমীরের সমকক্ষ? কিন্তু রাজকুমার তো, কি বিপদ! শালতির একজন চিন্তা করে জলে নামলো। অন্য আর একজন তাকে দেখে জলে লাফিয়ে পড়লো। ততক্ষণে রাজু জল ঠেলে, জল ছিটিয়ে চরের মাঝামাঝি গিয়ে পেঁছেছে। তার কোমর অবধি জল উঠেছিলো। ভিজে স্যুট থেকে জল গড়াচ্ছে।

রাজু এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা দেখলো, বন্দুক দুটো গুলি পুরে সে আবার ছুটলো হাঁটুজল ভেঙে। জল ছিটছে পায়ে গায়ে। জলে গতি আটকাচ্ছে। কুমীরের সঙ্গে কি ছুটে পারা যাবে? ওদিকে ঝোপঝাড়। কুমীর সেদিকে গেলে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, কিংবা চরের ওদিকে জল পায় যদি। চর অসমান, উঁচু-নিচু, গাড়া গর্তও আছে।

না কুমীরটা তেমন ছুটতে পারছে না। চাকাভাঙ্গা গাড়ির মতো অবস্থা তার। একটা ঢালু দেখে সে বোধ হয় আশা করলো সেদিকে জল আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা গাড়া। নিচে নেমে গিয়ে জল না পেয়ে কুমীরটা দিক বদলে কিংবা ভুল করে বরং রাজুর দিকে এগিয়ে এলো, কিংবা পাশ কাটাতে গিয়ে দূরত্বটা কমিয়ে আনলো। হাঁটু গেড়ে রাজু মাটিতে বসে

পড়লো। দু-এক মুহূর্ত তাক করে রাজু গুলি করলো। এবার কুমীরের গতিটা থেমে গেলো।

অন্য কুমীরটাকে নিয়ে ডোঙ্গার লোকেরা বিপদেই পড়েছিলো। দুটো টেঁটার, তা অবশ্য কুমীর যত টানছে ততই তার নাড়িতে টান দিচ্ছে, দড়ি ধরা বটে কিন্তু তাতে তার লেজের আছড়ানো কমছে না, চলাও বন্ধ করে নি সে। একজন সাহস করে বল্লম মারলো পাশ থেকে, কিন্তু যেন ঠিকরে এলো কুমীরের কাঁটার খোলা থেকে। তখন আর একজন বরং তার মুখের দিকে এগিয়ে গিয়ে পেটের কাছাকাছি আর একটা টেঁটা বিঁধিয়ে দিতে পারলো। টেঁটাটার দড়িবাঁধা ডগাটা মাটি আর কুমীরের শরীরের চাপে পাটকাটির মতো ভেঙ্গে গেলো, কিন্তু সেই চাপেই তার ধারালো ফলাটা কুমীরের শরীরের মধ্যে একহাত পরিমাণ বসে গেলো।

তখন পশ্চিমের আকাশ লালচে হয়ে উঠছে। শালতিটাকে চরের কোণে ভিড়ানো হয়েছে। রাজু শালতিটাতে বসে দেখলো বাদামী বাদামী সেই আলোয় দুটো ডোঙ্গার মতো কুমীর দুটো এখন স্থির হয়ে আছে।

শালতির একজন বললো,—পা ঝুলিয়ে বসুন, হুজুর, জুতোর কাদা ধুয়ে দিই।

আর একজন বললো,—এখন হুজুর আমাদের খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে। অন্ধকার হলে চরে চরে গোলকধাঁধায় পড়বো।

রাজু বললো,—একজন বরং বন্দুকটাকে একটু মুছে রাখো, জল লেগেছে। রাজু ঘড়ি বার করলো। পাঁচটা পার হয়ে গিয়েছে। শীতের সন্ধ্যা ছটাতেই গাঢ় হবে বটে। ঘড়িটার গায়ে জল। রুমাল দিয়ে রাজু মুছলো।

শালতির সেই লোকটি বললো,—এখন, হুজুর, শালতির দু মাথাতেই লগি মারা হবে, দুলবে শালতি, আপনার কি অসুবিধা হবে হুজুর!

রাজু বললো,—একটার চামড়া কি আমাকে পেঁাছে দিতে পারো তোমরা।

—আজ শেষ রাত তক হতে পারে, হুজুর।

রাজু হেসে বললো,—অত তাড়াতাড়ি দরকার নেই।

শালতি চলতে শুরু করলো, শালতির আগেপিছে ডোঙ্গা। একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটছে সেগুলো। ডোঙ্গায় দুজন, শালতিতে চারজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লগি মারছে। একটা শব্দমাত্র করে চারটে লগি পড়ছে জলে। বাচ্ খেলার মতো চলছে শালতি। কি যেন একটা বিড়বিড় করছে লগিওয়ালারা, মন্ত্র যেন। হঠাৎ একসঙ্গে গানটা একটা চিৎকারে ফুটে উঠলো, প্রথমে শালতিতে, পরমুহূর্তে ডাঙ্গা দুটিতেই।

জল কালো, শালতির দুপাশের দাম অথবা চরের আগাছার ঝোপঝাড় তেমন সবুজ নয় আর, বরং কালচে খয়েরি। আকাশ ধোঁয়াটে আর নিচু। শীত শীত লাগছে ভিজে স্যুটে রাজুর।

কাছারীর ঘাটে পেঁাছাতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, তা হলোও না। অন্ধকারে পথ হারানোর ভয় রইলো না, কারণ সন্ধ্যার আগেই কাছারীর সামনে বড় বড় মশাল জ্বালানো হয়েছিলো. উপরন্তু কাছারীর বজরাই আলো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো রাজকুমারকে বিকেলের আলোয় ফিরতে না দেখে।

পারে উঠলো রাজু। জনতার আগ্রহই সীমা ভেঙ্গে এগিয়ে গেলো, পায়ের উপরে পা ফেলার জায়গা রইলো না। তখন হঠাৎ একজন মানুষ কোথা থেকে দুই বাহু ছড়িয়ে দিলো। তার দুই ছড়ানো হাতের তেলোর মধ্যে ব্যবধানটা গজ চারেক হবে। দুই তেলো দিয়ে সে ভিড়কে চাপ দিয়ে পিছু হঠতে লাগলো যেন দাম কেটে নৌকার পথ করছে। লোকটি যেন পিছু হঠছে না, যেন সে এক অপরিচিত ইঙ্গিতে রাজুকে এগিয়ে যেতে বলছে। তার হাঁড়ির

মতো মাথা, প্রচণ্ড চৌকো চোয়ালের উপরে থাবা থাবা মেদমাংস বসানো মুখমণ্ডল, উপরের এবং নিচের ঠোঁটঢাকা সিন্ধুসিংহের মতো গোঁফ সত্ত্বেও মনে হলো লোকটি খুব বিলম্বিত লয়ে হলেও নাচছে যেন। ভিড় ঠেলতে ঠেলতেও তার কাঁধ দুটো এবং বাহুর উপরিভাগ ওঠা-নামা করছে, মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে ফিরছে, পা দুখানাও ঠিক সোজা পড়ছে না। লোকটির গায়ে কাঁধকাটা পিরহান, কোমরে উড়নি জাতীয় কিছু জড়ানো, ধুতির ঝুল ছোট তাই কোঁচা হাঁটুর কাছে দুলছে।

লোকটি পিছিয়ে পিছিয়ে যেখানে থামলো সেটা একটা গাছের তলা। মাটিতে একটা সরু কাজ করা চাটাই বিছানো, তার উপরে একখানা চেয়ারের মতো উঁচু জলচৌকি।

কথা বলতে গেলে বোধ হয় গোঁফ তুলে ধরতে হয়, তেমন করে গোঁফ পাকিয়ে লোকটি বললো,—বসতে আজ্ঞা হক, রাজকুমার।

ভিজে জামাকাপড়ে বসবে কি না এই দ্বিধা করতে লাগলো রাজু। কিন্তু ততক্ষণে বড় মাপের লোকটি আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। সে বললো,—জোকার দাও।

যারা ভিড় করছে তারা সবাই পুরুষ। অপটু, অনভ্যস্ত, পুরুষালি গলায় হুলুধ্বনির নকল করে দু-একজন ডুকরে উঠতেই হাসির গররা পড়ে গেলো।

লোকটি বললো,—চপ্। সে এদিক ওদিক চাইলো, ভিড়ে কাউকে খুঁজে পেয়ে বললো, —ও বামুন, ইদিকে, ইদিকে।

—একজন শুঁটকো কালো চেহারার, কিংবা শুঁটকো না বলে হাড়েমাসে দড়া পাকানো একজন প্রৌঢ় এগিয়ে এসে বললো,—তোমার আর সুখের পারাপার নেই মণ্ডল। নাও ধরো।

প্রৌঢ় নিজের মুখের কাছে হাতের তেলো রেখে আ বাবা ইয়া বলে ফুকরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই বামুনও।

রাজুর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। সেই শুঁটকো বামুনের গোটা শরীরটাই একটা শিঙ্গা হলে তবেই তেমন ফুকরে ওঠা সম্ভব।

এই প্রাথমিক কর্তব্য সমাপ্ত হলে মেদমাংসের সেই বালিআড়ি (বালিআড়ি বলাই ভালো, পাহাড় স্থির কঠিন, এক্ষেত্রে পাহাড়ের গা যেন সব সময়ে সবল, খসে খসে পড়ছে উপরের স্তর হাসি হয়ে হয়ে) সে ট্যাঁক থেকে হলুদে কিছু একটা বার করলো। ডান হাতের তেলোতে সেটা রেখে, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত স্পর্শ করে এগিয়ে ধরলো রাজুর সামনে; গোটা শরীর কোমর করে ঝুঁকে দাঁড়ালো। বললো,—নেকনজর দিতে আজ্ঞা হোক, রাজ-কুমার। দৃশ্যটা অবাক করার মতো। কিন্তু ডান হাতে তর্জনী দিয়ে মোহরটাকে ছুঁতে হলো রাজুকে।

রাজুর শীত শীত লাগছিলো। এখন উত্তেজনার বদলে অস্বস্তি। কারণ সেই কাদা-জল হাঁটুর উপর পর্যন্ত পৌঁছেচে। হাতির খোঁজে সে এদিক ওদিক চাইলো। নিজের অস্বস্তির কথা প্রকাশ করা যায় না। সে বললো,—আমার সঙ্গে সদরে দেখা করো মণ্ডল।

লোকটি এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললো,—হুজুরের এই কোলের ছেলের নাম গজা। ওরে হাতি আন, হাতি আন। ভিজে পোশাকে হুজুরের খারাপ লাগছে।

দুচার মণ ওজনের গজা কোলের ছেলেই বটে।

কিন্তু ততক্ষণে তহশীলদার নিজে পৌঁছাতে পেরেছে। ঘণ্টার শব্দও হলো। তাহলে হাতি এবার নড়ছে। এখানে বোধ হয় হাতিও এতক্ষণ কোণঠাসা হয়েছিলো।

—হাতি বসলো। তহশীলদারের লোকরা আলো এগিয়ে আনলো। শালতির লোকেরা

শীকারের সরঞ্জাম তুলে দিলো। রাজু হাতির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মাহুতের ইশারায় শুঁড় নামালো হাতি। রাজু শুঁড়ের উপরে দাঁড়াতেই শুঁড় উঁচু করলো। রাজু হাওদায় বসতেই হাতি চলতে শুরু করলো।

নয়নতারা বললো,—একেবারে ভিজেছো তো অবেলায়।

রাজু হাসলো। বললো,—পাইপ ধরাতে পারলে হতো।

সেই চামড়ার পাউচ বার করতে করতে নয়নতারাকে জিজ্ঞাসা করলো সে, গজা মণ্ডলকে দেখেছে কি না?

মাহুত সাধারণত কথা বলে না। কিন্তু গজা সম্বন্ধে বোধ হয় না বলে থাকা সহজ নয়। সে বললো,—হুজুর গজাও নয় মণ্ডলও নয়। ওর বাপঠাকুর্দা ছিলো মেণ্ডুজা। সেই নাম মিলিয়ে নাম গজা।

—তা কাঁধের মাপও গজ হবে। রাজু দেখলো দেশলাই তামাক ভেজে নি।

অন্ধকার বেশ ঘন হচ্ছে ক্রমশ। ঘাস বনে হাতিও পায়ের তলায় অস্পষ্ট। পাইপে তামাক ভরে দেশলাই জ্বাললো রাজু। আর তখন তার নজরে পড়লো সেই আলোয় নয়নতারার কপালে মস্ত একটা গোল সিঁদুরের টিপ।

রাজু হেসে বললো,—সে কি?

এতক্ষণে নয়নতারারও খেয়াল হলো।

রাজু বললো,—গ্রামের মেয়েরা তাহলে দুয়ে দুয়ে চার করে সাজিয়ে দিয়েছে?

নয়নতারা বললো,—ছি ছি, উৎকণ্ঠায় কিছু কি মনে ছিলো। রুমালটা দাও লক্ষ্মীটি।

নয়নতারা আবার বললো,—কই দাও রুমালটা।

কপাল মুছতে মুছতে নয়নতারা বললো,—আমি তখন জলের বুকে নৌকো খুঁজছি, ওরা এলো সাজাতে।

—তা বটে, রাজু হেসে বললো,—কি করেই বা বলো আমি কেউই নই।

—ব্যাপারটা ঠিক তাই-ই নয় কি? কিন্তু এবার থামো। এমন ঘন অন্ধকারে হাতি কি পথ খুঁজে পাবে? আমার ভয় করছে। কাছারীতে রাত কাটালেও হতো।

পেটা ঘড়ির শব্দে রাত তখন আটটা, রূপচাঁদ হাই তুললো। রাজচন্দ্রর ঘরের সামনে আর একবার ঘুরপাক খেলো। রানীর ঘরের দরজায় উসখুশ করলো। তারপর সেই দরজার সামনেই খুক্ খুক্ করে কাসলো। শীতের রাত, রাত আটটা, মাঝরাত যেন।

ভিতরে তখন আরব্য রজনীর গল্প চলেছে। রানী হাসছিলেন মৃদু মৃদু আরব্য অভিজাত মহিলাদের আত্যন্তিক কাফ্রী ক্রীতদাস প্রীতির কথায়। অবশ্য, তাঁর হাসি দেখে তাঁর খোশমেজাজ কিংবা বিরক্তি বোঝা গেলে তো রাজবাড়িতে অনেক কিছুই সহজ হতো।

কাসির শব্দ শুনে রানী বললেন,—রূপচাঁদ নাকি, এসো।

রূপচাঁদ এ ঘরে কদাচিৎ চোখ তোলে। মেঝের শতরঞ্জের নকশায় চোখ রেখেই সে জানালো রাজকুমার বিলমহলে গিয়েছেন, তখনও ফেরেন নি।

রানীর মুখে উদ্বেগ দেখা দেবে যেন। কিন্তু বললেন তিনি,—তাই নাকি? হয়তো কোন কারণে দেরি হচ্ছে।

রূপচাঁদ সরে যেতে ফিরলো। তখন রানী আবার বললেন,—নয়নতারার খোঁজ নিয়ো তো একবার।

রূপচাঁদ চলে গেলো।

গল্প আবার শুরু হলো।

কিন্তু নতুন গল্পটার মাঝখানে রানী বললেন,—সব দেশের গল্প এক নয়। তাই মনে হচ্ছে না? মন্দ নয়, মানদা, তুমি গল্প বলতে ভালোই শিখেছো। অন্য শ্রোতাদের দিকে লক্ষ করে বললেন,—তোমরা কি আরও শুনবে এখন? তাহলে বাটা থেকে পান নাও।

শ্রোতারা বাটা থেকে পান নিয়ে নিয়ে উঠে পড়লো।

যে গল্প বলছিলো তাকে রানী বললেন,—আবার তোমাকে খবর দেবো, মানু।

সকলে চলে গেলে রানী উঠলেন। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবলেন। দরজা থেকে একটু দূরে একজন ঝি দরজার দিকে চোখ রেখে বসে সুপারি কুচোচ্ছিলো। তার দিকে দু-পা এগিয়ে রানী বললেন,—মোক্ষ, হরদয়ালকে এখনই একটু আসতে বলে এসো।

রানী ঘর থেকে বেরুলেন।

রূপচাঁদ নয়নতারার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে বুঝতে পারলো সে বাড়িতে নেই। তা হলে জানালায় আলোর আভাস থাকতো। সে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন নয়নতারার দাদা ন্যায়-রত্নের চতুষ্পাঠীর দাওয়ায় প্রথমে একটা প্রদীপ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাউকে যেন বসে থাকতে দেখতে পেলো।

—কে?

—আমি, বলা।

লোকটি উঠে এলো। বলা এখন আর রূপচাঁদের অপরিচিত নয়।

সে বললো,—দিদি কি রাজবাড়িতে?

—আমিও খুঁজছি। বিলমহলে রাজকুমার গিয়েছেন। হয়তো মাসিও সঙ্গে আছেন। এত রাত হয়। অবিশ্যি চোরচোট্টা আর কে এ গ্রামে? তবে কি না ফরাসডাঙায় এসে উঠতে জঙ্গল পার হতে হবে তো।

বলা বললো,—এগিয়ে দেখতে হয়, না?

—কি যে করি! দরকার হচ্ছে আলোর নিশানা।

রূপচাঁদ রাজবাড়ির দিকে হন্‌হন্ করে ফিরতে শুরু করলো। পথের উপরে খানিকটা এসে বলার বাড়ি। রসো, আসি, রূপদাদা, বলে সে ভিতরে গিয়ে তার লাঠিটা নিয়ে এলো।

বলা বললো,—কিন্তু সে তো ঘাসের জঙ্গল। হাতিডোবা ঘাস। মশাল নিতে চারপাশের ঘাসে আগুন ধরে যাবে না? আর সে জঙ্গলে কি না মানুষ?

রূপচাঁদ বললো,—তাও তো।

সে ভাবতে ভাবতে চললো।

রাজবাড়ির প্রাচীরের ভিতর দিকে একপাশে বরকন্দাজদের ছোট ছোট ঘর।

যে তিনজন বরকন্দাজ মাঝরাতে জাগবার জন্য এখন ঘুমাতে যাচ্ছিলো রূপচাঁদ তাদের আটকালো। সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলো রাজকুমারকে এগিয়ে আনতে যেতে হবে। তৈরি হও, আসছি।

মশালচিদের ঘরে গিয়ে পাঁচ-সাতটি হারিকেন জ্বালিয়ে আনলো রূপচাঁদ। বলাকে দেখিয়ে পরামর্শ নিলো,—কেমন, বলা, এই ভালো নয়?

—আগুনের ভয় থাকলো না।

বরকন্দাজরা গাদাবন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে আসতেই ছুটতে শুরু করলো রূপচাঁদের দল।

রানী খানিকটা ইতস্তত চলে বেড়ালেন তাঁর মহলে। বসবার ঘরে না ফিরে একটু বাঁয়ে চলে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতালার ছাদে গিয়ে উঠলেন।

আকাশে অনেক তারা। রাজবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আলোতে বাড়ির পরিসরটা ঠাহর হয়। প্রাচীর বলে যাকে মনে হচ্ছে তা ছাড়িয়েও গ্রামের মধ্যে এখানে ওখানে দুচারটি আলোর বিন্দু। গাছপালা বাড়িঘরের আকৃতি ছায়া ছায়া, কিংবা কালিতে আঁকা ছবিতে কালি পড়ে গেলে তার কোন কোন রেখা তা সত্ত্বেও যেমন ফুটে ওঠে। অবশ্যই হাল্কা গভীর কোন সিহাই এমন রং নিতে পারে না—নীলের ধারঘেঁষা কালো একখন্ড স্ফটিক যেন। স্ফটিক—অর্থাৎ উজ্জ্বলতার একটা ভাব আছে। কিন্তু এখানে এরকম দেখালেও নিচে গাঢ় অন্ধকারই হবে গাছপালার কোলে বাড়িঘরের কোণে। শীতের রাত ইতিমধ্যে বেশ গভীর বাইরে। হঠাৎ তিনি দেখলেন—কতগুলি আলোর বিন্দু যেন খুব তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে না, আর তাদের পরস্পরের দূরত্বও সমান থাকছে। এ কি রাজকুমারের বিলম্বের সঙ্গে জড়িত কোন ব্যাপার। বুকের মধ্যে কি যেন জোরে নড়ে উঠলো তাঁর। একটু চঞ্চল হলেন রানী।

সিঁড়িতে এমন সময়ে পায়ের শব্দ হলো।

রানী জিজ্ঞাসা করলেন,—কে, মোক্ষ? হরদয়ালকে খবর দিয়েছো?

ছাদের যে প্রান্তে সিঁড়ি যেখান থেকে হরদয়াল জানালো সে এসেছে, নিচে অপেক্ষা করছিলো, তাই দেরি।

রানী বললেন,—হরদয়াল, রাজকুমার বিলমহলে গিয়েছিলেন, হয়তো শীকারে। এখনও ফেরেন নি।

হরদয়াল বললো,—সে কি কথা? একা নাকি?

রানী জানালেন,—সঙ্গে নয়নঠাকরুন থাকতে পারে। তাও ভাবনার বিষয়।

হরদয়ালের নীরবতা তার চিন্তারই চিহ্ন। সে বললো অবশেষে,—হাতিতে গিয়েছেন?

—পিয়েত্রোর হাতিতেই বলে অনুমান। কিন্তু পথে একটা বড় বন আছে শুনেছি।

—তা আছে। তবে পিয়েত্রোর হাতি, বনের পথ চিনবে ভরসা করি।

—কিন্তু অন্ধকার রাত হলো।

—তা হচ্ছে।

রাণী একটু থেমে বললেন আবার,—আজ গ্রামে কীবল এসেছিলো।

—হ্যাঁ চার-পাঁচ ঘণ্টা ছিলো, বাগচীমাস্টারের বাড়িতে লাঞ্চ করেছে।

—একে কি দরকারি খবর মনে করো হরদয়াল?

—এখন পর্যন্ত তেমন মনে করার কোন যুক্তি দেখছি না।

কথাটা রানীর মনঃপূত হলো। খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বললেন,—আচ্ছা, হরদয়াল, ডানকান একটা সুরকির রাস্তা করছিলো সে রাস্তার খানিকটা কেটে দেয়া হয়েছে। ঘটনাস্থানে এক রায়তের জমির ধান বিলমহলের লোকেরা কেটে তা আবার সেই রায়তের ঘরেই এমন করে রেখেছে যে রায়তের নিজেরই আর জায়গা হয়নি। রাস্তাটা কি তোমাদের রাজকুমারের জমির উপর দিয়ে হচ্ছিলো?

—সন্দেহ আছে, কিন্তু নয় তাও বলতে পারি না এখন আর। পিয়েত্রোর দরুন ফরাসডাঙারও হতে পারে।

রানীমা বললেন,—হঠাৎ রাস্তাটাকে কেটে উড়িয়ে দেয়ার কি দরকার হলো। হরদয়াল একটু ভেবে বললো, সাধারণত বড় রকমের নালিশ না হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে রাজবাড়ি থেকে প্রশ্ন করা হয় না। এক্ষেত্রে কেউ বোধ হয় নালিশ করে নি। কিন্তু, রানী, রাজকুমারের বিলম্বের কথা বলতে বলতে এসব সংবাদ আলোচনা করার কোন যুক্তি দেখি না।

রানী কি হাসলেন? অন্ধকারে তা বোঝা গেলো না।

—চলো, হরদয়াল, নিচে বসি।

—রানী ছাদের ঝরোকা-ঝিলিমিলির কাছে থেকে সরে এলেন। তাঁর শাড়ী দুধে গরদের বলেই হয়তো একেবারে অদৃশ্য নয়, তার হাতের বালার পাথর কিছু কিছু নিজের পরিচয় সেই অস্পষ্টতায় দিলেও অযুক্তির হয় না, কিন্তু কোন কোন দেহবর্ণও কি অন্ধকারে ঈষৎ আভাসিত হয়?

একটা সুঘ্রাণ পেলো হরদয়াল, যা বিহ্বল কিন্তু মৃদু, এখন যেন বিষণ্ণ। তাড়াতাড়ি দু-পা পিছিয়ে গেলো সে সিঁড়ির মুখ থেকে। রানী সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন। হরদয়াল ধীরে ধীরে অনুসরণ করলো।

নিচের বসবার ঘরে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রানী বললেন,—নায়েব অবশ্যই দৃষ্টি রাখছেন, মামলা হয়ই যদি কোম্পানির আদালতে। আচ্ছা, হরদয়াল, কলকেতায় এবারই কি হাইকোর্ট হবে?

প্রসঙ্গান্তরে কি যাচ্ছে কথা?

হরদয়াল সঙ্গে সঙ্গে বললো,—চেষ্টা তাই।

—তোমার কি মনে হয় তা সব দিক দিয়েই ভালো। মুন্সেফী আদালতও নাকি হবে।

—আমাদের গ্রামেও হতে পারে।

—সেটা কি, আচ্ছা হরদয়াল, তুমি ভেবে দেখো, তোমাদের রাজকুমারের এক্তিয়ারের মধ্যে যদি আদালত বসে সেটা কি ভালো?

হরদয়াল বলতে যাচ্ছিলো, আমাদের গ্রামের আয়তন লোকসংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে তেমন হওয়াটাই উচিত হবে। কিন্তু চোখ তুলতেই রানীর আয়ত চোখ দুটিকে সে দেখতে পেলো। কিছু ভাবছেন তিনি।

রানী বললেন,—শুনেছি বেহার-রাজের নিজের আদালত আছে।

দেউড়ির পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা পড়লো দশটার। এমন সময়ে মোক্ষদা-ঝি এসে বললো, —রূপচাঁদকাকা গেছেন বরকন্দাজ নিয়ে।

রানী শুনে বললেন,—আচ্ছা মোক্ষদা—

একটু পরেই আবার বললেন,—তুমি কি আজকাল তেমন বই পড়ো না? বই কি তেমন আসছে না?

—আসছে।

—বইটই আনতে কি তুমি এর মধ্যে কলকাতায় যাবে?

—তেমন স্থির করলে জানাবো আপনাকে।

হরদয়াল কান পেতে শুনলো কোথাও একটা ঘড়ি টিক্‌টিক্ করছে। একে প্রতীক্ষা ছাড়া আর কি বলা যাবে?

বললেন রানী আবার,—আচ্ছা, রাজকুমারের বিয়ের কথা আর কি ভেবেছো?

রানী কি মুখ নিচু করলেন, হরদয়ালকে কি বিচলিত দেখা গেলো। হরদয়াল ভাবলো

ইতিপূর্বে রানী দুবার দুরকম সুরে বলেছেন নয়নতারা সঙ্গে থাকাতেই ভাবনা। যেন ভাবনাটা দুবারে দুজনের জন্য। কিন্তু এসবই কি প্রতীক্ষাকে অচঞ্চল রাখতে বলা।

সে বললো,—আপনি হুকুম করলেই চেষ্টা করবো। সেই পাত্রীই যদি সে ইতিপূর্বে পাত্রস্থ না হয়ে থাকে।

রানী বললেন,—না।

তাঁর ঠোঁট দুটিতে হাসিহাসি ভাবটাই রইলো, কিন্তু এই একবর্ণের শব্দটা গোটা একটা বাক্যের মতো ভারি শোনালো।

ততক্ষণে রূপচাঁদের দল ফরাসডাঙ্গা পেরিয়ে বনে ঢুকেছে। হাঁপাচ্ছে তারা দৌড়ে এসে। ছুটতে ছুটতেই ভাবছিলো রূপচাঁদ—যে মাহুতই হ'ক সে চওড়া পথের দিকে আসবে অন্তত আন্দাজে দিক ঠিক করে। ভয় আর এক বিলে গিয়ে না পড়ে। সুতরাং পুরনো নদীর পার ধরে, তারপর নদীর পুরনো খাতের ডান পারে যেতে হবে। কিন্তু আলো এনে কি হয়েছে যদি না হাতির সওয়ার দেখতে না পায়? বনে ঢুকলে ঘাস বন মানুষের মাথা ছাড়িয়েই উঠবে। আলো দেখে কে?

সে হন্ হন্ করে চলতে চলতে বললো,—আলো দেখানোর কি, বলা?

একটা গাছের কাছে এসে তার খেয়াল হলো। একজন বরকন্দাজকে সে বললো,—উঠো এই গাছে। গাছে গাছে আলো রাখা যাক।

যে কথা সেই কাজ। তা দেখে বলা বললো,—মন্দ না। আধকোশ জুড়ে গাছে গাছে বেড় দিলে কোন না কোন আলো দেখবে হাতি আর সেদিকে কেটে উঠবে।—তা ছাড়া, ধরো, সেই বেড়ের কেউ না কেউ হাতির ঘণ্টা শুনবে।

ঘাসবনের মধ্যে ডুবে ডুবে মানুষ কয়েকটি রাস্তার অসমান লেশমাত্র ধরে ছুটে চললো। ঘাসেই হাত পা কাটছে, কাঁটায় কি হচ্ছে বলা বেশী।

অবশেষে বলাও এক গাছে চড়লো আলো নিয়ে। রূপচাঁদ একা ছুটলো তখন। আর কিছুক্ষণ ছুটেই তার মনে পড়লো সে একা। এই মানুষ-ডোবা ঘাসবনে সে এমন একা যে মনে হয় দু-দশ ক্রোশে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। আর এই তো পুরনো নদীর খাত, আর পার, আর চরা, আর এখানে কি সেই আদিকাল থেকে লাখ মানুষ দাহ হয়নি! নিজের ঘামেই পিরহান ভিজে, ঘাসবনের ওম্ সত্ত্বেও তার শীত লেগে গেলো। পায়ের তলায় একটা শক্ত ঢেলা লাগতেই মড়ার মাথার খুলি এই বিশ্বাস হলো। সে আতঙ্কে চিৎকার করে দৌড়ালো।

রাজু বললো,—আচ্ছা বাঁদর তো, গাছে কেন?

গলাটা রাজকুমারেরই বটে। রূপচাঁদ দেখলো হাতিটা গাছের নিচেই দাঁড়িয়েছে।

মাহুত বললো,—ওখান থেকেই নামো, রূপুদা, হাতির পিঠে।

রূপচাঁদ বললো,—তা যদি ঝুপ্ করে পড়ি, তোমার হাতি ভয় পাবে না তো?

মাহুতের হাতে লণ্ঠন ধরিয়ে দিয়ে রূপচাঁদ ডাল দুলিয়ে ঝুল খেয়ে নামতে গিয়ে পলকা ডালটা ভেঙ্গে থেবড়ে পড়লো। মাহুত অন্যহাত বাড়িয়ে না ধরলে নিচেই পড়তো।

রাজু বললো,—একেবারে বাঁদর।

রূপচাঁদ হেসে বললো,—হনুমান, হুজুর। হাতি কিন্তুক ছুটে চলুক। আলোর বেড় বরাবর।

হরদয়াল ভাবলো : রানী বলেছিলেন, নয়ন সঙ্গে থাকাতেই ভাবনা। তারপর বললেন

কলকাতা যাওয়ার আর রাজকুমারের বিয়ের কথা। এগুলি কি রানীর মনে পরস্পর সংবন্ধ?

তারপর তার মনে ফিরে এলো দু-তিন বছর আগেকার আর এক রাত্রির কথা। রানী সেদিন অনেক রাত্রিতে কাউকে না জানিয়ে এবং একাই দেওয়ান কুঠিতে গিয়ে হরদয়ালকে ডেকেছিলেন। রাজকুমারের বিয়ের কথা উঠেছিলো। রানীর এক আত্মীয়া তাঁকে যে চিঠি দিয়েছিলো সে বিষয়ে তাতে রানী অপমানিতা বোধ করেছিলেন এবং হরদয়ালকেই সে অপমানের হেতুস্বরূপ মনে হয়েছিলো তাঁর।

ঠিক এমন সময়েই দেউড়িতে এবং তারপরে বারমহলে হরদয়ালের চিন্তাকে ছিন্ন করে কলরব শোনা গেলো, এবং তার মধ্যে হাতির ঘণ্টাও।

আগে হরদয়াল এবং পিছনে রানী বারমহলের দরজার দিকে এগোলেন।

হরদয়াল দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো. রানী কিছু পিছনে দালানের একটা দেয়ালগিরির নিচে।

তখন হাতি থেকে নেমেছে রাজু। আলোতে বোঝা গেলো তার স্যুটের এখানে ওখানে কাদা শুকিয়ে আছে।

নয়নতারার কথা জিজ্ঞাসা করা কি উচিত হবে? ভাবলো হরদয়াল।

ততক্ষণে রাজচন্দ্র এগিয়ে গিয়েছে। রূপচাঁদ তার শীকারের সরঞ্জাম নামাচ্ছে। রাজু রানীর কাছাকাছি যেতেই তিনি বললেন,—এ কি রে? এত কাদা?

রাজু হেসে বললো,—বা, কুমীর তো কাদাতেই থাকে।

রানী যেন একটু চমকালেন। তাঁর মুখ কিছু বিবর্ণ হলো। কিন্তু তখনই বললেন, —আচ্ছা হরদয়াল—

বিচক্ষণ হরদয়াল তখনই নিজের কুঠির দিকে চলতে শুরু করলো।

রাজুকে বললেন রানী,—তুই জামাকাপড় ছাড়, রাজু, আমার ঘরে তোর খাবার দেব।

রানী আর দাঁড়ালেন না। রূপচাঁদকে নিয়ে রাজু নিজের মহলের দিকে এগিয়ে গেলো।

বাইরের জামাজোড়া ছেড়ে হরদয়াল বালাপোষ নিলো। ঘড়ি না দেখলেও বলা যায় এখন অনেকটা রাত হয়েছে। কি করবে সে এখন? রানী ডেকে পাঠানোর আগে সে চিন্তা করছিলো। তার কলকাতার বন্ধু চিঠি লিখেছে। তা থেকেই চিন্তাটা। এখনও কি সে চিন্তাই করবে? রাজকুমারের বিয়ের কথাই যেন। সে একবার চারিদিকের বইএর আলমারিগুলোর দিকে চাইলো। রাত্রির একটা এই কৌতুক যে এই লাইব্রেরী ঘরে সময় যেন মন্থরগতিতে চলে।

কখন কোন সূত্রে কোন চিন্তা আসবে বলা যায় না। হরদয়াল যেন একটা মৃদু সুবাস পেলো। তাকে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা যায় না, উৎসটাও বোঝা যায় না।

হরদয়ালের হঠাৎ মনে হলো এই লাইব্রেরীর অধিকাংশ বই রানীর উপহার। অর্থাৎ বই সেই কিনেছে বটে, টাকাটা দিয়েছে স্টেট, রানীর ইচ্ছায়।

বালাপোষটাকে বাহুর উপরে গুটিয়ে আলমারী থেকে সে একখানা বই টেনে নিলো।

কিন্তু সব সময়ে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। বইটা খুলবার আগেই চাকর এলো, পিছন পিছন বাবুর্চি। বাবুর্চি চাকরের সংসার তার। চাকর জিজ্ঞাসা করলো গড়গড়া দেবে কি না। বাবুর্চি জানালো নদীর ধার থেকে ভালো রুই পাওয়া গিয়েছে। ভাজা হয়েছে।

সামনের দেয়াল ঘড়িতে রাত বারোটার কাছে এসেছে। হরদয়াল হেসে মাথা নাড়লো। বাবুর্চি টেবল গুছাতে গেলো। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। সাধারণত রাত এগারোটাই হরদয়ালের নৈশ আহারের শেষ সীমা।

হরদয়াল লক্ষ্য করলো, চাকর তার পাশে পাশে চলতে হাসছে। সে যেন কিছু বলতে চায়।

—কিছু বলবে?

বাবুর্চি বলছিলো, হুজুর।

—কি?

—নতুন মাস্টারমশায় নিউগিবাবু নাকি বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করেছেন সে কি জাত?

—তাতে হাসির কি হলো।

—ওই মগটাকে নাকি ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলেছেন।

—আচ্ছা?

—বাবুর্চি বলছিলো সে নাকি প্রকৃতপক্ষে মুসলমানই যদিও নমাজ পড়ে না। জিজ্ঞাসা করছিলো এতদিন পরে নমাজ পড়লে আপনি রাগ করেন কি না।

হরদয়াল হো হো করে হেসে উঠলো খাবারঘরে ঢুকতে ঢুকতে।

কিন্তু পরের দিনই হরদয়াল চিন্তা করার অবসর পেয়েছিলো।

এখন আবার সন্ধ্যা হচ্ছে। কাঠের মিস্ত্রী তার সরু র‍্যাঁদাটা তুলে মাথায় ঘষে নিলো একবার। তাতে নাকি র‍্যাঁদা আরও তেলালো হয়। দুবার ঘষে ফুঁ দিয়ে র‍্যাঁদায় ওঠা গুঁড়ো কাঠ ঝেড়ে ফেললো মিস্ত্রী। আর তখন সুগন্ধটা পাওয়া গেলো কাঠের। আসবাবটা এমন কিছু মূল্যবান নয়, একটা বুকশেল্প। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন যত্ন দেখে তা হাতির দাঁতের।

সকালেও হরদয়ালের কুঠির বারান্দায় ছুতোর মিস্ত্রী কাজ করছিলো। রোদটা সরে গিয়েছে, ওমটা আছে। চেয়ারে হরদয়াল। তার বাঁদিকে আলবোলা। আলবোলার সম্মুখে তেপায়ার উপরে কাগজপত্র যা ল'মোহররার গৌরী রেখে গিয়েছে। সকালেও কাঠের এই সুগন্ধ লক্ষ্য করে গৌরী জিজ্ঞাসা করেছিলো সেটা কি কাঠ। মিস্ত্রীই বেশ খুসীখুসী মুখে বলেছিলো রোজউড্।

গৌরী এসেছিলো মামলার কাগজপত্র দিতেই। মুখে বলেছিলো মামলাটা মরেলগঞ্জের মনোহরসিংএর বিরুদ্ধে। ট্রেস্পাস। অর্থাৎ মনোহর তার এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে রাস্তা তৈরি করছিলো। মামলাটা যেভাবে তৈরি হচ্ছে তা কাগজেই জানা যাবে। কিন্তু গৌরীর আসল বক্তব্য ছিলো এবারে রানীমার জন্মতিথি উৎসবে তারা অর্থাৎ কাছারীর কর্মচারীরা এবং তাদের বন্ধুবান্ধব মিলে একটা নাটক করতে চায়। নায়েবমশায়কে অনুরোধ করেছে। এটা তো যাত্রা নয়, নাটক, আধুনিক ব্যাপার। কাজেই হরদয়াল নিজে একটু সমর্থন না করলে নায়েবমশায় রাজী হবেন না। হরদয়াল হাসিমুখে তাকে আশ্বাস দিয়েছিলো।

রানীমার জন্মতিথি? গৌরী চলে গেলে হরদয়াল চিন্তা করেছিলো। এবার কি একটু আগে? তা অসম্ভব নয়, তিথি অনুসারে চলে; কাজেই কখনও এগোয় কখনও পিছিয়ে যায়।

গৌরী যেতে না-যেতেই হরদয়াল সদর নায়েবকে দেখেছিলো। সে ভৃত্যকে ডেকে চেয়ার দিতে বললো। এমন নয় যে নায়েব মাঝেমাঝেই হরদয়ালের কুঠিতে আসেন, সুতরাং নায়েবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হরদয়ালের কৌতূহল হয়েছিলো।

হরদয়ালকে অবাক করে নায়েবমশায়ও নাটকের কথাই তুলেছিলেন। খুব মুস্কিল তাঁর। নাটক কারে কয়? ছোকরারা খেপে উঠেছে। হরদয়াল হেসে ফেলেছিলো। আমাদের দেশে যাত্রা, অন্যদেশে নাটক হয়। এতে আর মুস্কিল কি এই বলেছিলো সে হেসে।

—ও বাবা, না করে থামছে না দেখছি। কিন্তু সে তো শুনি অনেক খরচ। মণ্ড না কি একটা করবে। নরেশও এর মধ্যে আছে। নায়েব বলেছিলো।

হরদয়াল বলেছিলো,—তা, দিন না মঞ্জুরী।

নায়েব উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ বললেন,—ভালো কথা, নরেশের কথায় মনে হলো, ও তো দেখছি ক্রমশ একাজে ওকাজে জড়িয়ে পড়ছে। কাজ শেষ হবে কবে? আমার তো মনে হয় ওর বাবদে একটা হিসাব বই খোলা দরকার।

—তা মন্দ কি? নতুন কাজ পুরনো কাজ মিলে তো পরিমাণ কম নয়।

—বর্ষার আগে পাকা সড়কের কাজ সুরু হবে, ক্রমে তা ফরাসডাঙ্গার মন্দির পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার কথা। নায়েব হাসলো,—মাঝে মাঝে মনে করি একটা আলাদা বিভাগ তৈরি করে দিই। নরেশ কাজ করবে। হিসাবের জন্যও না হয় একজনকে দেয়া গেলো, কিন্তু তারা যে ঠিকঠাক কাজ করছে তা অন্তত মাসে একবার দেখা দরকার। মাপজোখের উপরে মাপ-জোখ আর কি। যতদিন অন্য ব্যবস্থা না হয় আপনার পক্ষে কি দেখা সম্ভব হবে।

—আমাকে ভার নিতে বলছেন?

—যদি সম্ভব হয়।

হরদয়ালও উঠে দাঁড়িয়েছিলো।

নায়েব বললেন,—আপনি রাজী হলে রানীমার অনুমতি চাইবো।

হরদয়াল কি একটু চিন্তা করলো, বললো,—আপনি বললেই হবে। রানীমা পর্যন্ত যেতে হবে কেন?

তারপরে নায়েব মামলার কথায় গিয়েছিলো। ওপক্ষ একেবারে চুপচাপ। যেন রাস্তা কাটার ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওদের ভাবনা চিন্তা এখনও শেষ হয়নি। হরদয়াল প্রশ্ন করেছিলো জমিটা রাজকুমারের কিনা। নায়েব বলেছিলো, প্রমাণ হ'ক তা নয়, কিংবা সেটা মরেলগঞ্জের লীজভুক্ত জমিতে আছে, এবং লীজে এখানে ওখানে রাস্তাঘাট তুলবার শর্ত ছিলো কি না।

এখন সন্ধ্যা হচ্ছে। মিস্ত্রী কাঠগুলোকে গুছিয়ে তুললো। উঠে দাঁড়ালো, তাতেই যেন সন্ধ্যার সূচনা হলো। কাজটাকে গুটিয়ে তুলতে তুলতেও মিস্ত্রী তা যেন চোখের সম্মুখে মেলে দেখলো। তা থেকে হরদয়ালের মনে হলো সৌন্দর্যসৃষ্টি নাকি? পরখ করে দেখছে। লোকটি রোজই কাজ করে, কিন্তু তার মধ্যে টাকা উপার্জনের বাড়তি কি কিছু থাকে?

রাজকুমারের ঘরের আসবাবপত্র করার জন্য লোকটিকে গত বছর আনানো হয়েছে। নরেশ চিনতো। তারপর থেকে কাজের পর কাজ চলেছে। জাতে চীনা। ইতিমধ্যে একটি স্থায়ী ঘরও জুটেছে, রাজবাড়ির মালীদের ঘরের একটি। লোকটি অভ্যাসবশে হয়তো ডিজাইন তুলে যায়, কিন্তু অন্য অনেকে তার মধ্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করে। মৌমাছির মতো নাকি? কয়েকদিন আগে সে এক বইএ পড়েছিলো—মৌমাছি গান করে না। কর্মব্যস্ততায় সে উড়ে বেড়ায়, তার পাখা কাঁপে, মানুষ তাতে গুঞ্জরণ আবিষ্কার করে।

কিন্তু দেখো এই লোকটিকে এনেছে নরেশ, অনুরূপভাবে নরেশকে এনেছিলো সে নিজে। নরেশের কাজের সুখ্যাতি হয়েছে।

সকালে গৌরী ও নায়েবমশায় চলে গেলে হরদয়াল ব্রেকফাস্টে বসেছিলো। আর তখন সে নরেশ সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলো।

দেখা যাচ্ছে হরদয়াল তাদের মতো নয় যারা ব্রেকফাস্ট না করে পৃথিবীর মুখ দেখে না। একি তার আগের বিলাসের ফল? অথবা কোন ব্যাপারেই তাড়াতাড়ি করে কি হয়—এরকম

'এক মনোভাব থেকে ব্রেকফাস্টের ব্যাপারে ঢিলেমি? ওদিকে কিন্তু টেবল দেখলে মনে হবে ভৃত্য বাবুর্চির সংসারের পক্ষে তার ব্রেকফাস্টের ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

একটা জানলার পাল্লা খোলা। খানিকটা রোদ টেবলে এবং সেখান থেকে রুপোলি প্লেট চামচের গায়ে মাখামাখি করছে। পাশের জানালার কাঁচ থেকে রঙীন আলো মেঝের উপরে একটা রঙীন আয়তক্ষেত্র তৈরি করে ফেলেছে। রোদে পিঠ রেখে হরদয়াল ব্রেকফাস্টে বসলো।

সে বাদামযুক্ত হালুয়া দিয়ে ব্রেকফাস্ট শুরু করে ভাবতে শুরু করলো। কী যেন? ও, সে নরেশের কথা ভাবছিলো। ভদ্রলোকের নাম নরেশ পান। গত বছর তিন মাসের কড়ারে আনা হয়েছিলো। মিলিটারি-কনট্রাক্টরের এক ফার্মে এবং কখনও কখনও ফোর্ট উইলিয়ামে কাজ করতো। কাজের কথায় সেই কথাটাই মনে হলো হরদয়ালের এর আগে একবার যেমন হয়েছিলো—এ কাজটা তো নরেশের কুলকার্য নয়। চাষবাস করতো। তারপর এক সময়ে সে কি করে বা এইসব কাজে যুক্ত হয়। এখন এ বিষয়ে কিছু লেখাপড়া না করেও সে প্রায় ওস্তাদ শ্রেণীর একজন হয়ে উঠেছে। কোথাকার বীজ কোথায় উড়ে এসে পড়ে গাছ হয় দেখো। তারপর এক বছর হয়ে গেলো। এটাও কিন্তু কৌতুকের—তুমি বলতে পারো না নরেশ আছে বলেই মেরামতের কাজের বাইরে নতুন কাজ হচ্ছে, কিংবা নতুন কাজ করানো হবে বলেই তাকে রাখা হচ্ছে।

আগে প্রতি বছরেই কাজ হতো। গ্রামের গহরজান মিস্ত্রির পরিবারের পুরুষরা কাজ করতো। কখনও মুর্শিদাবাদ থেকে তাদের আত্মীয়স্বজন কাজের খোঁজে এলে যেন তাদের সুবিধার জন্যই কাজ করা হতো। এবং আজ থেকে তো মনে হচ্ছে সে পাকাপাকি থেকে যাচ্ছে। হয়তো কথাটা পূর্তবিভাগ না হয়ে বাস্তুবিভাগ হলে মানাতো। একটা বিভাগ যখন হয় তখন ধরে নিতে হবে অন্তত বেশ কিছুদিনের জন্য তা হলো।

এবং তার ভারটা আজ থেকে এসে গেলো তার নিজের দপ্তরে আজ থেকে। হ্যাঁ, ওটাকে হুকুমই বলতে হয়। যদি তার চারিদিকে খুব নরম কিছু থেকে থাকে তবে তা নায়েবের কথা বলার কায়দা। হরদয়ালের ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলা করে গেলো। অথচ তুমি কায়দাটাকে ধরতে পারো না।

ব্রেকফাস্টের টেবলে সে একাই, পাশে দাঁড়িয়ে তার ভৃত্য, দরজার কাছে বাবুর্চি।

হরদয়ালের হাতে চামচটা দুললো। যেন সে মিষ্টিটা পছন্দ করছে। কিন্তু চামচটা রেখে সে বরং কফির পাত্রটা টেনে নিলো।

এটা কি অস্বীকার করা যায়. ভাবতে গিয়েও গলা সাফ করতে হলো, নায়েবই কিছুদিন আগে তার অধস্তন কর্মচারী ছিলো।

তাই তো, আজ যেন, আজই প্রথম যেন, প্রমাণ হয়ে গেলো নরেশের এই ব্যাপারটায়—যে নায়েব একসময়ে শুধুমাত্র নায়েবই ছিলেন, এবং তখন হরদয়াল ছিলো দেওয়ান।

কফিটা শেষ করে উঠলো সে। যে জানলায় রৌদ্র আসছিলো তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। যেন দিনটার কি রং তা দেখলে বিস্ময়টা কাটবে। নিশ্চিতই আকাশে মেঘ নেই কিংবা ঝড়ো হাওয়াও বইছে না যে দিনটাকে গতকাল যা ছিলো তা থেকে ভিন্ন দেখাবে।

সে এ সময়ে, ব্রেকফাস্টের পরেই কাজ করে। লাইব্রেরীতেই তো। সে লাইব্রেরীতে ঢুকলো। ফাইলটা দিয়ে গিয়েছে গৌরী যাতে নায়েবের মন্তব্য আছে মামলা সম্বন্ধে। পাশের দরজা দিয়ে ভৃত্য গড়গড়া নিয়ে ঢুকলো। চেয়ারের পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখেও গেলো।

সম্মুখে ডেস্কের দিকে চাইলো সে। সমতল অংশটার উপরে অনেক কিছুই তো।

একটা সুদৃশ্য ট্রে'র উপরে সকালের আসা ডাক। চরণদাস নিজেই দিয়ে গিয়েছে। আর তখনই সে ম্যানিলা রং-এর খামটাকে এবং তার উপরের ঠিকানার হরফগুলোকে লক্ষ্য করেছিলো।

একটু দ্বিধা করে সেই চিঠিখানাই হাতে নিয়েছিলো। চিঠিখানা তার বন্ধুর। খুলবার আগেই সে ভাবলো কোন কোন কাজে কেমন করে যেন বাধা পড়ে যায়। বন্ধুর আগের চিঠির জবাব এখনও দেয়া হয়নি। কালও একবার সে ভাবতে বসেছিলো এ-বিষয়ে। কিন্তু রানী ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

চিঠিখানা খুললো সে। পুরো নোটশীট, কিন্তু বন্ধুর চিঠি সাধারণত যত বড় হয় তেমন নয়। হরদয়াল পড়লো। ইংরেজিতে বন্ধু লিখেছে : তার আগের চিঠির (যার জবাব সে পায় নাই) অনুসৃতিতে সে সানন্দে জানাচ্ছে পৃথক প্যাকেটে শেকস্‌পীয়র পাঠানো যায়। এক সিভিলিআন প্রমোশন-প্রাপ্ত ও অন্যত্র স্থাপিত হওয়ায় ফার্নিচার ইত্যাদি সহ হস্তান্তর করে। সুতরাং মরোক্কা বাঁধাই হলে রিবে মালিকের নাম ঘষিয়া তোলা। পেঁছানো মাত্র প্রাপ্তি-সংবাদ দিবে। পুনশ্চ বলে সে জানিয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয় মহলে খোঁজ জানতে পারা গেলো ডান্‌ নামে (লক্ষ্য করিবে উহা ডান্‌) এক কবি ছিলো বটে। কিন্তু ইংরেজি ভার্সে লিখিত হলেই তা কবিতা হয় এমত নয়। মিল্টনের পরে তো বার্নস ব্লেক, মধ্যে আর কবি কে?

চিঠিটা যত্ন করে খামে পুরলো সে আবার। একটা প্রশান্ত তৃপ্তি যেন অনুভব করলো হরদয়াল। তাই বলে সে তো ডাকঘরে খোঁজ নিতে যেতে পারে না। বই-এর প্যাকেট পেঁছনোর এক ঘণ্টার মধ্যেই তার হাতে নিশ্চয় আসবে। তাই বলে বাঁ হাতটা উঁচু করে তার উপরে গাল রেখে সানন্দ দৃষ্টিতে বই-এর শেল্‌ফগুলোর দিকে চাইলো সে।

কিন্তু তখনও চিঠি লেখা হয়নি। অর্ধসমাপ্ত চিঠিটাকে সরিয়ে রাখতে হয়েছিলো, কারণ বাগচী নিজে এসেছিলো স্কুলের বিষয়ে আলাপ করতে। একটা সমস্যাই যেন। চিঠিটা পেয়ে বাগচী বার দুয়েক পড়েছে, যাকে বলে তার উপরে ঘুমিয়েছে। কিন্তু এখনও কর্তব্যটাকে সে স্পষ্ট দেখতে পায় নি। এদিককার বিদ্যালয়-পরিদর্শক এতদিনে যেন এই বিদ্যালয়ের সংবাদ পেয়েছেন। এবং তিনি বিদ্যালয়টিকে পরিদর্শন করতে বাসনা করেছেন। এটা তাঁর কৌতূহলের ব্যাপার হলেও সরকারী কর্তব্যও বটে। তিনি বস্তুত লিখেছেন : ইহা আমার কর্তব্য বলিয়া বোধ করি যে যতশীঘ্র সম্ভব আপনার বিদ্যালয়- পরিদর্শন করা হয়।

বাগচী বলেছিলো উনি এসে পড়তে পারেন, তার আগেই জবাব যাওয়া দরকার। নতুবা লাঞ্চের পরে আসতাম।

হরদয়াল চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিলো বাগচীর মত কি। এতে কি স্কুলের লাভ ক্ষতি কিছু আছে?

বাগচী বলেছিলো, কারো কারো মতে, যেমন নিওগিমশায়, এ সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না। স্কুল সরকারের নজরে পড়লে তার মর্যাদা বাড়ে। নানারকম সুযোগও জুটে যায়।

—তাকি শিক্ষক অথবা পাঠক্রম নির্বাচন, অথবা সরকারী গেজেটে আনা এবং আর্থিক আনুকূল্য।

—নিওগি বলেন সবই হতে পারে। সব স্কুলই তাই চায়।

—এখনই শেষ কথা বলা কঠিন। যে সুবিধা দেয় তার পক্ষে নিজের মতও চাপাতে চাওয়াও অসম্ভব নয়।

—নিওগি বলেন, শিক্ষার ব্যাপারে যাঁরা কর্ণধার শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের মতামতের নিশ্চয়ই

মূল্য আছে। এবং এই শিক্ষাধারাই ইংরেজ জাতকে মহৎ করেছে, আমাদের দেশের কুসংস্কার দূর হচ্ছে।

—ঠিক তাই। হেসে বলেছিলো হরদয়াল।—এর একটাও আপনার নিজের মত নয়। আপনি হয়তো বৃহত্তর মঙ্গল চিন্তা করে নিজের মতকে কুণ্ঠিত করে রাখছেন। কিন্তু আমি জানি ঠিক এখন আপনি যা ভাবছেন তা ভাষাশিক্ষাকে অন্তত তার ব্যাকরণ ও বানানকে কম মূল্য দিতে যা কলকাতায় গ্রাহ্য হবে না।

বাগচী চলে গেলেও চিঠিটায় আর হাত দেয়া হয়নি। এখন আবার সন্ধ্যা পার হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে সে এই আরামকেদারায় বসেছে। মশালচি আলো রেখে গিয়েছে। এখন কি সে ডায়েরি লিখবে? দু-তিন দিন তা হয় না।

হরদয়াল উঠে পাশের ঘরে গেলো। সেখানে প্রভিশনের আলমারি। আলমারিতে তালা, তালায় চাবি ঝুলছে। আলমারি খুলে মদের বোতল এবং গ্লাস নিয়ে হরদয়াল লাইব্রেরীতে ফিরলো। গ্লাসটা লম্বা, সরু, গায়ে কাচের মধ্যে সাদা রঙে একটা লতার মটিফ। হরদয়াল নিজের অজ্ঞাতেই যেন হাসলো ডেস্কের উপরে বোতল আর গ্লাস পাশাপাশি রেখে।

ডায়েরির মরোক্কো বাঁধাই মলাটের উপরে লিখবার প্যাড্। প্যাড্ আর ডায়েরির মাঝখানে সেই অর্ধসমাপ্ত চিঠিটাকে পাওয়া গেলো।

হরদয়াল বোতল থেকে তার লম্বা গ্লাসটাকে ভরে নিলো। এবার বন্ধুর চিঠিটাকেও বার করলো। হ্যাঁ, সেই চিঠিতেই বন্ধু জানিয়েছিলো সে গত একমাস মদ্য স্পর্শ করে নি। আশা প্রকাশ করেছিলো হরদয়ালও ইচ্ছামাত্র সেরকম পারবে।

হরদয়াল চিঠিটা হাতে ধরেই গ্লাসটাকে ঠোঁটে তুললো। দেখো কাণ্ড এই বলবে যেন সে। ইচ্ছামাত্রই কি সব কাজ হয়? কিন্তু বন্ধুর চিঠির এটা জবাব নয় বরং ডায়েরিতে লিখবার মতো কিছু।

ডায়েরি কেন লেখা হয়? এর সহজ উত্তর আছে। যেমন নিওগিমাস্টার কথায় কথায় হরদয়াল ডায়েরি লেখে জানতে পেরে শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়েছিলো। নিওগি-মাস্টারমশায়ের ডায়েরিতে দিনে কতবার মিথ্যাভাষণ হলো, কতবার লোভ থেকে ত্রাণ পাওয়া গেলো, কতবার বা ঈশ্বরের গুণগান করা হয়েছে তা লেখা থাকে। হয়তো বা একসময়ে এরকম চারিত্রিক উন্মেষের সহায়ক হিসাবেই হরদয়াল ডায়েরি রাখতে শুরু করে থাকবে। এখন? ইচ্ছামাত্রই মদ ছাড়বে এমন চারিত্রিক দৃঢ়তা কি তার আছে? এখন তেমন ইচ্ছাই কি হবে?

একসময়ে কলকাতার সত্যনির্ভর ইংরেজিনবিশ ছাত্রদের মতো সে হয়তো সব অবস্থাতেই সত্য বলতো। সেই যে গল্প আছে যে তেমন একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো তুমি মদ খাও—সে বলেছিলো খাই; জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, অসৎ স্ত্রীলোকের বাড়িতে যাওয়া-আসা করো—সে বলেছিলো করি।

রানীমার জন্মতিথির উৎসবটাই ধরো। হঠাৎ এটা চালু হয়েছিলো কিছু একটাকে ঢাকতে। পুত্রের বিপদমুক্তির জন্য রানী কালীপূজা করবেন। সেটা অনভিপ্রেতভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তাই বলা হলো রানীমার জন্মতিথি। এ বছরের উৎসবটা এসে পড়েছে। আমলারা সেই সুযোগে নাটক করতে চাইছে। কিন্তু কিসের বিপদমুক্তি। রাজকুমার অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে একটা মানুষ খুন করেছিলেন, তাও সে মরেলগঞ্জের তহশীলদার। হরদয়ালকে এই খুনের ব্যাপারটাকে জেনেও গোপন করতে হয়েছিলো। সব সময়ে কি সত্য বলা যায়?

অন্যমনস্কের মতো গ্লাসটাকে নামিয়ে সে বন্ধুর চিঠিটাকে চোখের সামনে ধরলো।

বন্ধু সে চিঠিতে কুশল প্রশ্ন করেই তাকে বলেছিলো কলকাতায় যেতে। জানতে চেয়েছিলো হরদয়ালের স্কুল কেমন চলছে। নবনিযুক্ত নিয়োগী মাস্টারমশাই যে লোহার মতো খাঁটি মানুষ এ বিষয়ে আবার আশ্বাস দিয়ে জানতে চেয়েছিলো কেমন সে পড়াচ্ছে। সংবাদ দিয়েছিলো প্রায় দু মাস হয় সে মেট্রোপলিটনে অধ্যাপকের পদপ্রাপ্ত হয়েছে। ঘোষণা করেছিলো সে গত একমাস মদ্য স্পর্শ করে নি এবং আশা প্রকাশ করেছিলো হরদয়াল ইচ্ছা-মাত্র সেরকম পারবে। চিঠির পরের অনুচ্ছেদে সে বলেছে গ্রামের রাজসরকারের চাকরি যতই ভালো হ'ক হরদয়ালের মতো মানুষের পক্ষে কলকাতার বাহিরে থাকা আর উচিত হয় না। কেন না দ্রুতউন্নতিশীল জীবনের পরাকাষ্ঠা রাজধানীর বাহিরে জীবন কি অপচয় মাত্র নয়। বর্তমানে হাইকোর্টের বিষয়ে যেরূপ শোনা যায় তাতে ব্যবহারজীবীদের আশাতিরিক্ত উন্নতির সুযোগ আসছে। হরদয়াল কলকাতায় গেলে সে যে অনায়াসে দু'চার হাজার তঙ্কা উপার্জন করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে হয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা রামমোহনের পুত্র রামপ্রসাদ এবং আরও আরও অনেকে কোন না কোন ভাবে হাইকোর্ট স্থাপিত হওয়া মাত্র তাতে যুক্ত হবেন। নতুন জীবনে রওয়ানা হওয়ার মতো সঞ্চয় কি এখনও হরদয়ালের হয় নাই।

হরদয়াল নিজের অর্ধসমাপ্ত চিঠিটাকে উপরে তুললো আবার। মেট্রোপলিটানে অধ্যাপকের পদপ্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলো সে বন্ধুকে। স্কুল ভালো চলেছে। নিওগিমশায় কিছু পাগলাটে বটে, বোধ হয় কার্পণ্য দোষ আছে যার জন্য তিনি গর্ববোধ করেন, কিন্তু পড়ান ভালোই। সে জানতে চেয়েছিলো এই চার-পাঁচ বছরে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-বিদ্যালয় জনসমাজে কি কি পরিবর্তন সূচনা করেছে।

নিজের কথা সে কিছু লেখে নি। কেন সে গ্রামে থাকে অর্থাৎ দ্রুত ধাবমান কলকেতা শহরের আধুনিক সমাজের বাইরে, কি তাকে গ্রামে আকৃষ্ট করে—এসব কিছু জানায় নি সে। সে কি লিখবে গ্রামের সৌন্দর্য অথবা শান্তির কথা? এখানে কি কিছু ঘটে? এখানে কিছু ঘটে না এটাই সংবাদ।

বন্ধুর চিঠিটা সযত্নে রেখে দিলো হরদয়াল।

কয়টি সত্যভাষণ হলো, কয়টি মিথ্যাভাষণ হলো, ডায়েরি তার হিসাব না হয়েও অন্য রকমের কিছু হতে পারে। হরদয়াল চিন্তা করলো আমরা কি নিজের স্বরূপ নিজের কাছে প্রকাশ করি? আত্মজীবনীতে যেমন করা উচিত? অর্থাৎ ডায়েরি আত্মজীবনী হতে পারে। যাতে কোন পোজ থাকে না। হরদয়াল ভাবলো পোজ শব্দটার বাংলা কি হবে?

দেয়াল ঘড়িতে মৃদু গম্ভীর শব্দ হলো। রাত হয়েছে তা হলে। আত্মজীবনীতে নিশ্চয়ই পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধেও সংবাদ থাকে। কারণ মানুষের মন তো নিরালম্ব নয়।

হরদয়াল উঠলো। আবার আলমারি থেকে নতুন একটা কাঁচের প্লাস নিয়ে এলো। একবার ব্যবহার করা প্লাসে আবার মদ নিলে কি স্বাদে তারতম্য হয়?

ডায়েরিতে অন্যের সম্বন্ধেও মন্তব্য থাকে। আত্মজীবনীতেও অন্যের জীবনী এসে পড়ে। এই গ্রামে যদি কারো জীবনের কথা লেখা যায় তিনি নিশ্চয়ই রানী? তাই নয়? অন্য-দিকে বন্ধু ভাবছে এখনও সে দেওয়ান। না সে আর দেওয়ান নয় এ কথাও বন্ধুকে জানায় নি। এটা কি একটা পোজ নয়? এই পোজ থেকে মুক্তি ডায়েরি লেখার যুক্তি হতে পারে।

হরদয়ালে চোখের কাছে কি বেদনার চিহ্নের মতো কিছু দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেলো। হ্যাঁ সে আর দেওয়ান নয়। আজই কি তা আবার প্রমাণ হলো না? তার একসময়ের অধস্তন নায়েবমশায় এখন অনায়াসে সে কি কাজ করবে তার নির্দেশ দিতে পারেন। এটা কি

লজ্জার বিষয় বলেই ডায়েরিতে স্থান পায় নি?

অন্য এক ঘটনার কথা মনে আছে তার। সেদিন তখন অনেক রাত হয়েছে। হরদয়াল তার নিজের শয্যায় একখানা বই পড়ছিলো। পদশব্দে এবং বোধ করি সুগন্ধেও সে বই থেকে চোখ সরিয়েছিলো। রানী স্বয়ং, একা! রাজকুমারের বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে কলকাতার এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি ফিরে যাওয়ার পরে রানীর নিজের আত্মীয় স্থানীয় এক মহিলা কিছু লিখেছিলো চিঠিতে যাতে রানী অপমানিতা বোধ করেছিলেন। রানী বাগচীমাস্টার এবং তার স্ত্রী কেটের গ্রামে থাকা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। হরদয়াল বলেছিলো তারা নিরপরাধ। সে বলেছিলো এর জন্য রাজকুমারের বিবাহ বন্ধ হতে পারে না। সে এই পাত্রীর সঙ্গেই বিবাহ ঘটিয়ে দেবে। রানী তাকে বরখাস্ত করেছিলেন। হরদয়াল বলতে পেরেছিলো আমার স্কুল? রানী তাকে সাধারণ প্রজাদের একজন হয়ে সে বিষয়ে আবেদন করতে বলেছিলেন।

ডায়েরিতে (তা যদি আত্মজীবনীও হয়) অন্যের চরিত্র ফুটে ওঠে। হরদয়ালের মনশ্চক্ষে রানী যেন ফুটে উঠলেন। কেন এই পদচ্যুতি তা কি সে বুঝতে পেরেছে? রানীকে শেষ যেদিন দেখেছে সে তখন যেমন তাঁকে দেখিয়েছিলো তেমনটাই যেন হরদয়াল দেখতে পেলো। রাজকুমারের জন্য কাল রাত্রিতেই তো প্রতীক্ষা করতে হয়েছিলো। রানীর মতো এমন চরিত্রই বা কার এই গ্রামে?

বাগচীমাস্টার এ গ্রামে থাকায় রানীর আপত্তি শুধু সেটুকু ছিলো নিশ্চয় যেটুকু মাত্র তাদের জীবনযাত্রার প্রভাব রাজবাড়ীতে প্রবেশ করে। নতুবা তাঁর প্রজারা কে কি ধর্ম আচরণ করে তার জন্য চিন্তার কিছু নেই। অর্থাৎ রাজকুমারের উপরে কেটের প্রভাব পড়ছে। কেট বিদেশিনী এবং সুন্দরী। হ্যাঁ, তরুণ মনে প্রভাব রাখতে পারে এমন সৌন্দর্যই বটে তার। রাজকুমারের তরুণ মনকে রূপসীর প্রভাব মুক্ত রাখাই কি রানীর চেষ্টা। রাজকুমার কেটকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলো এই জেনেই কি রানীর ক্রোধ।

এদিকে দেখো সেদিন আবার অন্যভাবনাও উপস্থিত ছিলো। দুবার অন্তত, যদিও হয়তো তা দুই রকমের সুরে, তিনি বলেছিলেন নয়নতারা রাজকুমারের সঙ্গে থাকাতেই ভাবনা। অথচ রানীর প্রশ্রয় ছাড়াই কি নয়নতারা রাজকুমারের সঙ্গী হতে পারতো?

রানীর মুখ কি রকম দেখিয়েছিলো সেই প্রতীক্ষার সময়ে যখন তিনি দুবার বলেছিলেন নয়নকে নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা। সেই আয়ত চোখ দুটির কোলে কি হাসি ছিলো! অথবা কি রানীর গালে কিছু টোল খেয়েছিলো। একটা আলোর মতোই রানীর মুখটা যেন স্মৃতিতে ধরা দিচ্ছে।

কেন এই প্রশ্রয় নয়নতারাকে তা ভাবতে গেলে কোন হেতু কি খুঁজে পাওয়া যায়? রানী যা কিছু করেন তার অনেকটা রাজনৈতিক কৌশল—এরকম একটা প্রত্যয় আছে। কেটের চাইতেও নয়নতারা কি বেশী সুন্দরী নয়? হয়তো রূপ দুটি দুরকম কিন্তু তুমি বলতে পারো না নয়নতারার চাইতে বেশী আকর্ষণীয়া কেউ হতে পারে।

তা হলে এটা কি বুদ্ধিমতী রানীর বিষের ওষুধ হিসাবে বিষ প্রয়োগ করা? বিষস্য বিষৌষধি। রানী কি প্রকৃতই তেমন বিচক্ষণ চিকিৎসক।

হরদয়ালের মুখে একটা হাসি যেন দেখা দিলো। যেন সে ডায়েরিতে মন্তব্য করবে— রানী, কিন্তু খুব হুঁশিয়ার হয়ে এই বিষ প্রয়োগ করা উচিত হবে।

কিন্তু এতে তার পদচ্যুতির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদেশী প্রভাবকেই কি

রানীর আপত্তি? ব্যাপারটা কি অত সহজ? বিদেশী প্রভাব কি আলোর ডোমগুলিতে, পর্দাগুলিতে, আসবাবপত্রের অজুহাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে না রাজবাড়িতে। রানী চরিত্রই যেন হরদয়ালের সম্মুখে। আজ সেটাই সব চাইতে মূল্যবান এমন অনুভব করলে সে হাসি হাসি মুখে, যেন সে একজন লেখক যে নিজেই একটা চরিত্র সৃষ্টি করে তার চারপাশ থেকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। তখন তো লেখক অন্য সব কিছু ভুলেও যায়, নিজের ক্ষতি যদি কিছু থাকে তাও।

ওটাও কি বিদেশী প্রভাব দূরে রাখা? ওই মুন্সেফী কোর্ট দূরে রাখার ব্যাপারটা। পরশু থেকে আজ পর্যন্ত অনেকবার যেন কলকাতায় নতুন আদালত স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। অনেকেই যেন বলেছে। সেজন্যই কি মনেও আসছে হরদয়ালের। কলকাতায় হাইকোর্ট বসবে। এবং দেশের সব আদালত তার অধীনস্থ হবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর আদালতগুলি উঠে যাবে। ছোট ছোট আদালত স্থাপিত হবে হাইকোর্টের এক্তিয়ারে। রানী চান না তেমন কোন আদালত গ্রামে স্থাপিত হয়। অন্য অনেকে এর বিপরীতটাই কি চিন্তা করছে না।

মুন্সেফী কোর্ট আসাটা হরদয়াল নিজে সমর্থন করে। সে এ-ধরনের শাসন বিস্তারে শুভ দেখতে পায় বৈকি।

কিন্তু রানী কি চাইছেন? তিনি কি কল্পনাতেও নিজের আদালত স্থাপনের কথা চিন্তা করেন? বেহার-রাজ্যের আদালতের কথা বলছিলেন না? অন্য কেউ হলে এ সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতো না হরদয়াল। কিন্তু রানীর যত কোমল লাবণ্য মস্তিষ্ক তেমনই তীক্ষ্ণধার নয় কি? বেহার-রাজ্য তো একটা অর্ধ-স্বাধীন করদ রাজ্য।

রাত হলো বৈকি? ইতিমধ্যে ভৃত্য একবার পর্দার ওপারে এসেছিলো। দশটা বাজে ঘড়িতে। লাইব্রেরীর এটা একটা কৌতুক যে রাত কত হলো তা এখানে বোঝা যায় না যেন।

বন্ধু তাকে বলেছে কলকেতায় গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে। কিন্তু কলকেতায় কি হয় জানি না, এখানে আমাদের কিন্তু অনেকের বয়স হয়েছে। বয়স হলে তার অতীত থাকে না? অতীতকে কি বিসর্জন দেয়া যায় সব সময়ে, কিংবা সবটুকু অতীতকে।

ভৃত্য এসে এবার বললো টেবল পাতা হয়েছে।

হরদয়াল উঠলো।

লাইব্রেরী থেকে খাবারঘরে যেতে একটা সরু পথ পার হতে হয়। তার একটা জানালা রাজবাড়ির দিকে। চলতে চলতে কানে এলো, মনে হবে যেন জানালার ওপারেই বাজছে। তা সম্ভব নয়। কারণ এটা পিআনো এবং রাজকুমার বাজাচ্ছেন। তা হলে বরং এটাই প্রমাণ হয় রাজকুমারের ঘর যেখানে তিনি পিআনো বাজান তা দেওয়ান কুঠির এই দিকেই।

একটু দাঁড়ালো হরদয়াল। ইতিপূর্বেও বাজনা কানে এসেছে তার। রাজকুমার যে বাজান তা সে ভালোভাবেই জানে। প্রতিবারেই স্বরলিপি খোঁজ করতে হয় কলকাতায় তাকে। বাজনাটার বৈশিষ্ট্যই যেন জানালার কাছে নিয়ে গেলো তাকে। গম্ভীর মধুর কিছু যেন বিষণ্ন। যেন মানুষ যখন চাঞ্চল্যর বাইরে যায় সেই বয়সের সুর। হরদয়ালের মনে পড়লো এই গ্রামে যারা চল্লিশ পার হয়েছে তাদের কথা; সে নিজে, বাগচী, রানীমা। কিন্তু এই গম্ভীর মধুর-ক্লান্ত সুর কি প্রাণ থেকেই উঠে আসে না। পছন্দ অপছন্দে মানুষের স্বরূপ ধরা পড়ে। এই সুর অন্তরে অনুভব করার মতো গভীর হয়েছে নাকি রাজকুমার ইতিমধ্যে?

হরদয়াল একবার তার বন্ধু কলকাতার মেট্রোপলিটন কালেজের অধ্যাপক ভাদুড়ী

মশায়কে লিখেছিলো : এখানে কিছু ঘটে না। তখন তারা রানীমার জন্মোৎসব পালনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো তাকে যদি ঘটনা না বলা হয়।

ঘটনা কি সে সম্বন্ধে ভিন্নমত আছে। উপরন্তু যদি কেউ সে সময়ের দলিলদস্তাবেজ উল্টেপাল্টে দেখে তবে তার হঠাৎ অনুমান হ'তে পারে তখনই তো এক নতুন জাতের সব ঘটনার সূচনা হচ্ছিলো গ্রামে। একটা উদাহরণ নাও। কাছারীতে তখন রানীমার জন্মোৎসবের কথাই প্রাধান্য পাচ্ছিলো—তা ঠিকই, কিন্তু সেই এক রকমের যুদ্ধ যার অন্য নাম আধুনিকতাও বলা যায় তার কথাও এসে পড়ছিলো।

মূলে সেই রাস্তা কাটার ব্যাপারটাই। সোজা সে কথা? নাক কেটে দেয়ার চাইতে কম কিছু? তাও কার? ডানকানের? হ'তে পারে সে স্কচ্, একেবারে ষোলআনা ইংরেজ নয়, হয়তো ব্যাবসাটাই ভালো বোঝে। তা হ'লেও সে কি রাজার দেশের লোক নয়? জ্ঞাতকুটুম্বদের মধ্যে পড়ে না? অথচ মাথা ফাটলো না দু পাঁচ জনের, দুচার জনের বুকে বল্লম বিঁধলো না, এক কথায় রক্তে মাটি ভিজলো না। এদিকে নায়েব মশায়ও যেন ব্যাপারটাকে নিজের মনের মধ্যে চেপে রেখেছেন। রাগ (নাকি ক্রোধই বলবে) ছাড়া কি? দারুণ ক্রোধ। নতুবা আলাপ আলোচনা নেই, কথাবার্তা নেই, শাসানো নেই। লাঞ্চো খেলে তো একই সঙ্গে ব'সে (না হয় নায়েব নিজে খান নি,) আর সেই লাঞ্চো থেকে উঠে এঁটো মুখেই হুকুম গেলো সড়ক কাটার। এদিকে সব শুনলাম। যেন কিছুই নয়। তার ফলে অস্বস্তিটাই বাড়ে। কিছু না ঘটাই তো একটা ঘটনা।

এ-সব লক্ষ্য করেই তারা বলেছিলো: হ'তে পারে তখনও স্যার বার্নেশ্ পীকক্ কলকেতার হাইকোর্টে জমকালো হ'য়ে বসেনি। কিন্তু এখানে যেন পরে যা হবে তার সূচনা সে বারই দেখা দিয়েছিলো। একটা বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা। তুমি তোমার ধর্মমত, আর্থিক সঙ্গতি এমন কি চামড়ার রং নিরপেক্ষ অন্য সকলের সমান। একি আগে কখনও ছিলো? তুমি বিধর্মী হ'লেই কোণঠাসা, তোমার চামড়ার রং কালো ব'লেই তোমার কথা মিথ্যা এই না এতদিন দু পাঁচশ বছর ধ'রে হ'য়ে এসেছে। এখন দেখো সমান হচ্ছে। ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা হবে। এই সমান কথাটা নিয়ে রসিকতা আছে। ফুটপাতে শুয়ে থাকা ধনী নির্ধনের পক্ষে সমান অপরাধ। সত্যমিথ্যা নিয়েও কম গোলযোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে সত্য কি তা নয় যা প্রমাণিত হলো! আর প্রমাণ মানেই জেরার প্যাঁচ আর হলপ্ ক'রে বলা কথা।

কথাটা ন্যায়নীতি নিয়ে। ন্যায়নীতির কথায় অবশ্যই কিছু কিন্তু আছে। এ বিষয়ে নায়েবমশাই ও হরদয়ালের আলাপই উদাহরণ হ'তে পারে। হরদয়াল বলেছিলো দেখছি জমিটা মূলে ফরাসডাঙ্গার, দখলদার কৃষক শামসুদ্দিন। নায়েব বলেছিলো তা হ'লেও প্রমাণ হয় না জমিটাতে মনোহরের স্বত্ব অর্শাচ্ছে। হরদয়াল বলেছিলো জমিটা হয়তো মনোহরের কাছে দায়বন্ধ। নায়েব বলেছিলো জমি দায়বন্ধ হ'তে পারে তাতে কিন্তু তার উপরে স্থায়ী রাস্তা করার অধিকার মনোহরের জন্মায় না। হরদয়াল হেসে বলেছিলো, তা বটে, কিন্তু আমরাই বা কোন্ পক্ষ? এটা কি হরদয়াল আর নায়েবমশায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য? হরদয়ালের মন কি এখনও রাজনীতিতে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে। শেষ পর্যন্ত রাজনীতির দাবি তাকেও মানতে হয়, কিন্তু কিছুটা তা কি নিজের মনের সঙ্গে বিবাদ করে? অন্যদিকে নায়েবমশায় যেন ন্যায়-অন্যায় বিচারের অসারত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

জমিটা ফরাসডাঙ্গার যে বলবে তা কি প্রমাণসাপক্ষ নয়? যদি অন্যরকম প্রমাণ হয় তা কি সত্য হয় না? সত্য কি? যা এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী তোমার বক্তব্যকে প্রমাণ করে।

নায়েবমশায়ের এই মনোভাবকে তাদের একটা বিশেষ আধুনিকতা ব'লেই মনে হয়েছিলো। মানুষ এখন থেকে ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা থেকে স'রে যাওয়ার এক নতুন পথ পাবে। এতদিন তো হাতাহাতি, দাঁতের বদলে দাঁত, নাকের বদলে নাক নেয়া ছিলো। এখন যেন তা সব থেকে দূরে থাকা হবে কৌশল। যে মামলায় জিতলো সে তো শান্ত হ'লোই. যে হারলো সে-ও ভাবলো কি আর করা যাবে বলো এবার থামো। যদি বলা হয় এ-ধরনের শান্তিতে প্রকৃত কিছু লাভ হ'তো না, তা হ'লে অপর পক্ষ বলবে যা নিয়ে বিবাদ তারই বা প্রকৃত মূল্য কি? কিছুদিন পরে বিবাদের উভয়পক্ষই বুঝতে পারে যা নিয়ে এত উত্তেজনা, কলহ, তা সবই নিতান্ত মূল্যহীন।

যাকে অন্যায় বলে মনে হয় তার প্রতিকারের জন্য মানুষের যুদ্ধ করার দিকে ঝোঁক আছে। এবং এই আধুনিক প্রথায় সে ঝোঁকটারও তৃপ্তি হ'য়ে থাকে। সূচনায় চিনতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে বটে। দলিল দস্তাবেজ, কমিশন আর মিশন, গাউনপরা শিক্ষিত উকীল-ব্যারিস্টারের ছুটোছুটি আদালতে, গাউন ছাড়াই তাঁদের ছুটোছুটি সেনেটে আর মাঠে—একশ' বছরের সে-সব বাক্‌যুদ্ধের সূচনা পাবে এতেই। আর এও যে এক রকমের যুদ্ধ তা নাকি রানীমাই উল্লেখ করেছিলেন। অন্তত তাঁর কথাতেই যুদ্ধ শব্দটার উল্লেখ ছিলো।

কেউ কেউ ছিলো যারা এসব মানতো না। তাদের মতে আধুনিকতার সূচনা বলা ঐতিহাসিক ভুল। পরে যেসব ঘটনা ঘটেছিলো দেখতে সে রকমের হ'লেই পরের ঘটনাগুলোর সঙ্গে এতদিন আগের ঘটনার যোগ থাকে না। এদিকে নায়েব, ওদিকে ডানকান, মনোহর। কিছু দূরে কীবল এবং হরদয়াল। বলবে রাস্তা কাটা সীমানা নিয়ে হাঙ্গামাহুজ্জত এমন একটা ঘটনা যার পরিণতি লাঠালাঠি ফৌজদারি। কিন্তু বৈশিষ্ট্যমূলক ঘটনাকে অন্য পরিণতিতে নেয়াই চরিত্রের স্বভাব।

অন্যান্য দিনের মতো কাছারীতে কাজ হচ্ছে। নিঃশব্দেই বলা যায়। অর্থাৎ নায়েবমশায়ের খাশ কামরার দিকে যত এগোবে ততই নিঃশব্দ। নতুবা এ ঘরে ও ঘরে চাপা গলার আলাপ, এমন কি তামাক টানার মৃদু শব্দ কি আর শোনা যাবে না?

কিছুক্ষণ আগে জমানবিশ মহেন্দ্র বেরিয়েছে নায়েবের কামরা থেকে, এখন আবার সুমারনবিশ সুরেন্দ্রর ডাক পড়লো। জমানবিশকে চিন্তাকুল মুখে বেরোতে দেখা গিয়েছে।

তাকে সে অবস্থায় যে দেখেছে সে সদর আমিন সোনাউল্লা। সোনাউল্লা চট্‌ ক'রে সামনে যে দরজাটা পেলো তা দিয়েই ঢুকে পড়লো। সে ঘরটা ল মোহরার গৌরীর।

সোনাউল্লা বললো,—গতিক ভালো দেখি না।

—শুনছি তাই। বললো গৌরী।—আসলটা জানেন কিছু?

—আরে আমি ভাই লেঠেলদের সর্দার। কাগজপত্রের খোঁজ কি রাখি?

যেখানেই জমি নিয়ে বিবাদ সেখানেই আমিনের ডাক পড়ে। জমি মাপজোখের জন্য সঙ্গে লোকলস্কর থাকে, এবং যেহেতু বিবাদ সঙ্গে দু চারজন পাইক-বরকন্দাজও। এ থেকেই সোনাউল্লা নিজেই লেঠেলদের সর্দার কথাটা নিজের সম্বন্ধে তৈরি করেছে।

সে হেসে বললো,—আমিও ভাবছি আলি ব'লে বেরিয়ে পড়ি। বিলমহলের মাফজোখ শেষ করে ফেলি।

—আপনার কি মনে হয় গতিকটা মন্দ কাজ ফেলে রাখার জন্য?

—শুনছি গত বছরের তুলনায় এই আট মাসের গড় আদায় বেশ কিছু কম। পরগণা নায়েবদের কাছে চিঠি যাচ্ছে নাকি।

—আপনার ভদ্রপুরের দত্তবাবুদের ঝামেলাটা মিটলো?

—ওটা আর আমার ঝামেলা নয়। বাঙালী নীলকরের নাম শুনেছো? দত্তবাবুরা নীলকর হ'তে চাইছে।

—লাভ?

সাতপুরুষে ব্যাবসাদার ওরা। তেজারতী বন্দকী তো ছিলোই এখন দাদনী ব্যাবসা। শুনছি আগে তাঁতীদের মহাজন ছিলো। এখন তাঁতী কই? নীল ছাড়া আর ব্যাবসা কোথায়? একটা তুলোর খেত দেখো?

—কারখানাও করবে?

—আপাতত মরেলগঞ্জের সঙ্গে বন্দোবস্ত। কিন্তু তোমার ঘরে মুসলমানী হুঁকো যদি না রাখো, আমার আসাই বন্দ করতে হবে।

—রাখবো। গৌরী বললো,—শামসুদ্দিনের দরুন সেই রাস্তাকাটার জমিটা আপনি মেপেছিলেন নাকি?

—কবে! না এবার উঠি। চক্ ইসমাইলের দিকে যাবো। ভদ্রপুরের কাননগোকেও চিঠি দিতে হবে। আরে গৌরী এবার রানীমার জন্মোৎসবের খাওয়াদাওয়ার ইন্‌চার্জ্জ কে? গতবার মুসলমান জোতদারেরা কলাপাতায় খেতে বিরক্ত হয়েছিলো।

—উঠেছিলো বটে কথাটা। দেখতে সুন্দর হয়নি। মনে হয় সুরেনবাবুই ভার নেবেন। টেবল চেয়ার হ'লেই হয়।

নায়েবের খাশ কামরায় সুমারনবিশ সুরেন্দ্র ঢুকে দেখলো নায়েব তখনও জমার বই দেখছেন। পাশে গতসনের জমার চুম্বক-নথি। আঙুলের ডগায় ডগায় হিসাব হচ্ছে।

নায়েব বললো,—বসো, সুরেন্দ্র।

দু-পাঁচ মিনিট আরও হিসাব চললো। চুম্বক নথিতে লাল পেন্‌সিলের দাগ পড়লো। খাশ বরদারকে ডেকে নায়েব বললো, রানীমার সঙ্গে দেখা করবো। হুকুম আনো। আর্জি নিয়ে খাশ বরদার চ'লে গেলো জমা বই ঠেলে দিয়ে নায়েব মুখ তুললো।

নায়েব বললো,—দেখো, সুরেন্দ্র, দেওয়ান উৎসবটা সুরু করেছিলো। তখন নিশ্চয় হেতু ছিলো। এখন কিন্তু ওটা আমাদেরই ব্যাপার। আমরাই উৎসাহ নিয়ে এগোবো। যাঁর জন্মতিথি তিনি কি আর বলেন? এবার এমন ভুলটা হ'লো কি ক'রে? একমাসও আর নেই।

—এবার তিথিটাই আজ্ঞে এগিয়ে এসেছে।

—হ'লেই বা। কাল সমার দেখতে দেখতে হঠাৎ নজরে না পড়লে আরও কয়েক দিন পিছিয়ে যেতো যোগাড়যন্তর।

—তা কি আর হ'তে দিতাম হজুর!

—বেশ, আজই তা হ'লে দফাওয়ারী আগাম হিসাবটা ধরো। নাকি একেও তোমরা বড্‌জেট্ বলবে?

সুমারনবিশের উৎকণ্ঠাটা গেলো।

সে বললো,—সব পরগণার সব জোতদারদের কি বলা হবে?

—গতবারও বলেছিলে বটে। কিন্তু এক জায়গায় তো থামবে। বার্ষিক আয় পাঁচ হাজার পর্যন্ত পত্র দাও। জমানবিশের সেরেস্তায় লিস্টি করতে বলো।

সুমারনবিশ উঠলো। কিন্তু যেন দাঁড়িয়ে পা ঘষে, যেন কিছু বলবে।

নায়েব তা লক্ষ্য করলো।

—নাচ গান আতসবাজীর কথা নাকি?

সুমারনবিশ বললো,—আচ্ছা, হুজুর তা পরে বলবো।

সকালের কাছারী ভাঙে দুপুরের আগে। এগারোটা বাজে আজকাল তখন। সময়টা সেদিকে চলেছে। নায়েবের খাশ বরদার আর্জি পেঁৗছে দিয়ে ফিরে গড়গড়ার জল বদলে ছিলিম দিলো। নায়েব দু-এক টান দিলেন। হাঁ, ঠাণ্ডা বটে এ তামাকটা। যে বয়সের যা এই-রকম একটা চিন্তা নায়েবের মনে একপাক ঘুরে গেলো। রাজবাড়ি থেকে রূপচাঁদ এলো। নায়েব তখনও তামাক টানছেন। কাছারী ভাঙলে যেতে বলেছেন রানীমা।

তামাক শেষ ক'রে নায়েব উঠলো। ধীরপায়ে কাছারীর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। কখনও কখনও কোন সেরেস্তায় ঢুকে প'ড়ে নায়েব আমলাদের খাতাপত্তর পরীক্ষা ক'রে থাকে। কাজেই যতটুকু দেখা যায় দরজা জানালার ফাঁকে নায়েবকে তেমন দেখে নিয়ে আমলারা কাগজে চোখ নামিয়ে নিলো।

নায়েব এই সময়ে লক্ষ্য করলো সদর দরজা দিয়ে হরদয়াল এদিকে আসছে। দেওয়ান কুঠিতে যেতে খানিকটা কাছারীর দিকেই আসতে হয়।

নায়েব আর দেওয়ান। আগে অবশ্যই সদর নায়েবের পদটা পরগণার নায়েব পদগুলোর চূড়ায় ছিলো। কিন্তু দেওয়ান ছিলো সর্বোপরি। তারপর কি যে হ'লো! এখন দেওয়ান পদটাই নেই। নাইব-ই-রিয়াসৎ এখন সদর নায়েব। কিন্তু মানুষ দুটোই তো আছে। বাইরে কোথাও কিছু নেই। মসৃণ অভ্যস্ত গতিতে কাছারী চলছে। কিন্তু এটা একটা ঘটনা যা তুমি ভুলতে পারো না। অনেকবার অনেকভাবে মনে আসে। এই মানুষ দুটি কাছাকাছি এলে তো বটেই। হরদয়াল চোখ তুলে নায়েবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো কি? সেজন্যই কথা না-ব'লে চ'লে না গিয়ে সে এগিয়ে এলো। তা দেখে নায়েবও সিঁড়ি দিয়ে নামলো।

ফলে কাছারীর সামনে রাস্তার উপরে দুজনের দেখা হলো। সেখানে তারা দাঁড়িয়ে কথা বলছে—তা দেখে কাছারীর আমলাদের মনে হলো তারা যেন রাস্তাটার কোন খুঁত খুঁজে পেয়েছে।

নায়েব বললো,—স্কুলের দিকেই গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। বড্ড ধুলোর উৎপাত। পিছন দিকের রাস্তায় গোরুরগাড়ি গেলে স্কুলে ধুলো ঢোকে। ওদিকে দক্ষিণ দিক। জানলা খোলা না রাখলেও চলে না।

নায়েব বললো,—পথটা বাঁধিয়ে দিলে হয়।

—ভাবছি। হাসিমুখে বললো হরদয়াল,—স্কুলের ফান্ড কোথায় বলুন।

—এদিকের পথ পাকা হবে, তখন ওদিকেও সুরকি দেয়া যায়। রানীমা মত দেবেন সকলে বললে।

—নথিটা দেখলেন?

—কোনটির কথা বলছেন।

নায়েবের মুখটা কি একটু বিব্রত দেখালো?

সে বললো,—পথ-কাটার নথিটাই।

—সে হাসলো যেন বলবে দেখুন পথের কথায় কোন পথের কথা উঠলো।

হরদয়াল বললো,—ধারণা করছি ওরা যদি আদালতে আর্জি পেশ ক'রে তার নকল দেখে জবাব দেয়া ভালো। গৌরী খবর পেয়েছে মনোহর নিজেই গিয়েছে উকীলবাড়ি। উকীল নাকি ড্যামেজেস-এর জন্য নোটিশ দেবার কথা ভাবছে।

—ক্ষেতিপূরণ? নায়েবের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিলো,—এ যে দেখছি নতুন কিছু হ'তে চলেছে। সুরকির দাম চায় নাকি? তা বেশ।

কিন্তু দেউড়ির ঘড়িতে এগারোটা বাজলো শব্দ ক'রে। শব্দগুলো যেন রাজবাড়ির দেয়ালে ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনিও তৈরী করে।

নায়েব বললো,—রানীমার কাছে কাজ আছে যে। আচ্ছা নমস্কার।

একই সংগে দুজনেই নমস্কারের জন্য হাত তুললো। রূপচাঁদকে আসতে দেখা গেলো নায়েবকে দরবারে নিতে।

রানীর দরবারে পেঁছে নায়েব জানালো জন্মোৎসব সম্বন্ধেই সে কিছু বলতে চায়।

রানী শুনে বললেন,—ও আর না হ'লেই কি নয়? তুমি যখন সে বিষয়ে আলাপ করার কথা ভাবছো এখনও পাকা হয়নি তবে। ওটাকে কি চালিয়েই যেতে হবে?

—আজ্ঞে একটা উৎসব তো। একটা বিশেষ উৎসব যা শুধু আমাদের এ অঞ্চলেই হয়। আমাদের দশজনের আনন্দ।

—বলো।

—সদরের হাকিমদের, মরেলগঞ্জের সাহেবদের, জোতদারদের মধ্যে বড়দের গতবার নিমন্ত্রণ ছিলো। এবার?—

—মরেলগঞ্জে দিতে চাচ্ছ না?

সে বললো,—ইংরেজদের সংগে ফৌজদারি ফরিয়াদিতে কিন্তু লাভ হয় না।

—দেওয়ানির তোরজোর করছো? নাকি ইংরেজরাই এগোবে?

একটু দেরি হ'লো নায়েবের উত্তর দিতে। বললো,—এখনও সবটা ভেবে উঠতে পারিনি, রানীমা।

কৌতুক বোধ ক'রে রানীমা ভাবলেন, এ কি কখনও সম্ভব যে মরেলগঞ্জেই নায়েবের দু-একজন লোক নেই যে কি করবে মরেলগঞ্জ, কেন সময় নিচ্ছে কিছু করতে তা ধরতে পারছে না? বললেন,—অনেকের মধ্যে একটা নিমন্ত্রণ, তা ছাড়া মরেলগঞ্জ এক সময়ে তোমাদের পত্তনীদার ছিলো।

কিন্তু ঠিক তখনই যুদ্ধ কথাটার উল্লেখ হয়েছিলো। কথা বলছিলেন তিনি। স্নিগ্ধ ডাগর চোখ দুটো যেন চঞ্চল হ'লো একটু, গালে কোথাও যেন রং লাগলো। বললেন রানী, —তুমি কি শুনেছো? তোমাদের পেত্রো নাকি ইংরেজদের একটা কথাই ইংরেজিতে বলতেন। কথাটাও ইংরেজদের। দেয়ার্স নাথিং আনফেয়ার ইন্ লভ্ অ্যান্ড ওঅর।

নায়েব উঠলো। দরবার শেষ হ'লো। কিন্তু ডানকানদের বিষয়ের উপরে মূল্য দিয়ে তাদের কথায় শেষ কথা ব'লে কি দরবার ভাঙা যায়? বরং অন্য দরকারী কথার মাঝে এসে পড়েছিলো এমনটা হওয়াই উচিত।

বিচক্ষণ নায়েব সেজন্যই যেন বললো,—ঘর বাড়ি সংস্কার ইত্যাদির কাজে খরচটা কিছু বৃদ্ধির দিকে।

রানী কথা না ব'লে নায়েবকে বলতে দিলেন।

নায়েব বললো হাসিমুখে,—নরেশ সুরেন এরা যত কাজ করছে তত যেন বাড়ছে কাজ। ওদের একটা আলাদা দপ্তর করলে হয় না? পৃথক একটা হিসাব নিকাস এবং তদারকি। আমি আমাদের পূর্বতন দেওয়ানজিকে অনুরোধ করেছি ভার নিতে।

ভাবতে যেন মুহূর্তই যথেষ্ট। রানী বললেন,—ভালো করেছো। নিয়োগপত্রের দরকার

হবে? আচ্ছা আমি বলে দেবো।

—কোন কোন বিষয় খুব দ্রুত অগ্রসর হয় দেখা যাচ্ছে। এই নতুন পূর্ত বিভাগটি খোলার ব্যাপারে তা দেখা গেলো।

নায়েব রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তার কামরায় বসতেই খাশ বরদার একটু দ্বিধা করলো কিন্তু বসেছেন যখন এই ভেবে ছিলিম পালটে আলবোলার নলটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো,—এবারে রানীমার জন্মদিনে রেশমের গড়া চাই, হুজুর। আমি খাশ।

—সে কি? ও আচ্ছা। তা তো বটেই। গৌরীকে একবার ডেকে দিও।

ল মোহরার গৌরী এলে নায়েব বললো,—কীবল ছোকরা কি ব্যারিস্টার? আর তার মানে তো সে আইনের দিকে ঝোঁক রেখে চলে। দেখো তো মনোহরকে সে-ই পরামর্শ দিচ্ছে নাকি। নায়েব হাসলো।

এমন কি হতে পারে কীবলের পরামর্শে—মনোহর-ডানকান সড়ককাটার ব্যাপারটা আইনের পথে চলতে চাইছে?

গৌরী বললো,—খোঁজ রাখছি, হুজুর।

কিন্তু গৌরী একা নয়, সুমারনবিশ সুরেন্দ্রকে সামনে রেখে বেশ কয়েকজন ভিড় ক'রে এলো। তাদের প্রস্তাব জন্মতিথির উৎসবে ভালো গানের ব্যবস্থা করা দরকার। নাটকের কথাই তারা বলতে চায়।

শুনে নায়েব বললো,—হাতের কাছে রামযাত্রা আছে কিনা দেখো।

সুমারনবিশ আজ্ঞে ব'লে ব্যাপারটা ইতি করতে চাইছিলো কিন্তু তার পিছনে অন্যেরা এমন ক'রে দরজা জুড়ে রয়েছে যে পিছানোর উপায় নেই।

দরজার পাশ থেকে একজন জানালো,—আজ্ঞে নাটক, কলকাতায় তা হয়, ঠিয়াটার। আমাদের ব্রজকান্ত দেওয়ানজির সঙ্গে যাওয়া-আসা করে সেই দেখেছে।

বেজোর বাড় বেড়েছে।

নাট্যামোদী ল মোহরার বললো,—ডাকি হুজুর ব্রজকে?

মেরেছো তোমরা আমাকে। ঠিয়াটার না কি বললে, তা হ'লে সে তো রানীমার চোখেও পড়তে পারে। এখন যাও, এখন যাও। আমাদের পূর্বের দেওয়ানজি কি বলেন তা শোন।

তারা চ'লে গেলে নায়েব জমাবন্দীর খাতা খুলছিলো। কিন্তু কাজ করা হ'লো না। খাশ বরদার জানালো এগারোটা বেজে কাছারী ভাঙলে তবেই তিনি রাজবাড়ি গিয়েছিলেন। এখন তিনি না উঠলে আমলারা যেতে পারছে না।

নায়েব উঠলো।

কাছারীর গাড়িবারান্দায় নায়েবের পাল্কী। একসময়ে সে হেঁটেই চলতো। এ ব্যবস্থাটা রানীমার। হঠাৎ যেমন একদিন সে শুনতে পেয়েছিলো সেদিন থেকেই সে আর সদর নায়েব নয়,—নায়িব-ই-রিয়াসৎ, তেমনি হঠাৎ আর-একদিন কাছারীর গোড়ায় ছ বেহারার পাল্কীটাকে দেখতে পেয়েছিলো।

—কে এলো রে? আজ্ঞে, কেউ নয়। আপনার বাসায় যেতে।

পথের উপর দিয়ে পাল্কী চলেছে মাঝারি গতিতে। তাকিয়ায় কনুই রেখে আধশোয়া অবস্থায় বসেছে নায়েব। এখন সে কিছু ভাবতে চায় না। এখন কি স্নানাহার বিশ্রামের সময় নয়? কিন্তু মন কি ফাঁকা থাকে রে বাপু, তা হ'লে তো যোগের উল্টোটা হ'লো। ক্রমে রানীর জন্মতিথির কালীপূজার কথা মনে এলো তার। মাসখানেক বাকি, তা তেমন লম্বা সময় নয়।

কালীপুজো থেকে সেবারের গোলমালটা মনে এলো তার। সেবার মানে প্রথমবার, আর আসলে কি গোলমাল তা-ও বোঝা যায়নি। তদন্তে সদর থেকে ডেপুটি এসেছিলো। বুজরুকের জেল হয়েছিলো। এর মধ্যে কোথায়, ঠিক কোন পর্যায়ে বোঝা যায় না, মরেলগঞ্জের নামকরা তহশীলদার চন্দ্রকান্ত খুন হয়েছিলো।

হুঁই হাঁই ক'রে চলেছে পাল্কী।

নায়েব পাল্কীর বাইরে চাইলো। দু হাত নিচে রাস্তা স'রে স'রে যাচ্ছে। পাল্কীটা নিচুই। রানীমার পাল্কীর তলাটাও কেমন এক কোমর উঁচুতে থাকে। এখানে হাত বাড়িয়ে মাটি ছোঁয়া যায় যেন। নায়েবের নিজের ব্যবস্থাই। কাহারদের সে কেমন বেঁটে দেখে দেখে বাছাই ক'রে নিয়েছে। উঁচু পাল্কীতে যেন ভয় ভয় করে।

পাল্কীর ছাদের দিকে চাইলো নায়েব। উঁচুর কথা যদি বলো তবে ঘোড়া। আর সে কি ঘোড়া! তা ছিলো গোবর্ধনের। তার পেটের তলাও বোধ হয় এই পাল্কীর ছাদের চাইতে উঁচু ছিলো। আর লাফিয়ে উঠতো সেই ঘোড়ায় গোবর্ধন। কায়েতের ছেলে, কিন্তু লাফিয়েই উঠতো। বুজরুকের নকল যেন।

কাহাররা গুম্ গুম্ গুন্‌গুন্ ক'রে উঠলো।

নায়েব অস্ফুটস্বরে বললো,—একটু আস্তে চলো, বাপু। ছুটতে গিয়ে খানাখন্দে পড়ে লাভ কি? এ কি রাজবাড়ির সুরকিজমাটকরা হাতা?

নায়েব ভাবলো: রাস্তাঘাটের কথাই তো। তা রাস্তাঘাটের উন্নতি ভালোই। এদিকে দেখে রাজবাড়ির হাতার মতো পাকা হ'য়ে রাস্তা বাড়ছে গ্রামে। সদরে গেলেও বোঝা যায় পাকা রাস্তার সুবিধা কোথায়। ঘোড়া বলো, ফীটন ল্যান্ডো বলো, ব্রুআম্ বলো সকলেরই সুবিধা। আর রাজবাড়ির দেউড়ির কাছে যখন পাকা রাস্তায় উঠেছে বুজরুকের ঘোড়া লাল আগুনের শিখার মতোই ধুলো উড়াতো।

কিন্তু, কিন্তু, তুমি, বাপু, জাত কায়েতের ছেলে গোবরা, তোমার কেন তেমন ঘোড়া? কিছু যেন নায়েবের বুকে হাঁপরের মতো হাঁপালো। কি লাভ?

কি লাভ?

নায়েব নিজেকে জানালো : আসলে গৌরীদের দেখে তোমার মনে পড়েছে বাপু, আজ আবার। ওদেরই সমবয়সী ছিলো তো। তেমনি হাসিখুসী আর অকাজের কাজে জড়িয়ে পড়া। কি লাভ? হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ওদের ঠিয়াটারের দলে থাকতো সে।

নায়েব স্থির ক'রে ফেললো আজ দুপুরেই গিন্নীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবে। (প্রথম) যে গিয়েছে সে আর শত কান্নাতেও ফেরে না। (দ্বিতীয়) যার নিজের পেটের ছেলে চ'লে যায় সে-ও তো শোক ভোলে; সে ভাগনা, পরের পেটের ছেলে ব'লেই কি তার বেলায় অন্য-রকম হবে? (তৃতীয়) আমার কি দোষ বলো—আমি তো আর-একজনকে এনেই দিয়েছিলাম। সেই গণেশও আমার অন্য বোনের ছেলে গোবরার মতোই সে-ও ভাগনাই। তাকে পেয়েও কি ভরলো তোমার বুক?

নায়েবের মনটাও যেন শূন্য হ'য়ে গেলো। কাহাররা কাঁধ বদলালো তাই একটা মৃদু ঝাঁকি লাগলো। নায়েব দু হাতের তেলো একত্র ক'রে বুকে রাখলো।

না, এসব কথা নয়। আনন্দ হয় এমন কোন বিষয়ে আজ আলাপ করতে হবে। আনন্দ-জনক বিষয়ের খোঁজেই যেন তার মনে পড়লো রানীমার কথা। সেই স্নিগ্ধ ডাগর চোখের চঞ্চল হওয়া, ঠোঁটের কোণে হাসি আর সলজ্জতা আর সেই ইংরেজি কথা। রানীমা ইংরেজি

বলেছেন শুনে তুমি বিস্ময়ে কাঠ হবে, গোবরার মাসী।

হঠাৎ যেন কাহারদের হুঁই হাঁই বেড়ে উঠলো। এটা তাদের বাড়ির কর্ত্রীকে খুসী করার চেষ্টা। কাহাররা রাজবাড়ি থেকে বেতন পায়। কিন্তু নায়েবগিন্নী তাদের কাপড়চোপড় দিয়ে থাকেন। এ সুযোগে, সে সুযোগে মাহিনায় দশ দিন খাওয়ান। এসব মর্যাদার প্রশ্ন।

কিন্তু কথাটা কি যুদ্ধ? রানীমা নিশ্চয় সড়ক কাটার মতো সামান্য ব্যাপারটাকে যুদ্ধ বলেন নি। তবে যুদ্ধ কোথায়? না কি সেটা কথার কথা? সকলেই কোন না কোন সময়ে তেমন দু একটা কথা বলে। রানীমাও কি তাই বলেছেন। নাকি যা তারা দেখতে পায় না এমন একটা অদৃশ্য যুদ্ধ আছে? যে যুদ্ধে জয়লাভে ন্যায় অন্যায় নিয়ে ভাবার সময় নেই। আশ্চর্য ব্যাপার তো!

বাড়ি পেঁাছে ধীরে সুস্থে স্নানাহার ক'রে নায়েব গিন্নীকে ডেকে বললো,—গোবরার মাসী, শোন। একটু শোও দেখি, বাছা, আমার পাশে। এখনই সলতে পাকাতে হবে কেন? সলতে, সলতে,...প্রদীপ জেবলে ঘর সাজিয়ে কি লাভ? কি যে নেশা, বাপু, তোমার কাজের!

তিরস্কারের মতো সুর শুনে নায়েবগিন্নী বিছানায় এলো।

নায়েবের চোখ দুটি দুপুরের ঘুমে জড়িয়ে আসছে। সেই কতদিনের অভ্যাস তো। হঠাৎ যেন উৎকর্ণ হ'লো সে। যেন কিছু শুনছে। পাখী। ক্রোক্ ক্রোক্ ক'রে ডাকছে। দুপুর খুব নিস্তব্ধ হ'লে কিংবা প'ড়ো বাড়ির কাছে শোনা যায়। কাঠঠোকরাই কিন্তু শুনে বুক ফাঁকা হ'য়ে যায়। এ যেন এক অজানা কিছু। কি আশ্চর্য আমাদের বাড়িটা কি প'ড়ো বাড়ি। কি যেন একটা ভয়ের মতো নায়েবকে বিছানা থেকে তুলে দিলো। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো সে।

পাশের লোক উঠে পড়লে শুয়ে থাকা যায় না। নায়েবগিন্নীও উঠে বসলো।

—খাশ সিন্ধুকের চাবির গোছাটাই বোধ হয় ভুলে এসেছি।

—আদৌ না। এসেই আমার হাতে দিয়েছো।

—এই মরেছে। নায়েব হাসলো।

—দেখলে তো।

—তা উঠেই যখন পড়লাম, চাকরকে বলো তামাক দিক।

গিন্নী শয্যা থেকে নামতে গেলো। নায়েব বললো,—আহা, এখনই নেবে যাচ্ছ কেন?

গিন্নী হেসে বললো,—চাকর তোমার শোবার ঘরে কবে ঢুকলো যে শোবার ঘরের তামাকে হাত দেবে।

নায়েবগিন্নী নিজেই তামাক সেজে ডাবা সমেত নিয়ে এলো।

নায়েব বললো,—এবার তোমাকে কলকেতা দেখিয়ে আনি। ওদিকে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর দেখা হ'য়ে যাবে এদিকে কলকেতা সহরও।

গিন্নী বলে,—সে সহরে নাকি গাছপালা অনেক কম, সব বাড়িই নাকি পাকা, আর রাস্তা ঘাট সব সুরকির। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নাকি আলো। আর—

—কি আর?

—পথে পথে নাকি ইংরেজে ঠাসা! এখেনে এক ডানকানে রক্ষে নেই।

—তা সহরটাইতো ইংরেজের। ওরাই পত্তন করেছে। সেখানে সবই ইংরেজি। ছোট ছোট বাঙালী ছেলেরাও ফুট্‌ফুট্ ইংরেজি বলে। বড়দের তো কথাই নেই। তারা নাকি স্বপ্নও দেখে ইংরেজিতে। সেখানে টেবল ইংরেজি, চেয়ার ইংরেজি, মদ ইংরেজি। আবার নাকি ঈশ্বরও রবিবারে রবিবারে ইংরেজি মতে পুজো নেন।

—রবিবার নিষ্ফলা না?

—দেখো কাণ্ড। সে কি ধূপধুনোর পুজো? আর্গিন বাজিয়ে গান হয়। গানেই পুজো। ইংরেজদের মতোই। সবাই নাকি চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকে, আর একজন বক্তৃতা দিয়ে যায়।

—ছেলে ছোকরারাও যায়?

—যায় না আবার। তারাই বেশী। আর মেয়েরাও। হাতঢাকা জামা কামিজ, পায়ে জুতো।

নায়েবগিন্নীর গালটা লাল হ'লো। যা বলতে যাচ্ছে সে যেন তারই চাপে। বললো,—দেখো আমি শুনেছি যেসব ইংরেজ যারা এখেনে আসে তাদের নাকি বাপ নেই। মানে মা আছে, কিন্তু বাপ যে কে—বুঝলে তো? এই সব ছেলেছোকরাও কি তাই?

—ছি-ছি, কি যে বলো। আজকাল কি ছেলে ছোকরারা বাপ মার কথা শোনে? কোন-দিনই কি শোনে? আমাদের গোবরা কি ভাবলো আমাদের কথা?

—দেখো, তুমি আমার গোবরাকে, তুমি ওসব ছেলের সঙ্গে তুলনা দিও না।

—পরের ছেলেরা ভুল করছে, ডাবার ডাকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাসটা গোপন করলো নায়েব। আর তোমার ছেলে বুঝি ঠিক করেছিলো? সেও ভুল করেছে। ভুলই। বলো সবাই যখন বলছে ইংরেজরা ভালো করছে। ক্রেমে ভালোই করছে শুধু। কলকেতার সব ভদ্রলোক, সব শিক্ষিত লোক সভা ক'রে যার নিন্দে করেছে তাই কিনা করতে গেলো তোমার ছেলে। দেখো দেখি কত তফাৎ যখন যে বছর ওরা সব জায়গায় লখনউ আর কানপুর, দিল্লী আর ঝান্সিতে মারপিট করছে ঠিক সে সময়ে সে বছরে তোমার গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বসলো কলকেতায়।—কেন? ইংরেজের মনের আরও কাছে যেতে নয়?

—ভারি কথা বলো না, গোবরার মামা। আমার ছেলে ভুল করে না। তুমি কি জানো? তুমি কি শুনেছো? খবরদার কাউকে বলো না যেন; কিন্তু জানো আর একজনও ছিলো সেই দলে, বলবো? রাজকুমার।

শেষ কথাটায় গলার স্বরটা অনেক নামিয়ে আনলো নায়েবগিন্নী। আঁচল তুলে চোখের কোণটা মুছলো।

—আহবা। বললো নায়েব। কি লাভ, বলো, কি লাভ। এসব খোঁজই বা নেও কেন? ওরে তামুক দে, হারামজাদাদের বাড় বেড়েছে দেখছি।

—রাগ করো না। শোবার ঘরে ওরা ঢোকে না। তামুক তো হাতেই।

তবু তামাক আনতে গেলো গিন্নী। নায়েব ভাবলো সড়ক কাটার ব্যাপারটার সঙ্গে কি ক'রে যেন গোবরা জড়িয়ে পড়ছে। আর সেজন্যই বারবার সড়ক কাটার ওই ব্যাপারটা মনে আসছে তার। কিন্তু কথায় বলে নায়েব। হঠাৎ সে যেন সবটা খোলা মেলা দেখতে পেলো। ইংরেজকে শত্রু করেছিলো গোবরা। ইংরেজরা গোবরার শত্রু সুতরাং। তা থেকেই সেদিন ইংরেজদের উপর রাগ হয়েছিলো তার। তার থেকে সড়ক কাটা। আশ্চর্য কথা দেখছি।

তামাক নিয়ে ফিরতে দেরি হ'লো নায়েবগিন্নীর। চোখে মুখে জল নেই কিন্তু ঘষার পরে তখনও লাল।

—গিন্নী বললো,—তামুক খেয়ে কি এখনই কাছারীতে যাবে? তাহলে জলপান—

—আমি বলি কি—এখন কিছুদিন দইয়ের শরবৎ দিও।

—এই শীতে দই খাবে?

—পিত্তটা বিশেষ কুপিত মনে হচ্ছে না?

—তা হ'লে ওষুধ করতে হয়। বলো কি?

—কি লাভ বলো। নায়েব হেসে উঠলো। তামাকের ধোঁয়াটাও গলায় লাগলো। হাসি ও কাশির মধ্যে বললো,—এক বেলায় তোমার গিয়ে খোঁয়াড় সমেত সায়েবটাকে ছাই করা যায়। হাঁ গ্রামসমেত যদি বলো, তাতে কিন্তু পিত্তই কুপিত হয়। গাঁয়ের লোকেরাও ছি-ছি করে। রাস্তা কেটে কিবা হয়? বুড়ো বয়সে পিত্ত কুপিত হওয়া ছাড়া।

কাশতে কাশতে বেদম হ'লে চোখের কোণ থেকে নাকের দুপাশে কারো কারো জল নামে। নায়েব আঙুলের ডগায় তা মুছলো।

—বাগচি মাস্টার নাকি ওষুধ দেন। একদিন ডাকো না তাঁকে?

—মন্দ হয় না। ব'লে নায়েব তামুকে মন দিলো।

কাছারীতে ফিরে নায়েব ল মোহরার গৌরীকেই ডাকলো। সে এলে বললো, একটা কথা ঠিক রেখো। মামলায় যদি যায় ওরা লম্বা লম্বা তারিখ নেবে। উকীলকে টাকা ঢেলে দিক ডানকান। এদিকে শামসুদ্দিনকে ফিরিয়ে আনো, জমিতে চাষ দিক। না আসে অন্য কাউকে বসাবে জমিতে। গ্রামে কি শামসুদ্দিনের অভাব পড়েছে? নামটা সামসুদ্দিন হলেই হল। শুনছি নাকি কোম্পানীর আদালত উঠে যায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখো, খেলে খেলে এগোও।

হরদয়াল যেমন বলেছিলো রানীর জন্মোৎসবই একটা বড় ঘটনা। অন্য কিছু যদি উল্লেখ করতে হয় সেটাও আর একটি উৎসব। তখনও জন্মোৎসব শেষ হয় নি তার আগেই দ্বিতীয় সেই উৎসবটিরও উদ্যোগ আয়োজন সুরু হয়েছিলো। রানীমারই উৎসব- শিবমন্দিরে বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি সেটা হবে তো। এটা অবশ্য সে বছরের বৈশিষ্ট্য ছিলো, এবং সেজন্যই যেন এত মনে আছে মানুষের, একটা উৎসব যেতে না যেতেই আর একটা এসে পড়েছিলো যেন।

রানীমা সকালেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন নয়নতারাকে। নায়েবমশায় যখন এসেছিলো তার আগে নয়নতারা একটা নতুন যোগাড় করা বই প'ড়ে শোনাচ্ছিলো রানীমাকে। কলকেতার পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মহাভারতের উপক্রমণিকা। এটা একটা কৌতূহলের ব্যাপার। নয়নতারার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে রানীমার কি এত বইপড়ার উপরে ঝোঁক ছিলো? অথবা নয়নতারাই কি মহাভারতে এবং অন্যান্য পুঁথিতেও এতটা মনোনিবেশ করতে অভ্যস্ত ছিলো? এতে যেন কৌতুকও আছে। পাঠকের মনে পড়বে রানী যখন নয়নতারাকে রাজবাড়িতে ডেকেছিলেন তখনই মহাভারত পাঠের কথা উঠেছিলো কিন্তু সেটাই আসল উদ্দেশ্য ছিলো না। পরে উদ্দেশ্যটাই বদলে গিয়েছিলো যেন। আর এখন তো শুধু মহাভারত পড়তেই আসে না নয়ন-তারা ব্যাকরণ ভাষ্য ও টীকা সহকারে বারাণসী অক্ষরে লেখা কোন না কোন পর্বের পুঁথি তার হাতে থাকলেও। এটা থেকে কি কোন সাধারণ সূত্রে পেঁাছানো যায়?—মানুষ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজ আরম্ভ করে এক সময়ে সে কাজটাই সেই প্রথম উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে নিজে থেকেই নানা উদ্দেশ্য সৃষ্টি করতে থাকে নাকি?

রানীমা নয়নতারা আসতেই বলেছিলেন,—নয়ন, তোমাকে একদিন শিবমন্দিরটা দেখতে যেতে হয়। কতদূর হ'লো। শিবচতুর্দশীর আগে তো শেষ হওয়া দরকার। তাছাড়া উৎসবের রাত্রিতে মেয়েরা কোথায় থাকবে, কোথায় স্নান করবে এসব ভেবে দেখা দরকার।

নায়েব যখন এলো তখন মহাভারতের উপক্রমণিকা পাঠ চলছে। নায়েব এলে নয়নতারা উঠে গিয়েছিলো। নায়েব চ'লে গেলে রানী চিন্তা করলেন। এখন বোধ হয় ডানকান নিজেও আর ভাবে না তাদের সেই হতভাগ্য তহশীলদার চন্দ্রকান্ত সেনের কথা। কিন্তু রোহিণী নামে

চন্দ্রকান্তের বিধবা? রানী নিজেও ভোলেন নি। অস্পষ্ট আলোতে পথের ধ্লোয় মৃতদেহটিকে এখনও যেন প'ড়ে থাকতে দেখতে পাবেন এত স্পষ্ট সেই স্মৃতি। সেই মৃতদেহটির অস্তিত্ব-লোপে পিয়েত্রো সাহায্য করেছিলো। রাজকুমার হয়তো বয়সের ধর্মে ভুলে যেতে পারে, আর তা উচিতও।

ভাবতে গিয়ে রানীর মনে হ'লো রাজুকে কি উদাস দেখায়?

নয়নতারা রানীর দুপুরের বসবার ঘরের দরজার পাশেই মেঝেতে। রানী দোতলার দরবার ঘর থেকে অলিন্দ দিয়ে চলতে গিয়ে দেখলেন। বইটাই পড়ছে যেন সে নিচু মুখে। কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে যেন কৌতুকের আভাস। তা, অবশ্য, বই পড়তে পড়তেও হয়।

অলিন্দে, বরং অলিন্দ যেখানে নিচের উঠোনের উপরে ঝুলবারান্দায় বেড়েছে তার কাছে অলিন্দের উপর হাত রেখে দাঁড়ালেন। পায়ের শব্দে নয়নতারা মুখ তুললো।

রানী বললেন,—কি করছো, নয়ন? বইটা কি ভালো নয়?

—কত বড় পণ্ডিতের লেখা, ভালো হবে না।

—বিদ্যাসাগর নিশ্চয় বড় পণ্ডিত। কিন্তু,—রানী হাসলেন,—মহাভারতের এ উপ-ক্রমণিকা তোমার পছন্দ হচ্ছে না। বরং যেন সন্দেহ আছে।

—সন্দেহ কোথায়?

—মুখের চেহারায়। রানী হাসলেন।

নয়নতারা অবাক হ'লো। অসময়ের এই কালীপূজা যা আপাতদৃষ্টিতে রানীমার জন্মোৎসবের অঙ্গ সে বিষয়ে তার কিছু সন্দেহ আছে। কিন্তু তা কি তার মুখেও প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে? সে হেসে বললো,—আমার ভ্রূর গঠনে কিছু দোষ আছে, রানীমা।

—হুঁ! তুমি তো কখনও?

নয়নতারার মুখটা যেন একটু বিবর্ণ হ'লো, কথাটা সুপ্রয়োগ হয় নি।

কিন্তু রানী হাসতে হাসতে বললো,—এবার কিন্তু তুমি দুষ্টু হ'য়ে ফিরেছো। রানীকে তেমন মানছো না। কিন্তু যেন চেঞ্জো থেকে ফিরেছো। আরও ভালো দেখায় তোমাকে।

কথার আড়ালে গিয়ে রানী চিন্তা করলেন, কালীপূজার ব্যাপারটায় নয়নতারা কিছু সন্দেহ রাখে যুক্তিসঙ্গতভাবে। ব্যাপারটাকে নানা ভাবেই প্রশ্ন করা যায়। এমন প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে রাজবাড়ীর অন্য অনেকের, এমন কি রাজকুমারের জন্মদিনেও তো গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের বিশেষ পূজা হয়, তবে রানীর জন্মদিনে কেন অন্য ব্যবস্থা? নয়নতারা কি জানে? রাজু কি অকে নরহত্যার কথা বলেছে?

রানীর অন্তর চঞ্চল হ'লো। তিনি যে অলিন্দের উপর হাত রেখেছিলেন তার উপরে ঝুঁকে নিচের চকে চাইলেন। বললেন,—দেখো নয়ন ভুলে গিয়েছি। তুমি কাউকে দিয়ে এখনই একবার হরদয়ালকে আসতে ব'লে দাও।

রানীর স্বরটা দ্রুত। নয়নতারা তাড়াতাড়ি উঠে ভৃত্যদের খোঁজে গেলো।

রানী একা। একটু যেন টেনে নিঃশ্বাস নিলেন একবার। এই আবার তাঁর অনুভূতিতে কথাটা এলো। কিন্তু তা যেন এমন স্পষ্ট নয় যে কথায় প্রকাশ করা যাবে। যদি তবুও প্রকাশ করা হয় তবে বোধ হয় কথাটা এমন হ'তে পারে—ছেলে বড় হ'লে তার মনের অন্য এক শরিক উপস্থিত হ'তে পারে যে মা নয়, আর সে ব্যাপারে মায়ের কিছু করার থাকে না।

এ চিন্তাটা বিষন্ন। তা থেকে বিষন্নতার কথা মনে এলো। নিজেকে প্রশ্ন করলেন রাজু কি বিষন্ন? কিন্তু সে বিষন্নতার তা হ'লে অন্য কারণ আছে।

রানী চারিদিকে চাইলেন। কিন্তু সেখানেই বা বিষণ্ণতা কোথায়? এখন তো দিনশেষের বেলা নয়। বরং দুপুরের দিকে চলেছে দিন। যখন রোদ নেই প্রখর হ'য়ে, অথচ দিনের উজ্জ্বলতা, যখন সে ঔজ্জ্বল্য চকমিলান বাড়ির দেয়ালগুলোর মধ্যে রোদে কবোষ্ণ জলাশয়ের মতো অগাধ স্থির তখন কিছু কি উদাস হয়? রাজুকে বরং উদাস দেখায়। মনে পড়লো তাঁর, রাজুর চোখ দুটি টানাটানা, সে রাত্রিতে মানুষ খুন হ'য়ে যাওয়ার পরে সে দুটিকে যেন স্বপ্নোত্থিত মনে হয়েছিলো। রানী মনে করতে পারলেন না রাজুর চোখ দুটিকে ইদানীং কবে ভালো ক'রে দেখেছেন। বরং আরও অনেকদূর পিছিয়ে গিয়ে তাঁর মনে এলো যখন রাজুর চোখে কাজল দিয়ে দাসীরা ঠাট্টা ক'রে বলতো—এ মা, এক্কেবারেই হরিণ চোখ! মেয়ে নাকি, রানীমা? এখন অনেক বেড়েছে রাজু। বরং অসাধারণ। হরদয়াল ও নায়েব মশাই দীঘল চেহারার মানুষ। রাজুকে তাদের চাইতেও দীঘল দেখায়। হাসি হাসি দেখালো রানীর মুখ। সে হাসি দেখলে দৃঢ়তার কথাও হঠাৎ মনে হ'তে পারে কারো। আর তা হয়তো রাজুর চেহারার ছবি হাসির উপরে প'ড়েই হ'লো।

ইতিমধ্যে নয়নতারা ফিরেছিলো।

রানী বললেন,—শিশুর চোখ দুটো মায়ের দিকেই অপলক চেয়ে থাকে। সে বড় হ'লেও তেমন থাকা কি স্বাভাবিক? প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী তো মায়ের মুখের চাইতে বিচিত্র, তাই নয় কি, নয়ন?

নয়নতারা প্রস্তুত ছিলো না। সে কথাটা ভালো ক'রে বুঝে উত্তর দেয়ার আগেই অলিন্দের শেষ প্রান্তে পায়ের শব্দ হ'লো।

হরদয়ালই এসেছে। নয়নতারা অন্যত্র গেলো।

কিন্তু তখন কি আলোচনার সময়? বরং স্নানাহারের উদ্যোগ করতে হয়। রানী অলিন্দেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সুতরাং হরদয়ালকেও সেখানেই দাঁড়াতে হ'লো। আর আলাপটা হ'লো একতরফা। রানী যেন কিছু নির্দেশ দিলেন। যদিও তা এমন নয় যে তখনই তা দেয়া দরকার ছিলো কিংবা আরও প্রশস্ত সময় তার জন্য বেছে নেয়া যেতো না।

রানী বললেন,—হরদয়াল, কলকাতার বাড়ির সম্বন্ধে আর কিছু ভেবেছো?

—আহিরিটোলায় বাড়িটা কেনা যায়। আর যদি কালীঘাটের দক্ষিণে গিয়ে সেই জমিটা দেখতে বলেন—হেস্টিনের বাড়ি ছাড়িয়ে।

—উৎসবের পরেই তা হ'লে কলকেতায় যাও। এদিকেও দেখো নরেশ বাড়ির সামনে গাড়িবারান্দা দিতে চাইছে। যেমন কাছারীতে আছে। নক্সাটা দেখো। তা কি ভালো হবে? আজকাল সব বাড়িতেই নাকি তা থাকছে।

—নক্সাটা দেখে আপনাকে জানাবো।

—চকমিলান যে সদর দরজা হচ্ছে তার সঙ্গে গাড়িবারান্দা বোধ হয় বেমানান হয় না যদি দূরে হয়। ভেবে দেখো। রানী দাঁড়িয়ে আছেন। এটা এখন দরবারের সময়ও নয়। রানী স্থির অচঞ্চল দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। হরদয়াল চিন্তা করলো, এ কি রানীর মনের কোন চঞ্চলতাকে ঢাকার চেষ্টা। কথা শুনতে মুখ তুলেছিলো সে। নিজে থেকে তার মুখ নামলো। না, চঞ্চলতা কোথায়? রানী বললেন,—তোমাকে কেন ডেকেছি বলি,—আচ্ছা, হরদয়াল, তুমি কি ভেবেছো। আমাদের নায়েবমশাই বুড়ো হয়েছেন। হয়তো চার-পাঁচ বছর আর কাজ করবেন। তারপরে তাঁর জায়গায় কাজ করার লোক দরকার হবে। আমার মনে হয় এখন থেকেই তার জন্য চিন্তা করা দরকার। আমাদের ধরনধারণ বোঝে, সেগুলোকে ভালো লাগে, নিজের

ব'লে বোধ হয় এমন একজন দরকার হবে। (রানী এই জায়গায় হাসলেন) আর আজকালকার ব্যাপার তো, নায়েবমশাই বাংলা আর ফার্সীতে চালিয়ে গেলেন, নতুন লোককে ইংরেজিতে দক্ষ হ'তে হবে।

—এখন থেকেই কি খোঁজ করা দরকার?

—আমি চাইছিলাম এমন একজন লোক যে এখন থেকেই রাজবাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়। ধীরে ধীরে রাজবাড়ির আদবকায়দায় অভ্যস্ত হবে, রাজুকে চিনবে; সম্ভব হ'লে তাকে আপনজন মনে করবে। আচ্ছা, তুমি ভেবে দেখো, আজকাল নাকি প্রাইবেট সেক্রেটারি রাখা হয়। এই তো লাটের (সে ছোট হ'ক, বড় হ'ক) তারও আছে।

হরদয়াল হাসিমুখে বললো,—যদি সে রকম লোক পাওয়া যায় এ পরিকল্পনা বিশেষ ভালো হবে।

রানী ঈষৎ হেসে বললেন,—জন্মোৎসবের পরে নতুন কিছু করার রেয়াজ তৈরি হ'লো দেখছি। ভেবেছি আমলাদের বেতন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এই পদটার কথাও বলা হবে। আচ্ছা, তোমাদের বাগচি মাস্টার ভালো ইংরেজি জানেন নিশ্চয়। আমার ধারণা হয়েছে রাজুকে তিনি ভালোবাসেন।

—মিস্টার বাগচিকে প্রাইবেট সেক্রেটারি নিযুক্ত করতে চাইছেন?

—যদি তিনি স্বেচ্ছায় আসেন। ভেবে দেখো। তোমার স্কুলের ক্ষতি হতে পারে।

হরদয়াল রানীর মনের গতিটাকে বুঝবার জন্যই যেন তাঁর মুখের দিকে চোখ তুললো আবার; কিন্তু রানী ততক্ষণে বিষয়টা থেকে স'রে গিয়েছেন।

হরদয়াল বললো,—বলবো হেডমাস্টারমশাইকে।

কিন্তু রানী আবার হাসলেন। যেন কুণ্ঠিতও তিনি, আবার গোড়ার কথায় ফিরতে গিয়ে। বললেন,—হরদয়াল, রাজবাড়ির সিংদরজা থেকে সুরকির রাস্তাটাকে নতুন শিবমন্দির পর্যন্ত নিলে কেমন হয়? জন্মোৎসবের পরেই তো সেখানে একটা উৎসব। এই বসন্তে বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে।

—আপনার হুকুম হ'লে তা হবে।

—একটা কথা কিন্তু হরদয়াল, রাস্তাটা যেখানে পুরনো ঝিলের কাছে যাবে সেখানে ঝিলের গর্তটাকে বুজিয়ে দিলে বোধ হয় ভালো হয়, না? বরং খিলানের উপরে সেতু তুলে রাস্তাটাকে ঝিলের খাতটা পার করা যায় কিনা ভেবে দেখো তো।

হরদয়াল একটু অবাক হ'লো। এর আগেও সে দেখেছে অন্তত ফরাসডাঙ্গা, মরেলগঞ্জ ও রাজারগ্রামের রাস্তাঘাট ইত্যাদি বিষয়ে রানী অদ্ভুত রকমে ওকিবহাল্। যা শুধু শুনে হয় না। রানী ওদিকে প্রাসাদের বাইরেই বা কখন যান? তা হ'লে এ পরিচয় কি নক্সা দেখে?

কিন্তু রানী ঝিকমিক করে হাসলেন, বললেন,—ঝিলটায় এখন জল নেই বললেই চলে। এক সময়ে ছিলো। হাঁস আসতো। আর ঝিলের ওপারেই ছিলো ডিয়ার পার্ক। এখন বোধ হয় একটা হরিণও নেই। তুমি এদিকে আসার কিছুদিন আগে ওটাকে এক তাসের বাজিতে জিতে নিয়েছিলো পিয়েত্রো তোমাদের রাজার কাছ থেকে। তার আগে, অবশ্য, আমার শ্বশুর ওটাকে পিয়েত্রোর বাবাকে বিক্রি করতে বাধ্য করেছিলেন। নাকি পিয়েত্রোদের ঝিলেঘেরা বাড়ি ছিলো সেকালে।

হরদয়াল কি বলবে খুঁজে পেলো না। অনেকগুলি প্রস্তাব। কোনটাই অকার্যকরী নয়। নতুনও বটে। সবগুলি কার্যকরী হ'লে কিছু পরিবর্তনের ছাপ ধরা পড়বে। তা যেন ভিতরে

এবং বাইরেও। ভেবে দেখতে গেলে, এইগুলি শুনবার পর আগেকার সময় আর এখনকার সময়ের মধ্যেও পার্থক্য দেখা দিচ্ছে।

রানী নিজেই বললেন,—আচ্ছা, হরদয়াল, তুমি ভালো ক'রে সব দিক চিন্তা ক'রে পরে আমাকে জানিও। জানো, হরদয়াল, (এখানে তাঁর মুখে একটা স্নিগ্ধ স্থির হাসি দেখা দিলো।) একটা সহর সুন্দর ক'রে সাজিয়ে তোলায় বেশ একটা পৌরুষ আছে।

রানী নিজের ঘরে গেলেন।

সেখানে নয়নতারা ছিলো। একটু বসলেন রানী। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন বললেন, —চলো, নয়ন, স্নানে। আজ দিঘীতে স্নান হবে। ওদিকের ওই আলমারিটা খোল। বোধ হয় ওখানেই সব নতুন কাপড়। তোমার আমার জন্যে শাড়ী বেছে নাও।

এগুলো প্রাত্যহিক আলাপের মতোই। কিন্তু রানীর মন কি কিছু চঞ্চল হয়েছিলো?

হরদয়াল সিঁড়ি দিয়ে নামলো। এখন তারও কাজের চাপ নেই। আমলারা থিয়েটার নিয়ে আলাপ করতে আসতে পারে। তার মনে হ'লো বাগচি মাস্টারমশাই যদি প্রাইবেট সেক্রেটারি হন তা হ'লে তাঁর কাজ কি হবে? রানী যেমন চাচ্ছেন বাগচি তেমন লোকই বটে। ইংরেজি ভাষা প্রয়োগ ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতায় সে যে কোন ইংরেজ ভদ্রলোকের সমকক্ষ। রাজকুমারকে ভালোবাসেনও। পরবর্তীকালে স্টেটের নায়েব, দেওয়ান, ম্যানেজার যা হয় একটা হবেন। কিন্তু এখন? এখন কি কাজ হবে তাঁর? প্রাইবেট সেক্রেটারিদের কি কাজ থাকে? মনিবের হ'য়ে ছোটখাট চিঠিপত্র আদান-প্রদান কিংবা দেখা-সাক্ষাৎ করা? কিন্তু আসল কাজ কি চিন্তার প্রতিফলক হওয়া মনিবের? চিন্তার প্রতিফলক! বেশ কথাটা। যেমন,—যেমন—সে নিজেই বুঝি রানীর চিন্তার প্রতিফলক হ'য়ে পড়ছে।

হরদয়াল নিজের চিন্তার এই আবিষ্কারে কৌতুক বোধ করলো, আর তারপর যেন কৌতুকের পিছনে সত্যর আভাস দেখে বিস্মিত হ'লো।

নিজের কুঠির দিকে চলতে গিয়ে হরদয়ালের চোখ পড়লো একবার কাছারীর দিকে। তখন তার মনে হ'লো কিছুক্ষণ আগেই নায়েবমশায় তাকে সুরেন আর নরেশের কাজকর্ম তদারক করার ভার নিতে বলেছেন। রানী তাকে রাস্তা সেতু নতুন গাড়িবারান্দা সম্বন্ধে চিন্তা করতে বললেন। ইতিমধ্যেই তা হ'লে নায়েব নতুন পূর্তদপ্তর খোলার প্রস্তাব করেছেন এবং রানী তা মঞ্জুর করেছেন। নায়েবের প্রকাশভঙ্গি থেকে রানীর প্রকাশভঙ্গি নিশ্চয় পৃথক হয়।

স্নানে চলেছেন রানী সঙ্গে নয়ন। পিছনে কিছু দাসী কাপড় ইত্যাদি নিয়ে।

অন্দর মহলের চতুষ্কোণ পার হ'য়ে প্রাচীরের মধ্যেই এই আর-এক মহল। মন্দির, নাটমন্দির, তাদের পিছনে শালবন, শালবনের পাশে দিঘী। বন অর্থে ঝোপঝাড় নয়, আগাছাও নয়। বরং গাছগুলোর তলা যেন নিকানো এমন পরিষ্কার। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পথ। সেই বনের সামনে সোনালী মুসলমানী গম্বুজওয়ালা, লাল নাটমন্দির সমেত সাদা মন্দির।

এখানে কারো কৌতূহল জাগতে পারে মন্দিরটা ঠিক এখানে এমনভাবে কেন? মন্দিরের চেহারা নাটমন্দিরের চেহারা দেখে মনে হয় যথেষ্ট যত্ন আছে। কিন্তু এই রাজবাড়িরই চণ্ডীমণ্ডপ যেখানে জাঁকজমকে রানীর জন্মতিথির কালীপূজো হয়, জগদ্ধাত্রী পূজো হয় সে তো কাছারীর দিকে, সদরে, প্রাসাদের এক অংশে। এই মন্দিরটিকে যেন কেমন লুকানো মনে হয়। শালবনের জন্য এই ধারণাটায় জোর পড়ে। আলো যখন ম্লান তখন হঠাৎ কারো মনে হ'তে পারে এই মন্দির পরিত্যক্ত।

বিষয়টি আসলে কিন্তু পার্থক্য। কাছারীর কাছে সদরের চণ্ডীমণ্ডপের আচার

আয়োজনের সঙ্গে এই মন্দিরের সেগুলির কিছু প্রভেদ দেখা যায়। সেখানে উৎসবের অঙ্গ হিসাবে দশটা ঢাকে কাঠি পড়ে, তেড়ে তেড়ে কাড়ানাকাড়া বাজে, বিদ্যাসুন্দরের পালাগান হয়, এবার তো শোনা যাচ্ছে নাকি ঠিয়াটারই হবে। এখানেও বাজনা বাজে, তা কিন্তু মৃদু বাঁশী আর ঢোল কদাচিৎ জগঝম্পর একটানা ঝমর ঝমর। এখানে নাটমন্দিরে কখনও কীর্তন হয়, মুষ্টিমেয় শ্রোতার সামনে কীর্তনীয়া পদাবলীর সঙ্গে আসর যোগায়, ক্বচিৎ কখনও কথকতা।

এই পার্থক্যগুলির কারণ সম্বন্ধে নানা গল্প আছে। এক গল্প বলে এই বংশের বৃন্দাবনী গুরু, গুরুপরম্পরায় যিনি নাকি শ্রীজীবের বংশধর, তিনি এখানে প্রায় পাঁচ বছর ছিলেন। এবং সাধনা করতেন। এবং তাঁর প্রত্যাদেশেই এই রাধামাধব বিগ্রহ। এই শালগাছগুলি তখনকার। যদি দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে মেহগ্নিও আছে তবে বুঝতে হবে সেগুলি পরে লাগানো। সাধনার জন্য নিভৃত স্থানই প্রশস্ত।

এখনও (সাধনাটা বোধ হয় নেই) কিন্তু নিভৃতিটা আছে। পূর্ণিমা কিংবা তার আগের কয়েকটি রাত্রিতে শালবনে যখন জালিকাটা আলো তখন এই মন্দিরের কাছে কারো চেষ্টা থাকলে সে নিভৃতিকে খুঁজে পেতে পারে।

অন্য গল্প এই যে কাছারীতে নানা ধর্মমতের লোক আসে। আরও আগে ভিন্ন ধর্ম-মতের এমন কেউ কেউ আসতো যাদের মুখ থেকে কথা খসলে দু চারটে মন্দির চূর্ণ হ'য়ে প্রমাণ করতে পারতো প্রকৃতপক্ষে সে-সব মন্দিরের বিগ্রহরা মদনমোহন কিংবা নৃসিংহ হোক সবই ঠুঁটো জগন্নাথ, ভক্তকে রক্ষা করা দূরে থাক আত্মরক্ষাও করতে পারে না। অথচ তখন এমন অবস্থা যে রাজবাড়ির কর্তাব্যক্তিদের ওঠাবসা কাজকর্ম সবই সেই ক্ষমতাবান ভিন্ন ধর্মমতের মানুষদের সঙ্গে। তাঁরা এলে কাছারীতে এমন কি প্রাসাদের কোন কোন ঘরেই ওঠাবসা এমন কি আহার না হ'ক একত্রে মদ্যপান তো চলতোই। কর্তাব্যক্তিরা তখন শিলোয়ারচুস্ত, চোগা চাপকান পরতেন। সে পোশাক নিয়ে কি রাধামাধবের সামনে দাঁড়ানোও যায়। অথবা বাড়ি ভেঙে দিলেও যে জগন্নাথের হাত দেখা দেয় না তার পক্ষে প্রকাশ্যে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

গল্প যাই হ'ক এই নিভৃতির অর্থ পরিত্যক্ততা নয় তা এখনই বোঝা যাচ্ছে। দূর থেকেই মন্দিরের বারান্দায় কাজের লোকদের দেখা গেলো। শীতের ছোট দিন। হয়তো অন্নভোগের আয়োজন শেষ ক'রে দিয়ে এখনই শীতলের আয়োজন করছে।

শিরোমণি একবার যেমন বলেছিলো রজোগুণটার প্রকাশ তবু চোখে দেখা যায়। সত্ত্ব যেন ফুলের গন্ধর চাইতেও হাল্কা আর অদৃশ্য, যেন লুকিয়ে থাকে। বলা হ'য়ে থাকে রাধা-মাধব বলো মদনমোহন বলো সত্ত্বগুণের উপাসনা। এ নিয়েও এক গল্প আছে। একজন মদনকে পুড়িয়ে ছাই করেছিলেন। তাতে নাকি বিশ্বময় সে ছড়িয়ে গিয়েছে। অন্যজন মদনকে মোহিত করেছিলেন। মদন পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছিলো। স্বীকার করেছিলো হার। না রূপে না গভীরতায় সেই একজনের প্রেমের কাছে প্রেমের রাজা মদন কিছু নয় তা স্বীকার করেছিলো। তার পরে মদন কি করেছিলো? সে সম্বন্ধে এখনও কবিতা লেখা হয়নি। নাকি রূপসনাতন-দের কারো কাব্যে তার আভাস আছে।

কিন্তু মানুষ কি পারে—কামের চাইতেও মনোমোহন কোন অন্তহীন অতল ভালোবাসায় পৌঁছাতে, তেমন কোন রসকে আস্বাদন করতে, আহা, যা পরকীয়া প্রেমের চাইতেও মধুর? চরম সাত্ত্বিকতার সেই চরম মাধুর্য কৌপীনবন্ত কারো ভাগ্যে জুটেছে কি না জানি না কিন্তু মানুষের পক্ষে ও পথটা খুবই কঠিন।

আর তার প্রমাণও আছে। রানী নিজেই জানেন। (তাঁর মুখে কি হাসির মতো কিছু? তাঁর কি এই কথাগুলোই মনে আসছে?)

কাদম্বিনী খুবই ভালো গাইতে পারতো। বৃন্দাবনের সেই মন্দির ছাপিয়ে শুধু বৃন্দাবনের পথেই নয় তার যশ তখনকার খাস দিল্লীর দিকে চলেছিলো। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার দিল্লী। দিল্লীতে তখনও বাদশা। সুতরাং আমীর উজীর মনসবদার। উপরন্তু কাদম্বিনী তার শ্যামবর্ণ সত্ত্বেও টিকল নাকে, টানা চোখে, শরীরের গঠনে সুন্দরী ছিলো অসামান্যাই, তার সেই পঁচিশ বছর বয়সে। ফলে কাদম্বিনী বৃন্দাবন থেকে কাশী এসেছিলো। মাথা কামিয়ে গৈরিক পরে সেই কায়স্থের বিধবা নিজের চারিদিকে এক কঠিন ছদ্মবেশ তৈরি করেছিলো। কিন্তু এক সময়ে সে রানীর সহচরী হয়েছিলো। এবং ক্রমশ সেই ছদ্মবেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলো এক নতুন সৌন্দর্যের স্তিমিত পূর্ণতা নিয়ে। তখন অবশ্য রানী রানী হননি।

কাদম্বিনী এই রাজবাড়িতে এসেছিলো রানীর সহচরীরূপেই। দাসী বা পরিচারিকা নিশ্চয়ই নয়, বরং সঙ্গিনী যেন বা নতুন পরিস্থিতিতে মন্ত্রিণী। আর তার প্রমাণ তার বেশ-ভূষাতেও ধরা পড়তো। সে আপত্তি করলেও রানী সোনার কাজকরা বেনারসী পরলে তাকে রুপোর কাজকরা বেনারসী পরতে হ'তো, নিদেন ঢাকাই জামদানি। রানীর সঙ্গে তার সদ্ভাব ছিলো এখনও আছে।

সেই কাদম্বিনী এখানে গান করতো। সেই বৃন্দাবনের গানই। বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী। রানীর ধারণা তা প্রাণহীন ছিলো না। কারণ কাদম্বিনী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানে যে কোন পণ্ডিতের সমকক্ষ ছিলো। এই গান এবং এই জ্ঞানই রাজাকে আকর্ষণ করেছিলো। নতুবা এটা বলার বিষয়ই হয় না। রানীরা ছাড়াও অন্তঃপুরে সব সময়েই সুন্দরী স্ত্রীলোক থাকে তাদের কেউ কেউ রাজশয্যায় কখনও স্থান পেলে দর্পিতাই হয়; ধর্ম গেলো এবং ভক্ষিতও হলাম এরকম মনে করে না।

কাদম্বিনী একদিন চোখের জলে ডুবে রানীকে বলেছিলো, আমি এখন কি করি বলো। সব শুনে রানী বলেছিলেন, তুমি আমার চাইতে বয়সে বড়, ধর্ম অধর্ম বেশী বোঝ। তুমি যা হ'তে চলেছো সে সম্বন্ধেও আমি বা কি জানি?

কাদম্বিনী বলেছিলো,—আমি কায়স্থ, আমি বিধবা, আমি রাজার বিবাহিতা স্ত্রী নই।

রানীর মুখ লজ্জায়, ব্যথায় লাল হ'য়ে উঠেছিলো হয়তো। (এখন তা রানীর মনে পড়ে না। সেই তো প্রথম জানা গেলো নিঃসন্তান রাজার সন্তান হ'তে চলেছে। রানী তখন নিজের শরীরের অবস্থাকে কিছু সন্দেহ করছে মাত্র, আর এদিকে কাদম্বিনী নিজের অভ্যন্তরে সত্তাটাকেই উপলব্ধি করছে।) রানী বলেছিলেন, এ নিয়ে তুমি খুব লজ্জিত বা অপমানিত বোধ করছো এরকম অন্তত রাজার কানে ওঠা ভালো হবে না। বিবাহিত না হ'লেও রাজ-বাড়িতে থাকাই তোমার পক্ষে ভালো হবে। সামান্য কিছু মাসোয়ারা নিয়ে অন্য কোথাও থাকলে কোথায় নেমে যাও তা বুঝে দেখো। গান্ধর্ব মতটাকে যখন মেনেছো তার উপরে বিশ্বাস রাখো।

এখনও কাদম্বিনী তার টিকলো নাকে তেমন সরু ক'রে তিলক কাটে। কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে। দু আনির বাড়িতে তার মহলটাই আলাদা। তাকে নগণ্য মনে হয় না। আসল ব্যাপারটা এই যে মানুষের পক্ষে সেই প্রেমোত্তর প্রেমের সাধনা খুবই কঠিন। কিন্তু তা হ'লেও প্রেমোত্তর প্রেমের প্রত্যয়টাও মিথ্যা নয়। সুগন্ধির ঝাঁপি যদি ঠাসা ভরতি না হয় তবে সুগন্ধি

বস্তুগুলোর উপরে যে শূন্যতা সেই ঝাঁপিতে তা অদৃশ্য সুগন্ধে ম ম করে। যেমন রাজবাড়ির পিছনে এই শালবাগান। রাজবাড়িকে স্পর্শ করেই আছে। তবু যেন কিছু পৃথক। হয়তো যে রাজা বাদশাহী ফারমানের জন্য পাটনা অযোধ্যা হ'য়ে দিল্লীতে যাতায়াত করতো তার মনের মধ্যেও কোথাও এমন একটা অসাধারণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিলো যা সার্থক হ'লে রূপ-সনাতনের বৈরাগ্য হয়।

রানীর মুখ অন্তর্লীন হাসিতে উজ্জ্বল দেখালো। পায়ের তলায় শুকনো শালপাতা বিছান পথ।

নয়নতারা বললো,—বনমর্মর বলে নাকি একে?

নয়নতারার দুষ্টুমিতে আবার হাসলেন রানী।

এটাও কিন্তু কম কৌতুকের নয় যে রানী আজ খিড়কির দিঘীতে স্নানে চলেছেন। (স্নানের জন্যই তো দিঘী এবং সেখানকার বাঁধানো ঘাট এমনকি পুরনারীদের জন্য স্নানের যে ঘর জলের উপরে—তা সত্ত্বেও।) এবং এখানে চলতে গিয়ে এ পুরনো কথাগুলো যেন তাঁর মন ছুঁয়ে যাচ্ছে। ঠিক ভাবছেন এমন নয় যেন মনে ঢুকতে দিচ্ছেন। কৌতুকটা এই যে এভাবে এ পথে স্নানে এসেই কি এমন হ'লো, অথবা মনে আসছিলো বলেই তিনি এ পথে এসেছেন আজ?

কিন্তু এ কৌতুকের সমাধান করতে হ'লে তো মনের এমন অর্ধস্ফুট অনুচ্চার চিন্তার খবর রাখতে হয় যা লেখকের সর্বজ্ঞতার সীমাকেও ছাড়িয়ে যায়।

অদূর ভবিষ্যতের ঘটনা মনে এনে বলা যায় রানী হয়তো সেদিন সংবাদ পেয়ে থাকবেন কাদম্বিনীপুত্র অন্য কথায় কায়েতবাড়ির ছেলে এই রাজবাড়িতে আসছে। রাজুর এবং তারও জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রথম। রাজুর মনে কি ধাক্কা লাগবে? যখন তাদের সাক্ষাৎ হবে? অবশ্য সাক্ষাৎ হতেই হবে এমন কথা নেই। এ বিষয়ে পরে আরও ভেবে দেখা যাবে এইরকম একটা চিন্তার কাছে এলো তাঁর মন।

পরে না হয় ভবিষ্যতের কথা ভাববেন কিন্তু অতীত? অতীত আর ভবিষ্যতে এই তফাৎ যে অতীত নিজের মনেরই এক অংশ যেন।

—কাদম্বিনীকে এর পরে অন্যত্র থাকতে হয়। গম্ভীর খাদের গলা ছিলো রাজার।

—তা তো বটেই। কি-ই বা বুদ্ধি তখন সেই অষ্টাদশী রানীর।—আপনি কি বাগান-বাড়ির মতো কিছু ভাবছেন।

—সে রকম কিছু। যদি বলো কলকেতার দিকে যেমন হচ্ছে তেমন একটা শাহাবাদ পরগনায়।

—তাই হ'ক। কিন্তু তা রাজবাড়িই হ'ক। নতুবা কাদম্বিনী ছোট হ'য়ে যায় না! আর সে ছোট হ'লে আমারও সম্মান থাকে না।

তাই হয়েছিলো। শা'বাদ পরগনার আয়েও একটা রাজবাড়ি চলে বৈকি। আর সেখানে কায়েতের মেয়ে কাদম্বিনী একা নয়, যেন এটা নীচ কিছু নয় এরকম বোঝাতে এ বাড়ির অনেক আশ্রিত সে বাড়ির আশ্রয়ে গিয়েছিলো, অথবা তাদের তেমন রাখা হয়েছিলো। আর আশ্রিত মানুষরা যদিও তারা রাজার আত্মীয় এবং কায়েৎও নয়, কাদম্বিনীর সম্বন্ধে উন্নাসিক হবে এমন হয় না।

শা'বাদ পরগনার কাছারী অবশ্য অন্যান্য পরগনার কাছারীর মতোই নাইব-ই-রিয়াসতের অধীন। তার আয়-ব্যয়ের হিসাব সুস্নারনবিশ দেখে থাকে। কাছারীর ভাষায় তা আমাদের

রাজবাড়ির হিসাব। রাজবাড়ির অন্দরে তা কায়েৎবাড়ি। কিন্তু বর্তমানের প্রতাপ এই যে অতীতের গভীরতা আর ভবিষ্যতের বিস্তৃতিকে নিজের চঞ্চল গতির সাহায্যে ভুলিয়ে দিয়ে থাকে।

দূরে থেকে যাদের দেখা গিয়েছিলো মন্দিরের বারান্দায় এখন তারা স্পষ্ট। তারা সকলেই ব্যস্ত। তারা কেউ ক্ষীরছানায় মিষ্টি গড়ছে, কেউ লুচির ময়দা নিয়ে ব্যস্ত। তারাও রানীকে দেখেছে। আজ কেউ কাজে ফাঁকি দিচ্ছে না সুতরাং কর্মরত অবস্থায় রানীর দৃষ্টিতে পড়তে পেরে তারা বরং খুসী হ'লো।

রানী ওদের থেকে কিছু দূরে বারান্দায় বসলেন। রানীর পা নিচের সিঁড়িতে। রানী জুতো পরেন না, পায়ে আলতাও দেন না। তিনি তেমন ক'রে সিঁড়িতে পা রেখে বসেছেন ব'লে জানা গেলো পায়ে গুল্ফের নিচে সরু পাটিহারের মতো পায়জোর। ঘুঁণ্টি নেই, তাই নিঃশব্দ; অযত্নে রুপোটা কি কিছু ম্লান?

এখন কি রানী এখানে গল্প করবেন? যেহেতু প্রাচীনাগণ পরিচারিকা শ্রেণীর নয় বরং দূরের হ'লেও আত্মীয়া সম্প্রদায়ের এখানে গল্প চলতে পারে।

আজ ভোগের আয়োজন কি হয়েছে, শীতলের আয়োজন কি কি হবে কারণ এ সবই তো সেই একজনের যিনি রাজার রাজা। আজ শীতল প্রসাদ কার বাড়িতে যাবে তা আলোচনার পর যখন জানা গেলো আজ তা লিস্টি অনুযায়ী শিরোমণিমশায়ের বাড়িতে যাচ্ছে তখন সেই সূত্রে যেন আলাপটা ফেঁপে উঠতে পারলো। এটা একটা প্রথা শীতলের প্রসাদ গ্রামের ভদ্র গৃহস্থদের কাছে পেঁছে দেয়া হয়। একশ' জনের নাম আছে তালিকায় ঘুরে ঘুরে সেই তালিকা অনুযায়ী বাড়িতে যায় প্রসাদ। গ্রামের একশত ভদ্র পরিবার—বলা বাহুল্য তারা কিছু পরিমাণে অর্থবান, এবং এমন যে অনাহূতভাবে রাজবাড়ির মন্দিরে প্রসাদ পেতে আসবে না।

শিরোমণির নামের সূত্রেই একজন বললো,—অনেকদিন কথকতা হয় না। সামনে পূর্ণিমা। বললে হয় শিরোমণিকে।

রানী বললেন,—কেউ কেউ বলে শিরোমণির কথকতা কাঠ কাঠ।

—সংস্কৃত বেশী থাকে। কিন্তু অমন ব্যাখ্যাও সহজে কেউ দিতে পারে না। গতবারে মানভঞ্জনের ব্যাখ্যা যা করেছিলো তা এখনও যেন কানে লেগে আছে। আমরা কি জানতাম যিনি তাঁর হ্লাদিনী শক্তি, যিনি প্রায় অভেদ তাঁর থেকে, তাঁরও এমন অভিমান থাকা উচিত নয় যে তিনিই ঈশ্বরকে সবচাইতে বেশী ভালোবাসেন, ঈশ্বর তাঁরই একমাত্র। ঈশ্বর চন্দ্রাকেও কৃপা করবেন। সেজন্য মান করা শোভা পায় না এটাও তো সাধনার অঙ্গ। আমি সব চেয়ে বড় ঈশ্বরভক্ত এটাও তো সাধনার বিঘ্ন।

রানী বললেন,—তোমার ব্যাখ্যাও কম যায় না, সুরধুনি। বেশ তো শিরোমণির বাড়িতে যে যাবে শীতল নিয়ে তাকেই বলে দিও শিরোমণিকে কথকতার নিমন্ত্রণ দিতে।

—আমার তো মনে হয় বিরুদ্ধ নেতা হওয়া মানুষের স্বভাবেই থাকে। সেই আসরেও একজন ছিলো। ক্ষণকালের আসর, রানী এখনই উঠবেন স্নানে, কিন্তু মনের মধ্যে বিরোধ-প্রবণতা নিজেকে নিয়েই একশ'।

তেমন একজন বললে,—নয়ন নাকি শিরোমণিদের ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ দিয়েছিলে?

—শিরোমণিদের নয়, শুধু তাঁকেই। নয়নতারার মুখটা যেন একটু লাল হ'লো।

—তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন, আর তারপর বলতে পারোনি কাউকে আর?

আর একজন বললো,—আমাদের রাজবাড়িতে তো ব্রাহ্মণ কর্মচারীর অভাব নেই।

অপরা বললো,—তারা অন্তত বাধ্য হ'য়েই আসতো।

নয়নতারা মুখ নামিয়ে নিজের পায়ের দিকে চেয়ে রইলো।

কিন্তু রটালো কে এই প্রত্যাখ্যান? এই প্রশ্নটা বা কে করলো? তা কি রানীর দৃষ্টি? রটনা শিরোমণির নয় তা না বললেও বোঝা যায়।

রানী যখন কথা বললেন তাঁর গলাটা গম্ভীর শোনালো। তাঁকেও কথা বলতে সময় নিতে হয়েছে। বললেন তিনি,—তোমার কি ব্রাহ্মণভোজনের দিন পার হ'য়ে গিয়েছে? ওরা যেন তাই বলছিলো—।

নয়নতারা রানীর দিকে চাইলো। তার চোখের পাতাদুটো কি কাঁপলো। সে ধীরে ধীরে বললো,—তাতে কি শিরোমণিকে অপমান করা হবে না। তিনিও তো গ্রামের একটা শক্তি!

রানী হাসলেন। এ হাসির নানা অর্থ করা যায়। কিন্তু যারা সুরু করেছিলো আলাপটা তাদের মুখ ততক্ষণে কালো হ'য়ে গিয়েছে। বিশ্রী এই শব্দটাই যেন প্রত্যেকের মুখ থেকে বেরুবে। কথাটা যে রাজু এবং নয়নতারার সম্বন্ধ নিয়ে কল্পনা থেকে উঠেছে সন্দেহ নেই। রানীর মনে কুৎসিত এই কথাটাই এলো। এবং যেন কিছু এক ক্রুদ্ধ ক'রে তুলেছে তাঁকে। কে সেই ক্রোধের পাত্র। যারা শিরোমণির কথা তুলেছিলো? তারা তো বিবর্ণমুখ, যন্ত্রের মতো হাত চলছে শুধু। অথবা ক্রোধের পাত্র কি শিরোমণি কিংবা নয়নতারা? ক্রোধের পাত্র খুঁজে না-পেয়ে কি তিনি নিদারুণ রকমে হেরে যাবেন? তাঁর একবার মনে হ'লো এরকম আকস্মিক-ভাবে কথাটা উঠে পড়লো কেন? আর সে জন্যই যেন বিষয়টাকে আয়ত্তে রাখতে পারছেন না। অথবা প্রকাশ আকস্মিক হ'লেও একদিন তা আলোচনার বিষয় হতোই। অতীতের সেই সব তো ছেলেমানুষি মোহ ছিলো রাজুর। এখন এ বিষয়টাকে তেমন চোখে দেখা যায় না।

হঠাৎ যেন তাঁর মনে কাদম্বিনী ফিরে এলো। কাদম্বিনী আর নয়নতারার পার্থক্য কি সেকাল আর আধুনিকতায়। কিংবা কাদম্বিনী নিজেকে রাজবাড়ির বাইরের সমাজে কখনও নিয়ে যায় নি যেমন নয়নতারা শিরোমণিকে আহ্বান করতে গিয়ে করেছে? কিংবা কথাটা আধুনিকতাই হয়তো। বাদশাহী ফারমানে যে রাজা তাকে যা মানায় রাজুকে তা মানায় না? তা ছাড়া, আধুনিক কালে মানুষ একপত্নীত্বর দিকে ঝুকেছে—এটা কি সত্য হ'য়ে উঠছে।

কিন্তু রানী বললেন,—এই দেখো, মনে পড়ে গেলো নয়ন, তুমি আর রাজু যে সেদিন অত গভীর রাত ক'রে ফিরলে শীকার থেকে সে গল্পই আমার শোনা হয় নি। স্নান করতে করতে শুনবো।

নয়নতারা বললো,—তা হ'লে চলুন, রানীমা, বেলা হচ্ছে।

পরিজনকে এইভাবে শাসন ক'রে রানী চলতে সুরু করলেন। তাঁর মুখে ক্লান্তির পাশে স্নিগ্ধতা ফুটবে এবার মনে হ'লো। কিন্তু তাও কি সহজে। পাশে এখনও নয়নতারা রয়েছে তো। তিনি যেন নিজেকে তিরস্কার করবেন এরকম এক মনোভঙ্গীর কাছে গেলেন একবার। যেন বা নিজেকে বলবেন এমন করে সমস্যাটা থেকে দূরে থেকেছো বলেই এমন বিস্ফোরণ হ'লো তোমার নিজেরই অন্দর মহলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে, যেমন অন্য সকলে, শ্রদ্ধা করেন। তাকে হীন করলে কি তিনি কিছু করতে পারবেন আর? পুরনো চিন্তাই তাঁর মনে এলো। নয়নতারা এবং রাজুর ব্যাপারটা ওদেরই নিজস্ব। সেটা কি আদৌ কিছু ব্যাপার? সেটায় ধর্মের প্রথা কতটা থাকবে, কি রূপ নেবে সে ব্যাপার তাদেরই। তিনি শুধু ওটাকে নীচতার গ্লানি থেকে বাঁচাতে পারেন। নয়নতারাকে হীন করলে ব্যাপারটা মলিন

হ'য়ে যায়।

তিনি বললেন,—নয়ন, তোমার সঙ্গে বিদ্যেসাগরের মত মিলছে না মহাভারতে, শিরোমণির সঙ্গে মিলছে না ব্রাহ্মণভোজনে। আমার মনে পড়ছে আগে এরকম কথা ছিলো গ্রামে তোমার দাদা স্মৃতিরত্নের মত মেলে না সকলের সঙ্গে।

নয়নতারা বললো,—স্মৃতিরত্ন বলতেন মহাভারত বৃক্ষ।

—সেই যার মূল ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা? সে তো সাধারণ মতই।

—ঠিক তা নয়। বলতেন বৃক্ষ জমি অনুসারে বৃদ্ধি পায়। মন অনুসারে মহাভারতের বৃদ্ধি।

—কথাটা ভেবে দেখার মতো।

রানী স্থির করলেন তাঁকে এবার থেকে ভাবতে হবে। কিন্তু এখন নয়, অন্তত নয়নতারার পাশে থেকে নয়, যেমন নয় বিবর্ণমুখ তাঁর সেই বর্ষীয়সী আত্মীয়াদের কাছে বসে। বিষয়টাকে নিজের আয়ত্তে এনে চিন্তা করতে হবে।

রানী বললেন,—আ, নয়ন, ফরাসডাঙ্গার ব্যাপারটা ভাবতে হয়। ওরা কি করছে? এবার শিবচতুর্দশীতেই কি সেখানে পুজো হবে? কেউ সেদিকটাকে দেখছে না যেন। ওদিকটার ভার নেবে? প্রকৃতপক্ষে রাজবাড়ির পুজোটুজোর ব্যাপারে বিশেষভাবে যাকে দায়িত্ব দেওয়া যায় এমন কেউ নেই। নেবে সে ভার?

—আপনার প্রয়োজন হ'লে তা করবো।

নয়নতারার পাশে কি সত্যি তিনি ক্ষুদ্রকায়া ও মলিন? তা অবশ্যই নয়। নয়নতারা এখনও প্রাপ্তবয়স্ক রাজুকেও প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে এটা ভাবতে গিয়ে তেমন বোকামির কথা মনে এসে থাকবে? আসলে তিনি যা অনুভব করছেন তাকে কথায় আনলে এরকম হয়? আর দেখো এই গরবিনীর রূপ, এই রূপসীর তেজ। চোখ দুটোকে দেখেছো? কোন অপ্রকাশ্য নীচতায় মলিন বলবে?

[ক্রমশ]

জানুঘর

শওকত ওসমান

তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক দুপুর বেলা যখন অকারণ কোন কাজ না থাকার ফলে খামখা বেরিয়ে খোঁজ করছিলাম, যদি অবসর কাটানোর পক্ষে অনুকূল এমন কিছু পাওয়া যায়। মফস্বল শহরের সময় যে সব সময় তরল পারদ হবে, এমন গ্যারান্টি খোদ খোদাও দিতে শত ফেরেস্তাদের সঙ্গে তিনবার কন্‌সাল্ট্ করবেন। শ্লথগতি গ্রাম্য আবেষ্টনীর মধ্যে বাঁধ-ঘেরা জমির মত, এই সব শহর যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে তা চাঞ্চল্যের পরিমাপে অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। জীবিকার বাইরে থিতিয়ে থাকা এখানে সহজ ধর্ম, যেহেতু পেশার পরিমাণও এক মিনিটে গুণে শেষ করে ফেলা যায়। সুতরাং হঠাৎ কোন কাজ উপলক্ষ্যে এমন জায়গায় আট্‌কা পড়ে গেলে, আর আপনার যদি মজ্‌লিসী স্বভাব থাকে, তাহলে কালাকালজ্ঞান বিস্মরণের চেষ্টা পাবেন, মনের খোঁচানির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে। সময়কে যে মহাত্মা নদীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, তাঁর নিশ্চয় কালের ধারণা এবং স্থানের ধারণা ঘোঁটপাক খেয়ে গিয়েছিল অথবা মফস্বল শহর তিনি দেখেননি।

চৈত্র-বৈশাখে উত্তরবঙ্গের দুপুর ঝিরিঝিরি বাতাসে কোন রকমে দেহের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়, যদি না পেশী-সঞ্চালক কাজে অনেক মনোযোগ দিতে হয়। আগেই বলেছি, আমি নেহাৎ অবসরের উমেদার, শুধু কোন একটা হিল্লে মিলে গেলেই খুশী ছাড়া অখুশী হওয়ার কোন কারণ নেই। তাই গ্রীষ্মের দুপুরান্তে হাঁটছিলাম একা একা লোকাল-বোর্ডের সড়ক ধরে যার দুপাশে আম বা অন্যান্য গাছের দংগল সূর্যবিরোধিতার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সৃষ্টির আদিম প্রথম হাঁক থেকে। আর বাতাস স্রেফ কুঁড়েমির একটা অজুহাত দিয়ে ডালপালায় গতর চালছিল অদৃশ্য ব্যজনীর মত, মানুষের আইঢাই ভাব মুছে নিতে তৎপর। অবিশ্যি মাটির উপর সূর্যের ছিটেফোঁটা যা একদম পড়েছিল তা প্রায় অস্বীকার করা চলে এইজন্যে যে, সে ত জংলা ডাঙায় কেবল রংরেজের কোন নক্‌শা বিশেষ। ছায়া-ফিকে কালো বর্ণরূপে এই ডিজাইনের জমিন তৈরী করেছিল স্রোতের মোকাবিলায় নৌকার খাড়া লগীর মত বার বার কেঁপে কেঁপে। উত্তরবঙ্গের পথ আমাকে কাবু করতে পারবে না এই পরিবেশে, যতই না তার দীর্ঘসূত্রতা হাজার আঁকবাঁক ধারণ করুক।

লোকালয় ছিট্‌কে ছিট্‌কে যেন জংগলের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের উদ্দেশ্যে দু'একটা ঘরদোর খড়ো কুটির হঠাৎ ভাসিয়ে দিলে, আর যেন কেউ হদিস না পায়। তারপর মানুষ নিরুদ্দেশ এই পৃথিবী থেকে, এমনই একটা থম্‌থমে দুপুর তোমাকে কেবল বাঁশবন, বেত্‌ঝোপ, কাঁটা শেয়াকুলের জংগল সাজিয়ে ভূত বা তদধিক ভয়খেঁচা কোন প্রাণীর মুখোমুখি দাঁড় করাতে চায়। অনেক ভেতরে ঢুকে গা-ছমছমানি না এলেও, আমি অনুভব করছিলাম, এবার কাজের মত একটা কাজ পাওয়া গেছে, যার মোকাবিলায় অবসর রীতিমত হাঁফ ফেলবে ঠিক, আবার উদ্বেগও পাঁচড়ার মত গায়ে মেখে নেবে।

বাতাসের ছায়াজ শীতলতা মনের উপর নানা আল্‌সেমির পলেস্তারা লাগায়, যদিও ঘুম বা বিশ্রামের ঠেস এগিয়ে দেয় না। আমার পা নিজ-কার্যে মোতায়েন এক একবার হয়ত গতি কমায়, তবু থেমে যাওয়ার ভান করে না এই নিসর্গরাজ্যে যেখানে আকর্ষণের ক্ষমতা

হিসাবকে ঘোল খাওয়াতে পারে। কিন্তু যতোই এগোই সড়ক আরো অপরিচিত ঠেকে এবং ভয়ের মত একটা অতর্কিত হাম্‌লা যেন এলোপাতাড়ি বাতাস-চেরা তলওয়ারের কায়দায় আশেপাশে ঘুরতে থাকে, অথচ আমার নিজের শর্তে কাল কাটাব ব'লেই ত দুপুরের খাতির-জমা বিছানাবালিশ খেয়ালের পানীতে ডুবিয়ে দিয়েছি কোনদিকে নজর না রেখে। এখন মনের বাইরের কোন চাপ এলে তা স্রেফ ইজ্জতের খাতিরে বা নির্বোধ-নাম কেনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমাকে এগিয়ে যেতেই হয়, যেহেতু বাসায় আমার হিতাকাঙ্ক্ষীদের বাধা ঠেলেই আমি একঘেয়েমির খর্পর-খড়্গ ভাঙতে চেয়েছিলাম এই পন্থায়। কাঠঠোক্‌রা পাখির কাঠফাড়া আড়ঠেকা তাল, ডালপালার গদির উপর কাঠবেড়ালির কুদোকুদি, মিথুনকালীন চিলের চিল্লানি, একটেরে লজ্জাভীরু কাকের কালো ব্যবহার, বন্য পতঙ্গের ক্রি-ক্রি-সুলভ তান বা বেত-জঙ্গলে হিস্‌হিস শব্দ—এসবের মধ্যে পিছল মনোযোগ কোন কিছু খুঁজে পেলেও সহজে সেখানে মৌরসী বাসিন্দা-নাম নিতে গররাজি। অবসর নিজের পাঁয়তারা মোতাবেক নিশান-ওড়ানোর বাঁশ পোতে, যখন কোন প্রকার বাইরের ওৎপাতা উঁকিঝুঁকি ঠিক তার গায়ে বর্ষার কেঁচোর মত কিল্‌বিলে ঘৃণার সমগোত্র ঠেকবে।

চারিদিকে তখন নানা-রকমের ষ্টেশন, কোন এক জায়গায় ঠেকে গেলে সময় হুবহু কুম্‌ড়ো-গড়ান গড়িয়ে যেতে পারে, যতক্ষণ না সন্ধ্যার অন্ধকার, সাপ বা ঐ জাতীয় কোন জুজু এসে আস্তানা ঘোরানোর খবরটা দিয়ে যায়। কিন্তু বে-লাগাম ইচ্ছের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে এই রাজ্যেও কীটপতঙ্গ গাছগাছ্‌ড়া মাথা খুঁড়ে খুব সুবিধে করবে ব'লে তখন অন্ততঃ অনুভূত হবার কোন কারণ কেউ উড়িয়ে দিতে পারত না। স্বীকার করে নিতে কোন ঘাট নেই, দিনের বেলা ভয়ের একটা হিসেবনিকেশ এমনই দাঁড়িপাল্লার নীচে থাকে, কিছুটা বেহিসেবী ত চেষ্টা না করেই হওয়া যায়। এইসব কথা বলছি এইজন্যে যে, পরবর্তী ঘটনার পর-পর দ্রৌপদীবস্ত্র-উন্মোচন সম্পর্কে আর তফ্‌সীর বা টীকা না দিলেও কারো বুদ্ধিগম্য হতে যেন বেশী হুড়কা-জাতীয় কিছু অথবা গুরুঠাকুরের ঝাড়ফুঁক বা শিষ্যত্বের প্রয়োজন না থাকে।

ক্রমশঃ সংকীর্ণ গলিঘুঁজি রাস্তা, বৃক্ষলতাপাতার আওতা এমন চোখের সামনে চাপা দিতে থাকে যে ছায়া কায়া ধরে-ধরে গোটা সংকল্প টুঁটি-টেপা ছাগল ব্যাবানির হাঁড়িকাঠে জমা দেয়। অলস অবসরে গাছপালার রাজ্যে রবিঠাকুরের অনুকরণে কোন কাব্যগজ শুঁড় উঁচিয়ে এলে না হয় সিংহাসনের লোভে ঠ্যাং বাড়িয়ে দিতে পারতাম, নিতান্ত নসীব-নির্ভর, সেখানে হাঁক মেরে এলো মেহের আলি যার হাতে বাঁশি এই দ্বিপ্রহরে চিকণ বাউলসংগীতের নির্ভেজাল ধাতব ছুরি পাঠিয়েছিল গিঠ্‌বাঁধা বাতাসকে আবার কেটে কেটে জোড়া দেওয়ার জন্যে। এই আলির ভূমিকা কিছু আগে আর কিছু পরে দুই ভাবে,—যেমন, মানবেতিহাসের ব্যাখ্যায় একান্ত-অপরিহার্য অতীত-অতীত, বর্তমান-অতীত, অতীত-বর্তমান এবং বর্তমান-বর্তমান ইত্যাদির ঠিকানা পরিচয় মায় সর্বকাল-রঞ্জিত ভবিষ্যৎ সহ—দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না, কেবলমাত্র কতগুলো কারণে, যার হদিস এই কাহিনীর সমাপ্তির পর সকলের বোধ-গম্য হবে, আশা করা যায়।

ষাঁড়দেহে রক্তাধিক্য অথবা কী কারণে শিংয়ের ধার-যাচায়ের বায়ু চড়চড় করে, তার ব্যাখ্যা-দান মুশকিল, কেবলমাত্র বুদ্ধির অভাবের জন্য নয়। বরং অনুমান-উপাদান এত বেশী যে সব চালুনী-চোলাই আর মানুষের ক্ষুরে কুলায় না। সহসা বাঁশির আওয়াজ আমার কানে পড়া-মাত্র মনে হ'ল, গুমোট-কাটা আবহাওয়ায় আমি ভাস্‌ছি, চিৎ-সাঁতারে যেমন আকাশকে চোখের উপর তুলে এনে তারি সঙ্গে এক হয়ে গেছি যখন ভারমুক্ত দেহটা আছে কি নেই।

কিন্তু এই বংশীনাদ বারণ করার আগেই ফুৎ হয়ে গেল সেই কায়দায় যেখানে মুখাগ্নিকৃত হাউইয়ের সলিতা যেমন উৎসবের সংক্রামক উত্তাপে আগে থেকেই দাউদাউ উদ্দীপিত থাকে। আমি উৎকর্ণ, কানকে বিচারক করে পাঠাই অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব এবং দূত যুগপৎ। কিন্তু পিঠে অস্ত্রলেখা না থাকলেও ফেরৎ বীর ফেরুর পর্যায়ে গণ্য করা সামরিক বিজ্ঞানের আইন, যদি না পুনরায় রণ দিয়ে সব দখলের আশা নির্মূল না হয়।

এতক্ষণে আমি উন্মার্গচিন্তা ছেড়ে পরিবেশের দিকে বিশেষভাবে সচেতন হই, হঠাৎ-নির্বাপিত রবের লাঙুল কোন গর্তের মুখে বেরিয়ে আছে আবার টেনে বের করতে হবে সেই আশায়। জংগল এবার জুজুবুড়ির নিবাসে ভয়ের সুতোবাঁধা পুতুলগুলোকে দেদোল দুলিয়ে দিতে লাগল যেন হাওয়াভিলাষী আমার চোখেমুখে তারা সহজেই ভেংচি কেটে পগার-পারণ সেরে আবার তখনই হাজির হতে পারে। আমি তাড়াতাড়ি তাই বাঁশি তথ্য মানুষ, মানুষের ঠোঁট, সুকপাল হলে গোটা মানুষটাই পেয়ে যেতে পারি, এমন সোয়াস্তি-টানা বাঞ্ছা নিয়েই পায়ের পেশী তেজেল করতে লাগলাম। কিছু দূর এগিয়ে হঠাৎ-রূপান্তরিত কাষ্ঠখন্ড আমি, দুচোখ মেলে কেবল দেখতে থাকি একটা কালো যমদূতসদৃশ মোটা গর্দান ঘাড়-ঝোলা বাবরি কেশ, ভীষ্ম-ভীষ্ম উঁচু দেহ সাঁজানো জক-লাল তেরিয়া চোখে এগিয়ে আসছে, কুকান্ড একটা কিছু ঘটানোই যার অভিপ্রায়ের মোদ্দা কথা। কাপালিকের মত তার গলার গুঞ্জামালায় আমি আমার ফাঁসি-ঝোঝুল দেহটা আগে থেকেই অবলোকনের সুযোগ পেতাম, যদি না ওর ভয়ঙ্কর কালো হাতে আড়-কেষ্ট বাঁশিটা আকস্মিক আমার চোখে পিছল ছোবল মেরে সরসর পরিস্থিতি বেমালুম খুলে ধরত খোলা ঝাঁপি আর খাড়া নাগিনীর পাশে-বসা বেদেনীর কায়দায়। ধড়ে বুকে বেবাক-নিরাপত্তা ফেরৎ-প্রাণ আবার আমাকে আরোহী বানিয়ে তোলে যে-জায়গায় ছিলাম ভারবাহী জানোয়ারের নমুনা কাঁপা-ফাঁপা মন—মাটীতে মুখ থুবড়ে পড়ার জন্যে একটা অছিলা শুধু কোনরকমে ঝট্‌কামারার প্রতীক্ষা।

আমি কখন থেমে গেছি, আমি নিজেই জানিনে বললে, যদি মনে করেন মিথ্যে কখন হ'ল, তাহলে জোড়হাতে ভাত-নেই ব'লে অতিথিবিদায় দেওয়ার মত আমিও পথের পাশে দাঁড়াব না শুধু, চোখ রাঙাব এবং বলব : সত্যিই আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম যখন সে আমার সামনে এসে আমার রাস্তা-বিহ্বল চেহারা দেখে ঝুপো গোঁফের ফাটলে-ফাটলে অনেক হাসি ছিরছির চালিয়ে দিলে, পানীর উপর যেমন ছেলেবেলায় খোলাম-কুঁচি ছুটিয়ে দিতাম কচি মগজ থেকে আর কিছু বের করতে না পেরে।

ঘটোৎকোচের থুৎনীর নীচে তপোবনের কিশোর ঋষিপুত্রের ন্যায় আমি ভ্যাবাচ্যাকা-ভাব কোন রকমে কাটিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে হাসি অব্যাহত রেখে বললে,—কুথা থেকে এলি বাবু এই জংগলে এমন অকালবেলায়, জান্ দিবি নাকি? জান্-ঘরে তখন তোকে কে বাঁচাবে শুনি?

কথার সব অর্থ মগজ-তাঁবে ফেলার আগে এবার সত্যি আমার মেরুদণ্ড ছেনেছেনে ত্রাসের ছিল্‌কাগুলো অন্যান্য শিরাপথে যদ্দূর সম্ভব অষ্টাঙ্গের ধারে গিয়ে আবার চোঁচা মেরে দৌড়ে গেল উৎপত্তি-স্থলে যেখানে দিশেহারা পরিস্থিতি পাঠ করে নিলে চট্‌চট্ এবং জবাব দিলে যেন সেই বান্দা চেনা জায়গায় ঘুরছে মাত্র, ভূগোলের বিদ্যা নিয়ে পাহাড়ে উঠছে না—পায়ে জুতো আছে, সঙ্গে অক্‌সিজেন রয়েছে।

—জান্‌ঘর কী রে?

—জান্‌ঘর চেন না?

—না।

—জান্‌ঘর, সাহেব...তোমরা যারে মরগ...মগ্‌ না কি বল।

মর্গ্‌-শব্দে আমি কেয়ামতের পর পুনরুজ্জীবনের অধ্যায় সেরে আদমের মত আবার পৃথিবীতে নামছি, পাশ ঈভ্‌হীন আর চন্দ্রসূর্য বোঁ-বোঁ-ব্যোমচারী হে'কে উঠছে, 'কোথায় যাও। দুনিয়ায় অনেক ঝামেলা। তার চেয়ে এইখানে আর একটা ঈভ যোগাড় করে নাও, সব ঝামেলা ইতিমধ্যে মিটিয়ে নিতে পারো। তখন তুমি সত্যিই মাটীর উপর পা রেখেছো, এবার চরে খাও।'

অর্থপূর্ণ অবসর-যাপনের জন্যেই সব-খোয়ার এই হন্যে পর্যটন এহেন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে যে মনের স্বস্তি লোপাট হতে-হতে আবার খাড়া হয়ে উঠল একটি শব্দের কৃপা-নাদে, যার যোজনা এই বিকেলে কোথায় কী যবনিকা নামাবে কে জানে? তাই আমি তার দিকে চেয়ে ভান করে ফেলি যেন কোন ভয় পাইনি : তুমি হাতিয়ার-ধারী দস্যু হলেও আমি রাজার প্রতিনিধি এবং আমিও অস্ত্রসজ্জিত। তাছাড়া আমার পেছনে আরো আছে যারা দরকার হলে তোমার মহড়া নেবে।

—জান্‌ঘর কোথা?

পরিবেশ আমার কবজে এসে গেছে, তা আমি নিজেই বুঝতে পারি যখন আমার মুখ দিয়ে আরো জিজ্ঞাসা থলিবন্ধ গোল আলুর মত হুড়হুড় বেরিয়ে আসার জন্যে দপদপি করে এবং একটা বুলেটের মত ছিট্‌কে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়,—তুমি কে?

—আমি জান্‌ঘরের ডোম। আমার বাপের দেওয়া নাম হীরালাল ডোম। সারজন সা'ব বলে হীরু।

—জান্‌ঘর কোথায়?

—ওই—

ডোমের গাইড তর্জনী তার বাঁকা ঘাড়ের সঙ্গে গিয়ে থামল আমার ডানদিকে গাছ-পালার ঝাঁঝ্‌রির ভেতর দিয়ে একটা দালানের উপর, যার একতলা মূর্তি শেওলার মোড়কে হঠাৎ দাঁত-বের-করা চুনকামের সাদায় এবং ছাদে হুমড়ি-খেয়ে-পড়া ডালপালায় এই জরতী বৈকালের চটা আলোয় শুধু প্রাগৈতিহাসিক বললে সঠিক জরীপ করা হবে না। দৈত্যলণ্ড-ভণ্ড শৈলশিরার মত এই ইমারৎ কালিদাসস্য মেঘ নয়, তবু সুখীজনের চিত্তশান্তি হজম করার জন্যে যথেষ্ট এবং ক্রমশ খতম দিনের ভ্রূকুটিতে ভয়ঙ্কর। সাত শ' রাক্ষস এবং সাত শ' রয়েল বেংগল একসঙ্গে বহুদিন উপবাসের পর একটা টিঙটিঙে মানুষ দেখলে যেভাবে হুহুঙ্কারে চীৎকারে প্রতিযোগ-প্রতিযোগিতামত্ত হতে পারে, আমার ত্রাস-শিরার দল তেমনই ব্যক্তিত্বঘাতী —বিরোধিতায় হুহু সচল-চঞ্চল আপন গতিপথে হন্যে। শিকারও চীৎকার দেয় শিকারীর মত, তেমনই আমি ভয়ার্ত স্বর গোটা এলাকা এবং গোধূলির নার্ভে ইনোক্যুলেট করতে পারতাম খুব সহজেই, ডোমও বাদ যেত না হয়ত। এই অনিশ্চয়তা বাধা দিলে, বোম-বাজির ভিজে সলিতা আগুন দেওয়ার পর মাঝপথে ফুস্‌ফুস্‌ বারুদ ছড়িয়ে আর না এগোলে ও বালক ফুঁ-দানে তা নিষ্পন্ন করতে গেলে মুরুব্বীরা যেমন বারণ হানে অন্ধত্ব পঙ্গুতার দোহাই টেনে—সেটুকু হিসেবী মন অবশিষ্ট ছিল। নির্বন্ধ অবসর-আবেষ্টনীর মোহ এতক্ষণে মজ্জমানের খড় ধরতে পেরেছে বিধায় আর সহসা একঘেয়েমির খোঁয়াড়ে ঢুকতে নারাজ নয় শুধু, যে-টোপ গিলেছে তা টাক্‌রায় লাগলেও সহজে উগ্‌রে দিতে অনিচ্ছুক। সব ঝেঁটিয়ে গলা তাই পরিস্থিতির লাগাম হাতে নিয়ে ভাঁটা-চোখ ডোমকে বললে,—ওইখানে নিয়ে চল্‌—

হীরু সংক্ষেপে বয়ান করলে, এই নির্জন বিপদ একমাত্র কোন প্রাণতৃষ্ণাহীন প্রাণী অথবা মসিবত-লোভী দুঃসাহসী—স্রেফ চোয়াড় ছাড়া কে আর চুল্কে ঘা করার মত, খুঁচিয়ে গায়ে মাখতে যাবে—যখন খোদ্ সার্জন্ গায়ে শামলা চড়াতে চড়াতে দোয়া-দরুদ পড়েন এবং সাঁড়াশি কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় কি যেন উচ্চারণ করে লাশের উপরকার চাদর তোলার আগে যেমন সেদিন নয় শুধু (এবার এক যুবক এসেছিল, তাকে খুন করে এক মেয়ের স্বামী যে ওই মেয়েকে উক্ত যুবকের সঙ্গে একত্রে এক বিছানায় বিহার করত বিয়ে করার পূর্বে, যেহেতু ভোগ্যা ছিল বারবণিতা কাজেই তা সংগত ছিল এবং কবুলতি অনুসারে একের জমি অপরে দখল অবিধেয়, তখন ছোরা দিয়েই আইন অক্ষত রেখেছিল, যদিও বৈধ বিবিকে ক্ষত করেনি শয্যাক্ষেত্র ছাড়া যেখানে সব মহাপুরুষই পুরুষ) বহুদিন তাকে এই করতে তখন দেখা গেছে, তখন প্রেতের রাজ্যে ঘাড়ের হাড্ডি-যাচাইয়ের প্রবেশ মূর্খতা, যদিও সে ত রোজ যায়, তা কেবল পেটের আঁকুশিতে, বিবির গঞ্জনায়, তদুপরি হাড়িয়া-পচুইয়ের ভরভর গন্ধে—যা ব্যতিরেকে দেহ ত দূরের কথা আকাশ খান্খান হয়ে যাবে ইস্রাফিলের শিংগা ছাড়াই। কতো মহেঞ্জো-দাড়ো ওই ছোট দালানের মধ্যে আলিস্ ভাঙে, কংকালে-কংকালে ডুগ্ডুগি বাজিয়ে, কলসের পাশে বল্লম-গাঁথা দেহ দুম্ড়ে যেন অতর্কিত হামলা চিরাচরিত এই রাজ্যে, বিনা ঘোষণায় নৈরাজ্যের তরঙ্গে ধ্বসে-ধ্বসে দেহবান। বেল্লিক দুঃসাহস যদি আবার বায়ে পরিণত হয়ে থাকে, তাহলে তা পারাপারের একমাত্র উপায়, কিছু কারণ-বারি-সমুদ্র সাঁতরানো যেন ডাঙা আর চোখে পড়ুক বা নাই পড়ুক, পা মাটিতে ঠেকুক বা নাই ঠেকুক—অনন্তকালে গিয়ে মিশতে পারবে, টেরের প্রয়োজন হবে না।

অগত্যা তাকে স্বীকৃতি দিতে হ'ল আর এক গন্তব্যে পৌঁছে। তা বুঝতে পারলাম, সেখানে জংগলের মধ্যে ছোট উঠান আর সিঁড়ির পরিবেশন দেখে এবং মাটির মাল্সায় সাদা ফেণাফণাধর তাড়ির বিভাষ কানে শিস দিচ্ছে টের পেয়ে, এবং অনুভব করলাম, এই বিজনে ডোম যা আছে তার সংখ্যা জনপদের নির্ভরতা-নিঃশঙ্কতা দূর করে না, বরং শ্বাপদের লেজ-আছ্ড়ানি ও নিঃসৃত জিহবার হিস্হিসানি লতায় বাতাসে আরোপ করে ভয়াবহতা পুণ্য-ফলের মত সত্তরগুণ বাড়িয়ে তোলে এবং তুমি ভয় পাও আর নাই পাও মনে হবে, তোমার ছায়া অন্ধকারেও তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আততায়ীর মত নয়, অক্টোপাশী নুলো ও দংষ্ট্রার আকারে। কয়েক ঘোঁটের পর জানতে পারলাম, ডিস্পেপ্সিয়া-আক্রান্ত কেরাণীর স্বপ্নে অফিসার ব'নে যাওয়ার মত আমার সাহস মোটা পুরু, ভরসা এলাহি ছাড়াই, শূন্য ও গগন-ভেদী হচ্ছে এবং আমি নিজের খাপ থেকে বেরুনো এক বাঁকা তলয়ার—যে-কোন পাহাড় কেটে বেরিয়ে যাব না কেবল, বরং বরফের উপর স্কেটিং পর্যন্ত করতে পারব, তা এক ডাকে বলতে পারি যা মাতালেরা হামেহাল করে থাকে। যে-ডোম্নী অমৃতবারি ঢেলে যাচ্ছিল তার দিকে আমি চাইতে সাহস পাইনি শুধু তার মৌরসীবাঁধা যৌবনের জন্য নয়, যা এক লহমায় কবে চুমুক মেরে নিয়েছিলাম। তার হাতের পেশী এবং বালা মাভৈয়ের ধারেকাছে যেতেও ঘাড় বাঁকায় অপিচ শাসানির শংকর-চাবুক সদা ঝুলন্ত রাখে যেন সার্কাস-সিংহিনীর ট্রেনার বা বশীকরণ গুরু। এই ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, ধীরে ধীরে পানীর সমতলের মত মানুষে মানুষে পার্থক্য ঘুচে গিয়ে এক আবেগ-হুল্লোড় কলরবে সব টুইটুম্বুর রূপ ধারণ করে এবং মনের ইচ্ছা নিজের গতিপথে এমন বেগবান হয় যে অভীষ্ট কাজের দিকে হন্যে হয়ে ছুটতে থাকে। তা-ই আমাকে গ্রাস করছিল নিঃশব্দে, এক চুমুক এবং ফেন-গুঞ্জরণের ব্যাঘাত ছাড়া। ওদিকে কালো ছায়া ফেলছিল রুপ্পা দস্যুর মত স্থান এবং কাল ডিঙিয়ে খরা দিন

আমাদের এই আসরের অলীকতা প্রমাণ করার জন্যে ও বুঝিয়ে দিতে যে, উদ্দেশ্য এবং উপায় ঘুলিয়ে ফেলে ধার্মিক বা সমাজসংস্কারকদের যে-দশা হয় সেই বুমেরাং আমাদের ক্ষেত্রেও আত্মভেদী হতে বেশী দেরী নেই। তাই হঠাৎ মাটীর মাল্‌সা আছড়ে রেখে 'জান্‌ঘর' এই রণচীৎকার-যোগে আমি উঠে পড়ে ডোমের অনুগমন-ব্যবস্থা করব কী, সে আমার হাত খপ্‌ করে ধরে পথ-সচেতন ধমক দিলে এবং চলতে লাগল পেছনে-ফেলে-আসা মর্গের উদ্দেশ্যে, আমার গন্তব্য যেখানে পূর্বেই সব মর্টগেজ দিয়ে বসে আছে রেহেনী করুণায়।

নিঃশ্বাসের সঙ্গে পাল্লা-রত পা, চোখ হুমড়ি-খাওয়া লতার আচ্ছাদন বন্য ঘাসের গতিহর ষড়যন্ত্র ঝেঁটিয়ে যখন মর্গের দরজায় থামল এবং হীরু ডোম সাত লিভারের তালা খুলতে ভেতর থেকে একটা ভোদ্‌কা গন্ধ ঝেঁঝিয়ে নিঃশ্বাসের স্বাভাবিক ঝুঁটি ঝাঁকানি দিলে, তখন অন্তস্থিত সোমরস পর্যন্ত চল্‌কে বাইরে আসার জন্যে আঁকুপাকু করতে লাগল, যেন দোজখের দরজার মত এখানেও লেখা আছে : প্রবিষ্ট জন আশা পরিত্যাগপূর্বক এই-স্থানে প্রবেশ করো। কিন্তু কারণ-বারি আসলে হেতুজল, বিশ্বসৃষ্টির প্রথম হেতুর যত রহস্য-সজ্জিত, যার ঝাঁঝ-ঝলক পরমাণু-মুহূর্তেও নিবারণ-সাধ্য নয় ব'লে আমরা উভয়ে যখন ঢুকে পড়লাম প্রবেশকুণ্ঠ দিনের আলো চোখের ধাঁধায় মেঝের উপর নিয়ে আমাকে বিচরণের অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করলে।

বাতাসের সাহায্য নিতে হীরু ডোম একটা জানালা খুলতে চোখ ও বুক একত্রে সহ-যোগী দেখতে লাগল—একটা 'হল্‌', তিন চারটে কংক্রিটের মেজ, পাশে ছোট কুঠ্‌রী যেখানে শল্যবিদ বসেন সামনে টেবিল এবং কিছু যন্ত্রপাতিসহ, যথা, ফরসেপ, সাঁড়াশি ইত্যাদি। ডেটলের শিশি, তোয়ালে সাবান প্রভৃতি বেসিনের কাছেই রক্ষিত, যার কিছু দূরে শিলিং থেকে ঝুলছে একটা দেওয়াল্‌গীর বাতি, বোধ হয়, কোন সময় রাতে দরকারে ব্যবহৃত হয়। তখনও বাইরে আলো আছে ব'লে এইসব জরিপ সম্ভব হচ্ছিল, যদিও টলোটলো মাথা এবং অভাবনীয়ের এমন সাক্ষাৎ ঘুলিয়ে তুলছিল ভয়াবহতা যার চোখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আজ, তখন যা মদিরা-ঈক্ষণ মনে হয়েছিল মাত্র। একটা বাঁশের চোঙায় ডোম তার পানীয় আনতে ভোলেনি, যেমন ছুট্‌ হয়নি তার বাঁশি মাজায় গোঁজার—এত হুল্লোড়ের মধ্যেও স্থিতাবস্থা রচনার কারিগরী ইলেম-দাতা। সে নির্বিবাদে এবার নিজের চোঙা-নিঃশেষণে মন দিলে, যখন আমাকে অবান্তর ভেবে নাকচ করলে না শুধু, বরং চুপ করে গেল যেন এবার আমি একটা লাশ—যাকে সে এইমাত্র কাঁধে বয়ে নিয়ে এসে মেজের উপর না ফেলে মেজের উপর খাড়া করে দিয়ে বিশ্রামরত—এখনই যে শল্যবিদ আসবে তারই অপেক্ষায়।

বাইরে বনজ শব্দচঞ্চলতা ছাড়া আর সব নৈঃশব্দ্যের লেফাফাধীন সংকীর্ণতায়, নিঃশ্বাসও যেখানে মজ্জমান আর তার তলায় আমি খাবি খাচ্ছি কোন উদ্ধারের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে নয়, বরং সেদিকের ধারণা মনে বুদ্‌বুদও তোলেনি। আমিও অনড় হয়ে গেছি শুধু সকেটে চোখ ঘুরছে আরো কিছু দেখার জন্যে নয়, কেবল অর্থোদ্ধারের চেষ্টায়—যা বার বার প্রতিহত হচ্ছে আলো-আঁধারির মাকু ঠেলায় এবং এই নিজনতার আক্রমণে। হীরু এখন সেই গাঁঠ্‌রি-বাহক যে মাল ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েই খালাস, তার আধেয়ের খবরদারি নেওয়ার ধার ত ধারেই না, নিজের মজুরী-গ্রহণের ব্যাপারেও চাড়-দেখানোর বিরোধী। আমাকে তখন ঘরের মেজে গিলে ফেলেছে গিরিসর্পের মত কোমর পর্যন্ত, বাকী অর্ধাংশ আকাশে হয়ত তুলে বিপদত্রাণ প্রার্থনা করছে ভক্ষকের নিকট যেন ঈশ্বর আছে বা নাই—যাকে বানাই ব'লে আছে বা আছে বলে বানাই।

কিন্তু এই অনড় কালের পরিধিতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় কেবলমাত্র অপেক্ষার জপমালা টিপে টিপে, যখন শরীর পানীর বাঁধে বাঁধা হলেও আবার যুগপৎ ডাঙার তৃষ্ণায় কাতর। খড়কুটো ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছি সবে, তখন পূর্বমুখী এই ঘরের বায়ুকোণে দেখা গেল মেজের উপর ময়লা চাদর ঢাকা কি যেন শোয়ানো আছে, যার অবস্থান দেখে কোনকিছু আন্দাজ আপাততঃ মুশকিল হলেও মনের একটেরে তা চিহ্ন রেখে যেতে পারে এবং তা পারে ব'লেই আমি হীরুর খোঁয়ারিতে তুরপুণ-যোগে হেঁকে উঠলাম (তখন অন্ততঃ তা-ই মনে হয়েছিল) নিজের জায়গায় যথারীতি খাড়া,—ওটা কী?

ডোম-বংশধর তার ধারেকাছে গেল না বরং হাতের চোঙা এক মেজের উপর রেখে আলিস ভাঙলে সারগাদার কুকুর যেমন বিবাহভোজের মেহ্‌মানি সেরে ঘুমের পর খাড়া হয় কুঁচ্‌কানো শরীর সটান করার জন্যে আগ্‌লি-পিছ্‌লি ঠ্যাং দেহদাড়া—ব্যাপারটা প্রায় তার অনুকরণ।

—ওটা কী?

আমার জিজ্ঞাসা আবার অসমাপ্ত পথের অনুগমনে রত, তখন ডোম এমন অট্টহাসি হেসে উঠল যে একতলা দালানটা থরথরাতে লাগল যেন মশকবাহী এই আড্ডারই কম্পযোগে ম্যালেরিয়া শুরু হ'ল যার দাপট-তপ্ত স্পর্শ স্রেফ বিকার—মৃত্যুর মুখবন্ধ। আমি ভয় পাই না বটে, কিন্তু মেরুদণ্ডে এক রকমের শিহরণ অনুভব করি এই ভেবে যে, এখন বিকট-দর্শন ভীমাকৃতি নেশাসক্ত মানুষটা খুন করে বসলে দেখার কোন লোক নেই এবং আমাকে মরতে হবে এক অপঘাত মৃত্যু—যার গ্লানি আত্মহত্যার মত করুণ। কিন্তু হীরু সহসা হাসি থামিয়ে অভয় ছাড়লে না শুধু, আমাকে নিছক শূন্য ভেবে নিজের মনে বলে যেতে লাগল পাগলের স্বগতোক্তির ধারায়,—'পাঁচ মাইল ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এলাম, একটা লোকও নেই, উঃ ঘাড়-পিঠ ব্যথা করছে, তারপর এত সব কথা, দূর ছাই সব ছেড়ে দিয়ে পালাব...।'

আরো কত কী সে বলে যেত খোদাকে মালুম, আমি আবার বাধা দিয়ে বসলুম যেন সে আর মুখ খোলার একটু ফাঁক না পায়, কী আছে ওখানে?

তারপর একটানা চীৎকার দিয়ে ভয়-ঘোচানোর কায়দায় জিজ্ঞেস করলাম, যার মোদ্দা অর্থ : তুমি যতক্ষণ না জবাব দিচ্ছ আমার মুখ নড়তে থাকবে এবং এই উত্তর আমার চাই-ই।

কিন্তু শ্রীমান ডোম নিজের বন্দুকে মোতায়েনই রইল মুখ খুললে না, বরং লেগে পড়ল এবং তার প্রথম কিস্তি দেখালে চাদরখানা তুলে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে দোস্‌রা কিস্তি ভেসে উঠল যার জন্যে আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না ব'লেই চীৎকার দিয়ে উঠলাম,—না—না—ঢেকে দাও, ঢেকে দাও...

বুকে ছোরাবিদ্ধ এক তরুণীর লাশ মেজের উপর ন্যাংগা পড়ে আছে ঊর্ধ্বমুখ শয়ান, আপন ম্লান রূপের প্রদীপে জেবলে রেখেছে কৃশ-চরণ, শেষে ক্রমশঃ গঠন-মরীচিকার পশ্চাতে বেপথু জঙ্ঘা, উরু, জঠরগিরি ভূমির উপর সীনার উপত্যকা, যার মাঝখানে ছোরার বাঁট খাড়া নাক এবং কালো কেশপুঞ্জের ঘনিমার সমান্তরাল—আল্‌তার মত রক্তের দাগে রঞ্জিত। মাটীর সঙ্গে গাঁথা আমি দেখছিলাম, দেখছিলাম চোখ মেলেই দৃষ্টির অর্থবোধশক্তি ঘুচিয়ে, যেমন আগুনে ভেল্‌কি লাগায় যখন সব পোড়ে অথচ তুমি দর্শক—যেখানে তোমার শরীকদার হওয়ার কথা। চেতনা নিজের এলাকায় ফিরে এলে তাড়ির নেশা আর থই না পেয়ে আমার গলায় চাপ দিতে লাগল, যার পেষণে চীৎকার থ্যাত্‌লানো কণ্ঠশিরার ভেতর দিয়ে ফেটেফেটে বেরুতে লাগল যেন গ্রামারণ্যে দীর্ণ বাঁশের বুকে নির্গত ভয় এবং বিষণ্ণতাবাহী আওয়াজের কান্নার।

জান্‌ঘর দেখার কথা, সেই জায়গায় লাশের সম্মুখীন, আমার শরীরে তখন কাল-ঘাম ছুটছে এবং জানার কৌতূহল (পরে জেনেছিলাম, এক রমণীর দুই গুন্ডাপ্রেমিক স্রেফ সম্পত্তির লোভে দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত এই খুনে নাটকীয়তার পরিণতি অবধারিত করে তুলেছিল, আর কোন গত্যন্তর ছিল না) এমন উবে গেছে যে শুধু এখান থেকে রেহাই পেতে আমি দরজার দিকে ছুট্ মারলাম, হীরু যা জুড়ে দাঁড়িয়েছিল দুই মেজের মাঝখানে, ও বাধা না দিয়ে আমার কাছে এক প্রস্তাব দিয়ে বসলে সাহায্য পাওয়ার আশায়, তা টাকাকড়ি হলে আমি ত রাজী নয় তখনই পূরণ করে ফেলতাম : লাশটা সরিয়ে আর এক টেবিলে রাখতে হবে এইজন্যে যে, এই অবস্থায় নারীদেহ ফেলে রাখা তাদের শাস্ত্রে অশোভন এবং মুখটা ফিরিয়ে দিতে হবে যেদিকে আল্লা আছেন মৃতজনের আত্মা কোলে তুলে নিতে বা তুলে নেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়।

—আমি পারব না, পারব না। তুমি ঢাকা দাও, ঢাকা দাও। ককিয়ে উঠলাম ভয়ে এবং ডোমের ভাঁটা-ঘূর্ণি চোখের উপর চোখপড়ামাত্র দৃষ্টি সরিয়ে, যেন আবার আদেশ-ফরমান স্বরূপ মেজাজের লয় আরো বিষুবরেখার দিকে ঠেলে না নিয়ে যায়।

—শাস্ত্র মানো না?

ঠোঁট থেকে এই বুদ্বুদটুকু তুলে ডোম যেন কালীসহায় ডাকিনীর মত আমার দিকে এমন মুখভঙ্গী করে দাঁড়ালে, মনে হ'ল ওই তরুণীর বক্ষবিদ্ধ ছোরা তুলে নিয়ে এখনই আমার বুকে বসিয়ে দেবে এক লহ্‌মায় যে আমার টের পেতেও বোধ হয় বিলম্ব ঘটবে, যদিও তার প্রশ্নের জবাব আমি এখনও সরাসরি দিইনি।

মুমূর্ষু দিনের রশ্মি-মদৎ ত্রাসের মাত্রা উস্কে দিচ্ছে যখন আমিও মরীয়া আখেরী দরখাস্ত্ ছুঁড়লাম,—না...না...আমি...আমি মুদ্দফরাস হতে পারব না...আমাকে যেতে দাও ...যেতে দাও।

—মুদ্দফরাস হবে না?

দাসের উপর প্রযুজ্য এক রকমের ব্যঙ্গের শব্দ তিনটে উচ্চারণের পর হীরু ডোম তুমুল অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে আবার ক্ষেদোক্তির অনুকরণে দার্শনিক সেজে গলা বদ্‌লে বললে,—জান্‌ঘরে অন্য রাস্তা নেই...হয় তুমি মুদ্দফরাস...নয় তুমি লাশ।

কারণ-বারি সমীহার বেড়াগুলো এমন ভেঙে দিয়েছিল যে, ডোমটা এখন আমাকে আর ভদ্দরলোক ব'লে মানে না ব'লেই সমানে সমানে আলাপ জুড়লে পিলে-তড়পানো অট্টহাস্যের বহর অব্যাহত রেখে।

—না...না...আমি মুদ্দফরাস হতে পারব না। আমার জবাব চীৎকার এবং ভয়ার্ত মিনতির সমাহার, যখন ডোমও হুঙ্কার ছাড়ে শাস্ত্র ও আইনের দোহাই তেহাই-রূপে মেরে।

—আমি আর কিছু, যে-কিছু হতে রাজী...রাজী...।

—এই জানঘরে হয় তুমি লাশ, নয়ত মুদ্দফরাস, অন্য রাস্তা বন্ধ।

—ও আমি হতে পারব না...না।

—তবে তুমি লাশ হও। ডোমটা এবার ধুড়িলাফ মেরে বাহুর পেশী ফুলিয়ে যেভাবে দাঁড়াল, তখন আমি কয়েক মুহূর্ত হতবাক থেকে পুনরায় চীৎকারে ফেটে পড়লাম,—আমাকে আর কিছু বানাও...আমি প্রস্তুত।

—জান্‌ঘরে তুমি পোকা মাকড় হতে পারো, দেওয়ালের গায়ে তাকালেই যাদের দেখতে পাবে।

—না। তা কী সম্ভব?

—তুমি হোতে পারো তেলেপোকা কি টিক্‌টিকি।

ডোমের মাথার রগ্‌ ক্রমশঃ যেন ফুলেফুলে উঠছে গোটা কপাল জুড়ে আর দুই চোখ দোজখের ল্যাটিম-রূপে যেভাবে ধক্‌ধক করে ঠিক্‌রে পড়ছিল অক্ষিকোটরের ভেতর থেকে, আমি প্রমাদ আর গণতে পারছিলাম না, যেহেতু শক্তি উধাও...প্রাক-থাপ্‌পড়-লাগা গালের মত শির্‌শিরানি অনুভব করতে লাগলাম।

আবার গর্জে উঠল নেশাজড়িমাসক্ত কণ্ঠ,—তুই কী হোতে চাস্‌?

আর অনুনয় নয়, প্রাণরক্ষী আর্ত চীৎকারে আমি শ্বাসরোধী জান্‌ঘরের মেজের উপর পৃথিবীর শেষ অবশিষ্ট মানুষের মত উচ্চারণ করলাম : আমি মানুষ হতে চাই, আর কিছু না। আমি চাই পাখির গান যা এখানে নেই। আমি চাই ফুলের বাগান যা এখানে নেই। চাই মাথাগোঁজা নীড়, বসুন্ধরার সর্বসাধ আতিথ্য, পাকা ধানের সৌরভ। চাই সুহৃদ—যাদের কথা কবিতা, আলাপ-উত্তাপ বসন্ত-নিঃশ্বাস। আর আমি চাই নারী—স্বাস্থ্যনীড়, তাতা-প্রেমী নারী...শ্রোণি-স্তনভারে প্রপীড়িতা—যাকে নতজানু আমি বলতে পারি,—ভদ্রে, গগনে পাপ শশধর তোমার অভিসারের অন্তরায়, তোমার স্তনভার তোমার পদক্ষেপের বিরোধ-কণ্টক, এসো...এসো ওই বক্ষবোঝা আমার করাঞ্জলিতে ন্যস্ত করে পালক-লঘু তুমি নিঃশঙ্ক হও চরণ-চালনায়...বিশ্বাস রাখো, আশ্বস্ত হও, আমি কোনদিন অঞ্জলি ভঙ্গ করব না, যেহেতু সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু আমার পূজ্য নেই এই পৃথিবীতে...।

আমার নিজের খেয়াল ছিল না, কীভাবে আমি পরিচিত নির্জন পথে দৌড়াচ্ছিলাম, আর পেছনে কোন অনুসরক ধাওয়া-কারী না থাকা সত্ত্বেও বারবার কেবল মনে হচ্ছিল, জান্‌-ঘরের হাঁ-মুখ দরজা দ্রুত ছুটে আসছে আজ্‌দাহা-সাপের মত লালাসিক্ত লেলিহান জিহ্বায় আট্‌কে আমাকে গ্রাস করার জন্যে, আমাকে গ্রাস করার জন্যে।

প্রতিকৃতি

সত্যেন্দ্র আচার্য

অবাক আর আশ্চর্য দুই-ই হয়েছি প্রথমে। সুচারু না? সুচারু প্রথমে কেমন তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। ঠিক যেন চিনতে পারছে না এমন ভাব আনল কপালের ওপর।

বিস্ময় আমারও কম ছিল না। এই অপরিচিত জায়গায় এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাবে—আমিও তা ভাবিনি আগে। তবু ঘনিষ্ঠ গলায় কিছু বলার আগেই হঠাৎ কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল সুচারু। তেমনি দরাজ গলায় হেসে নিয়ে সুচারু বলল,—ওহো, চিনেছি, চিনেছি, তুমি তো সেনগুপ্ত, তাই না?

অথচ আগে যখন ছিলাম কলকাতায়, এই হিংসুটে হীন প্রবৃত্তির লোকটির সঙ্গে বনিবনাও ছিল না কারো। অফিসশুদ্ধ লোকের সঙ্গে যে কোন একটা খুঁটিনাটিতে একটা অপ্রীতিকর আগুন জ্বালিয়ে তবে চুপ। সেই সুচারু।

এই অপরিচিত জায়গা এবং নতুন অফিস, ফলে অপ্রত্যাশিত এই আবিষ্কারের গৌরবকে আমি অনেক সম্মান দিয়েছি।—তুমি কিন্তু ঠিক তেমনি আছ। বদলাও নি।

আর সেই থেকে রোজ একসঙ্গে ফিরেছি। সঙ্গে করে ঘরে এনেছি। অথচ কলকাতায় এই লোকটাকেই ঘৃণা করেছে সবাই। লোকটি একদিন শিশুর মত আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল,—আচ্ছা, কী আমার অপরাধ বলো তো? মিস রায় ঠকুক আমি চাই না।

—কিন্তু তোমার কী তাতে? আমি বলেছি। মিস রায় তো আর নাবালিকা নন।

ঠিক। অথচ অফিসে সে কি হৈ চৈ। লজ্জায় ক'দিন অফিসে পর্যন্ত আসেনি মিস রায়। শেষপর্যন্ত একদিন স্বীকার করেছিল, ঠিক তো আমার কি তাতে?

তবু এনেছি লোকটাকে। গল্প করেছি। বলেছি, পুরনোদিন পুরনোই থাক। বিশেষ করে এটা যখন প্রবাস।

অথচ আমার কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা কেমন কুঁকড়ে যেত। যেন খানিক বিব্রত হত। বেড়ালের মত গোল গোল চোখদুটোয় কেমন অদ্ভুত তাকাতো চারিদিক। কী যেন খুঁজত। প্রথম দিন ঘরে এসেই বলেছিল,—তুমি একলা নাকি গুপ্ত?

—না।

—বিয়ে করেছ, না?

—হ্যাঁ। কবেই।

—বোধহয় আমি চলে এলে।

—হ্যাঁ। ডেকেছি সুরমাকে। হাসতে হাসতে বলেছি,—দেখ তো চিনতে পার কিনা? একটু নড়েচড়ে কেমন গুটিয়েসুটিয়ে বসেছে লোকটা। হিংসুটে চোখদুটো লকলক করে উঠেছে। চা নিয়ে সুরমা সামনে এসে দাঁড়ালে গোলগোল চোখদুটো কেমন আধবোজা হয়েছে লোকটার।

বেশ কিছুক্ষণ চোখ খোলে না সুচারু। বেশ কিছুক্ষণ তাকাত না আমার চোখে। তারপর এক সময় তাকিয়ে সুরমাকে দেখতো। আঁটোসাটো শরীরের ওপর শাড়ীটা কেমন

জড়িয়ে আছে দেখত। তারপর ঘরের ভেতর একটা গোটা নিঃশ্বাস ভেঙেচুরে চুরমার করে চুপি চুপি ছড়িয়ে দিয়ে বলত,—তুমি খুব সুখী, না গুপ্ত?

—কেন?

—নয়?

আরো কাছে সরে এসে আমার একটা হাত মুঠোয় ভরে নিয়েছে তক্ষুনি। আমার কিন্তু কেউ নেই গুপ্ত। শুধু আমি আর সুইট পার্টনার বেঁচে আছি।

অবাক হয়েছি আমি। পার্টনার? প্রেমট্রেম করছ নাকি সুচারু?

তখুনি সুচারু মজুমদারের শক্ত মুঠো আলগা হয়েছে। বড় শান্ত গলায় বলেছে, —প্রেম? না গুপ্ত আমার জীবনে ওসব কোনদিন আসবে না। একটু ম্লান হেসে বলেছে, —পার্টনার আমার দুঃখ।

কেন জানি, প্রেমের প্রতি, মেয়েদের প্রতি ভীষণ বিরূপ ছিল সুচারু। অফিসে নাকি মিস রায়ের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল বিজন সামন্ত। বিজনকে পাহারা দিয়ে পেছন পেছন ঘুরত সুচারু। বিজনের সঙ্গে মিস রায়ের সম্পর্ক যখন বেশ ঘনিষ্ঠ তখন একদিন হঠাৎই হাজির হয়েছিল মিস রায়ের বাড়ী। সবকথা ফাঁস করে দিয়েছিল তার বাবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ গল্প করতে করতে। মিস রায় নিভৃতে একদিন চোখের জল ফেলে বলেছিল, কেন অমন করলেন সুচারুবাবু?

কেন? একটা নাটুকে হাসিতে ফেটে পড়েছিল সুচারু। কেন আবার? বাঁচার জন্য। একটা আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হেসে বলেছিল, তোমাদের বাঁচিয়েছি আমি।

অতএব যেখানেই প্রেম, গন্ধ পেলেই সুচারুর চোখ সেখানে ঘুর ঘুর করবে। আমাদের বোঝাত, প্রেমের জন্য তোরা কত কাঙাল বল্ তো?

আমি তাকালে সুচারু বলত, লালসা তোদের পাগল করে।

একদিন ক্লাব ঘরে ভীষণ হট্টগোল। ব্যাপার কী? ব্যাপারের মূলে এই সুচারু। দেবকুমার কী নাকি একটা চিঠি পড়ছিল। সুচারু ছোঁ মেরে পেছন থেকে কেড়ে নিয়েছিল চিঠিটা প্রেমপত্র মনে করে! ধস্তাধস্তি। ছেঁড়াছেঁড়ি। বেদম মার খেয়েছিল সুচারু।

তবুও সুচারুকে আমি বাড়িতে আনি। গল্প করি। গল্পের ভেতর এক সময় সুচারু বলে, মেয়েদের আমি বিশ্বাস করি না গুপ্ত। ওপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে সুচারু। চওড়া কপালের ওপর কাঠকয়লার আঁচড়ের মত কালচে রঙের তিনটে শিরা প্রকট হয় তক্ষুনি। আরো কাছে সরে আসে সুচারু। হাঁ করে অবাক চোখে আমার চোখে তাকিয়ে থেকে বলে, কী নিয়ে বাঁচি বলো তো গুপ্ত?

ও ঘরে সুরমার অস্তিত্ব বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে অনুভব করে সুচারু। ও ঘরে হয়ত শব্দ ওঠে তক্ষুনি। অকারণ কাজের টুকরো শব্দ, কিম্বা গানের ভাঙা কলি পর্দায় ধাক্কা খেয়ে এ ঘরে ছিটকে এলে সুচারুর আলগা মুঠো শক্ত হয়ে ওঠে। আমার আঙুল কটা নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে বেজায় চাপ দেয় সুচারু।—আঃ লাগে না? প্রায় চীৎকার করে উঠি আমি।

একটা সভয় সংকোচে হাতটা সরিয়ে নিয়ে আমার মুখের দিকে আড়চোখে তাকায় সুচারু। তোমার স্ত্রী বড় ভাল গায় তো?

তবু ভয় করত কেমন। লোকটির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা আসত তখন। এক এক দিন ভেবেছি, কী জানি এমনি করে খেলতে গিয়ে যদি পা ফস্কে যায় সুরমার? এমনি জল ছিটোতে

ছিটোতে পা পিছলে যদি অকূল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে সুরমা?

—গুপ্ত—

—অ্যাঁ!

—কী ভাবছো গুপ্ত?

—তবু ভাবতুম, ছিঃ, এসব কী ভাবছি। সুরমার চোখ তো আর নকল নয় যে আসলের রং আর মেকীর জৌলুষে গুলিয়ে ফেলবে?

সুচারু আরো কাছে সরে আসে।—কী অত ভাবছো গুপ্ত?

—অ্যাঁ!

পর্দার গায়ে লোলুপ তাকিয়ে সুচারু বলে,—কী নিয়ে বাঁচি বলো তো গুপ্ত?

কত স্মৃতি, কত ঘটনা এই প্রবৃত্তির লোকটাকে ঘিরে তখন মনে পড়ে যায়। একদিন অফিসে এল সুচারু বায়নাকুলার আর ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে। সকলে আমরা অবাক হলাম, হাসলাম কেউ কেউ। কিন্তু সুচারু হাসল না। গম্ভীরমুখে সারাদিন ঘাড়গুঁজে কী সব কাজ করল। তারপর শনিবার সকলের মত সুচারুও বেরিয়ে এল। এসে হাজির একেবারে গড়ের মাঠে। বড় ঘনিষ্ঠ বসেছিল অরুণ আর লালি মুখার্জী। অরুণ আমাদের অফিসে আর লালি মুখার্জী ভবানীপুরের দিকে কোন একটা স্কুলে কাজ করত। সুচারু ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, প্লীজ, অরুণবাবু, আপনার প্রেমিকাকে একটু হাসতে বলুন। জাস্ট এ সেকেন্ড, প্লীজ।

ছবি তুলেছিল সুচারু। মেয়েটি প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। সুচারু মেয়েটির অসহায় চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, একজোড়া হাস্যমধুর মুখ ধরে রাখলাম। ঈশ্বরের কত কৃপা থাকলে যে এমন ছবি ওঠে? তারপর একদিন লালি মুখার্জীর স্কুলে গিয়ে হেডমিস্ট্রেস্‌কে ছবির একটা কপি প্রেজেন্ট করে এসেছিল।

একদিন শনিবার প্রশ্ন করেছিলাম,—গতকাল এলে না যে সুচারু?

—একটা স্কুলে গিয়েছিলাম। অরুণকে বাঁচানোর ফিকির খুঁজছি। সুচারু কপাল কুঁচকে বলেছিল,—তাই।

—বায়নাকুলার চোখে লাগিয়ে?

সুচারু একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল,—খালি চোখে আর কতটুকু দেখা যায় পৃথিবীর। বড় রহস্যময় পৃথিবীটা। সুচারু বায়নাকুলারে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিল,—বুঝলে? তারপর বায়নাকুলারটা চোখে লাগিয়ে বলেছিল,—এ জিনিসটার মজা কি জানো গুপ্ত?

আমি তাকালে সুচারু বলেছিল,—এ বস্তুটায় ছোটকে বড় দেখায়, অনেক দূরের জিনিসকে কাছে টেনে আনে।

আমার মুখোমুখি টেবিলের ওপরে আমার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকেছিল সুচারু। তারপর বলেছিল,—আচ্ছা, মেয়েদের জন্য তোমরা অত পাগল কেন বলো তো গুপ্ত?

—জানি না।

—আমি জানি।

—কী জান?

—লালসা তোদের পাগল করে। ছেলে বল আর মেয়েই বল সব সমান।

এমনি ভাবতে গেলে সুচারুর আরো অনেক চরিত্রচিত্র চোখে পড়ে যায়। অফিসের স্যোসালে ধরাধরি করে একটা রোল নিয়েছিল নাটকে। রীহার্সালে কোন গণ্ডগোল করেনি, নিয়মিত এসেছে। কিন্তু অভিনয়ের দিন ডুব—সহনায়িকার সঙ্গে প্রেমের দৃশ্য নাকি অসহ্য লাগে দর্শকের সামনে। সেই থেকে আর ক্লাব ঘরে অফিসের পর ঢুকতে দেওয়া হত না সুচারুকে।

তবু ভাবতুম, ছিঃ, এসব কী ভাবছি?

—কী অত ভাবছো গুপ্ত?

ভাবতুম, বারুদের ব্যবহার যারা জানে, অন্ধকার আকাশে তারা ফুল ফোটায়। যারা জানে না, মরে তারা হাত পুড়িয়ে।

পর্দার ওপারে তবু লোলুপ তাকায় সুচারু। আর ও ঘরে শব্দ ওঠে তক্ষুনি। সুচারু কাঠ। গানের কলি ছিটকে আসে এঘরে। সুচারু পাথর। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে নড়েচড়ে বলে,—কী যেন বলছিলাম গুপ্ত?

সেই থেকে দেখতাম সুরমাও কেমন ঘৃণা করছে লোকটাকে। এরপর ডাকলেও সুচারু আসত না। কেমন এড়িয়ে চলত আমাদের।

কিন্তু একদিন হঠাৎ অবাক হলাম আমি। আমার জন্য সুরমা একটা প্যান্টের কাপড় কিনে এনেছে। বলেছি,—এ কি, এমন রং তো আমি কোনদিন পরি না। আমার পছন্দ তো তুমি জানো।

—তাতে কি। পরলেই বা।

কিছুদিন পরে কিনে আনলো একটা জামার কাপড়। বিস্ময়ে বললাম,—এ কি সুরমা, এমন জামা তো সুচারু পরে। ওকেই মানায়।

সুরমা শুধু হাসল। কোন কথা বলল না। কিছুদিন পরে কিনে আনল একটা গগল্‌স্‌। যেটা সুচারুর চোখে দেখেছি কয়েকবার। সেই থেকে সুরমা কাছে এলে কেমন ভয় হত আমার। সুচারু আসে না বলে সুচারুর নকল আবির্ভাবকে কি আমাকেই সুরমার চোখের ওপর বয়ে বয়ে বেড়াতে হবে?

রীতি বিষয়ক আলোচনা

(যুক্তিকে সুপরিচালিত করার জন্য এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সত্যকে অনুসন্ধানের তাগিদে)

রণে দেকার্ত

এবং সবশেষে, বাসস্থানটিকে ঢেলে নতুন করে নির্মাণের কাজ সুরু করার আগেই সেটিকে ভূমিসাৎ করলে চলবে না, বা তখুনি-তখুনি মালমশলা ও স্থপতির সন্ধানে বেরোনো অথবা সযত্নে নক্সাটি তৈরী করে স্থপতির কাজে নিজেই হাত লাগানো যথেষ্ট হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সমানই দরকার বিকল্প কোনো বাসস্থানের, যেখানে আগের গৃহটিতে কাজ চালানোর সময় স্বচ্ছন্দে বাস করা চলতে পারে। তাই যুক্তি আমায় আমার বিচারে যখন সন্দিগ্ধ হতেই বাধ্য করতে চায়, তখন আমার কর্মে যাতে অস্থিরচিত্ত না হই এবং সেই সময় হতে যাতে যথাসম্ভব আনন্দেও বাঁচতে পারি, আমি নিজের জন্য তৈরী করে নিলাম একটি সাময়িক[1] নীতি যার সূত্র থাকবে সবসুদ্ধ তিনটি কি চারটি এবং যার সম্বন্ধে আপনাদের এখানে জানাতে চাই।

প্রথম সূত্রটি হল, আমার স্বদেশের আচার-আচরণ ও বিধিগুলি মেনে নেওয়া—শৈশব হতে যে-ধর্মে দীক্ষা দিয়ে ঈশ্বর আমায় করুণা করেছেন, সেটি সর্বক্ষণ মনে রাখা। এবং সব ব্যাপারে নিজেকে চালিত করা একমাত্র তেমন মতামত অনুসরণ করেই, যা সকল মাত্রাধিক্যকে যতটা পারে দূরে রেখে যথাসম্ভব মধ্যম পন্থাটি বেছে নেয়—অর্থাৎ সেই মতামতই, যা যাদের সঙ্গে আমায় বাস করতে হবে, তাদের মধ্যে সেরা বুদ্ধিমানেরা কার্যত সচরাচর গ্রহণ করে থাকে। যেহেতু নিজের সকল মতামতকে আমি বিচারের আওতায় আনতে চেয়েছি ও সে-কারণে এখন হতে তাদের উপর আর নির্ভরশীল নই, তাই সেরা বুদ্ধিমানদের মতামত মেনে নেওয়া-টাই যে আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ কাজ হবে, এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছি। এবং যদিও বুদ্ধিমান যেমন আমাদের মধ্যে মেলে, তেমনি হয়তো মিলবে চীনা বা পারসীকদের মধ্যেও, তবু যাদের সঙ্গে আমায় জীবনটা কাটাতে হবে, আমার পক্ষে সেই বুদ্ধিমানদের পথে চলাই আরো হিতকর মনে হল। এবং তাদের যথার্থ মতামতগুলি ঠিক কী, তা বোঝার জন্য তারা যা বলছে, তার চেয়ে বরং তারা কী করছে, সেইদিকেই আমায় নজর রাখতে হবে—যেহেতু দেশাচারের বিকার-প্রাপ্তির ফলে যেটা বলছে সেইটেই যে সত্য বলে বিশ্বাস করে, এমন লোকের সংখ্যা কম। শুধু তাই নয়, যেটা বলছে সেটায় বহু লোক নিজেরাই কোনো গুরুত্ব আরোপ করে না। কারণ যে-চিন্তার ফলে মানুষ কোনো জিনিসে বিশ্বাস করতে উদ্যত হয়, এবং যে-চিন্তা তাকে সচেতন করে তোলে যে সেই জিনিসটায় সে সত্যিই বিশ্বাস করছে, এ-দুটির ক্রিয়া-পদ্ধতি একরকম নয়—এরা প্রায়ই হয় একটি, নয় অন্যটি। এবং যখন অনেক রকমের মতামত একসঙ্গে এসে হাজির হচ্ছে, আমি তাদের মধ্য থেকে বেছে নেব শুধু সেইগুলিই যেগুলি মধ্যম-পন্থী, যেহেতু ব্যবহারের পক্ষে একদিকে যেমন সেগুলির উপযোগিতা সর্বদা সব চেয়ে বেশি—এবং সে-কারণে আপাতদৃষ্টিতে[2] তারা শ্রেষ্ঠও, সকল মাত্রাধিক্য সচরাচর অহিতকরই হয়—অন্য-দিকে তেমনি আমায় সত্য পথ হতে যথাসম্ভব কম সরে আসতে একমাত্র তারাই সাহায্য করবে। কারণ চরমপন্থী যদি হই হয়তো আবিষ্কার করতে হবে যে যে-পথটি বেছে নিয়েছি, সেটির বিপরীতটিই গ্রহণ করা উচিত ছিল। এবং যা-কিছু প্রতিশ্রুতি, যার ফলে নিজের স্বাধীনতা খণ্ডিত হতে পারে, তার সবগুলিকে আমি সেই মাত্রাধিক্যের মধ্যে বিশেষভাবে গণ্য করলাম। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে আমি অসমর্থন করছি সেইসব বিধি যা দুর্বলচিত্তের চপলতা

নিবারণে অভিলাষী হয়ে কোনো মানত বা চুক্তি রক্ষা করতে মানুষকে বাধ্য করে—বিশেষত সেই ধরনের চুক্তি যার পিছনে থাকে কোনো শুভ পরিকল্পনা, অথবা এমন চুক্তিও যা নেওয়া হয় নিছকই কোনো ব্যবসায়িক লেনদেনের নিরাপত্তার খাতিরে এবং যাতে তাই শুভাশুভের প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু যেহেতু সারা বিশ্বে আমি এমন কিছুই দেখিনি যা নাকি চিরকাল দাঁড়িয়ে আছে ঠিক একই জায়গায় এবং যেহেতু নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে যা চেয়েছি, তা আমার বিচারশক্তিকে আরো খারাপের দিকে একেবারেই না নিয়ে গিয়ে বরং তার উত্তরোত্তর পূর্ণতা-সাধনই, আমার তাই মনে হল কোনো জিনিসকে এককালে সমর্থন করতাম বলেই যদি পরেও তাকে ঠিক বলে আমায় সমর্থন করে চলতে হয়—যখন আসলে সে আর হয়তো ঠিক নেই বা অন্তত আমার চোখে ঠিক বলে আর প্রতিভাত হচ্ছে না—তবে নিজের সুবুদ্ধির প্রতি আমি মহান অবিচারই করব।

আমার দ্বিতীয় সূত্রটি হল, যতটা পারি, আমার কাজে দৃঢ় ও স্থিরসংকল্প থাকব এবং একবার যখন সে-সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন অনিশ্চিততম মতামত হলেও তাকে সমানই অবিচলিতভাবে অনুসরণ করে চলব, যেমন করতাম অতি নিশ্চিত কোনো মতামতের ক্ষেত্রে। ঠিক যেমন অরণ্যে পথভ্রষ্ট পথিকদের উচিত নয় কখনো এদিক কখনো ওদিক করে ভ্রান্তির মধ্যে পাক খাওয়া; কোনো একটা জায়গায় একেবারে থেমে যাওয়া তো তাদের পক্ষে আরো অনুচিত হবে। উল্টে যেটা করা উচিত তাদের, তা কোনো একটা দিক বেছে নিয়ে সামনে সোজাসুজি এগোতে থাকা এবং যে-কোনো সন্দেহের বশেই হোক কিছুতেই আর দিক পরিবর্তন না করা—এমনও যদি হয় যে গোড়ায় সেই দিকটি তারা বেছে নেয় হয়তো তেমন কিছু না ভেবেই, তবু এগিয়ে চলতে হবে। কারণ এই উপায়ে তাদের ঈপ্সিত গন্তব্য-স্থানে যদিও তারা না পেঁছোয়, অন্তত এমন কোনো একটা জায়গায় তো এসে হাজির হবেই যেটা অরণ্যের মধ্যে পড়ে থাকার চেয়ে তাদের কাছে খুব সম্ভব আরো নিরাপদ ঠেকবে। এবং যেহেতু জীবনের কর্মে দেরী সয় না, তাই এ-সত্য সুনিশ্চিত যে যখন ঠিক মতামতটি বেছে নেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত ঠেকে, তখন অন্তত এমন মতামত অনুসরণ করা দরকার যেটাকে সবচেয়ে সম্ভব বলে মনে হচ্ছে; এবং যদিও মানব সম্ভাব্যতায় এরূপ যে একটি মতামত ও অন্য আরেকটির মধ্যে ইতরবিশেষ কিছু নেই, তবু কোনো একটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে—পরে ব্যবহারে তার উপযোগিতার সাক্ষ্য পেলে সেটি নিয়ে আর সন্দেহ তুলব না, বরং তাকে মেনে নেব অতি সত্য ও অতি নিশ্চিত বলে, কারণ যে-যুক্তির বশবর্তী হয়ে প্রথমে সেটিকে গ্রহণ করি, সেই একই যুক্তি তাকে তখন চেনাবে সেইভাবে। এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে সঙ্গে-সঙ্গে সেইরকম সকল ক্ষোভ ও অনুশোচনার হাত থেকে আমি অব্যাহতি পেয়েছি যা সাধারণত সন্দেহাকুল দুর্বলচিত্তদের বিবেককে পীড়া দিয়ে থাকে—ঐ চপলমতিরা ভালো বলে ক্রমাগত এমন সব জিনিস গ্রহণ করে চলে যা পরে নিজেদেরই বিচারে তারা খারাপ বলে আবিষ্কার করবে।

আমার তৃতীয় সূত্রটি হল, পারি তো সর্বদা চেষ্টা করব নিজেকে জয় করতে, ভাগ্যকে নয়—পারি তো আমার বাসনাগুলিকেই বদলাবো, পৃথিবীর নিয়মকে নয়। এবং সাধারণভাবে এটাই মানতে নিজেকে অভ্যস্ত করব যে একমাত্র আমাদের নিজেদের চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই নেই যার উপর আমাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকতে পারে—যাতে আমাদের আওতার বাইরের কোনো জিনিস নিয়ে যখন প্রাণপণ চেষ্টা করেছি ও তবু সফল হইনি, তখন জানতে পারি সে-জিনিসটিতে সাফল্য অর্জন করা আমাদের পক্ষে একেবারেই সাধ্যাতীত। এবং যাতে

ভবিষ্যতে এমন কিছুই চাইতে না যাই যা আমার পাওয়ার নয় এবং নিজেকে নিয়ে তাই সন্তুষ্ট থাকতে পারি, তার জন্য একমাত্র এই সিদ্ধান্তটিই যথেষ্ট মনে হচ্ছে। কারণ আমাদের ইচ্ছা-শক্তি যেহেতু স্বভাবত একমাত্র তেমন কিছুই যাচ্ঞা করতে যায় যা আমাদের বুদ্ধিতে কোনো-রকমে সম্ভাব্য বা সাধ্য বলে ঠেকে, এটা তাই নিশ্চিত যে যা-কিছু সুখ-সম্পদ আমাদের আয়ত্তে নেই, তাকে যদি আমাদের ক্ষমতারও সমান বাইরে বলে মনে করতে পারি তো সেটায় আমাদের জন্মগত অধিকার ছিল অথচ সেটা পেলাম না, এই বলে আমরা ক্ষোভ করতে বসব না, বিশেষত যখন সেটা যে আমরা পাইনি, তা আমাদের কোনো দোষের দরুন নয়—ঠিক যেমন আমরা ক্ষোভ করতে যাই না চীন বা মেক্সিকোর অধীশ্বর না হতে পেরে। এবং লোকে যেমন বলে, তেমন যদি প্রয়োজনীয়তাটাকেই ধর্ম করতে পারি, তাহলে অসুস্থ অবস্থায় নীরোগ হওয়ার বা বন্দী অবস্থায় মুক্ত হওয়ার অযথা আকাঙ্ক্ষায় আমরা তেমনই ভুগব না যেমন ভুগি না হীরকের মতো কোনো অবিনশ্বর পদার্থের দ্বারা নিজেদের শরীর গড়ে তুলতে চেয়ে বা পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার মতো ডানা পাওয়ার বাসনায়। তবে এটা অবশ্য মানি যে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যাবতীয় জিনিসকে দেখতে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য দরকার এক সুদীর্ঘ অনুশীলনের এবং প্রায়ই পুনরাবৃত্ত এক গাঢ় চিন্তার। আমার তো মনে হয়, মুখ্যত এমন একটা পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত ছিল সেই সব দার্শনিকদেরও[৩] রহস্য যাঁরা এককালে পেরেছিলেন নিয়তির গ্রাস এড়াতে এবং তাঁদের নানা দুঃকষ্ট ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও সুখের ব্যাপারে পাল্লা দিতে পেরেছিলেন তাঁদেরই আরাধ্য দেবদেবীর সঙ্গে। কারণ প্রকৃতি তাঁদের যে-সীমার মধ্যে বিধৃত করেছে তার কথা সর্বক্ষণ স্মরণে রেখেছিলেন বলেই নিজেদের তাঁরা এত সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে পেরেছিলেন যে একমাত্র তাঁদের চিন্তা ব্যতীত অন্য কিছুর উপরই তাঁদের ক্ষমতা নেই, এবং এই উপ-লব্ধিটিই তাঁদের পথে যথেষ্ট ছিল অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি তুচ্ছতম মোহও না রাখতে। তাঁদের চিন্তাগুলির বিন্যাসে তাঁদের প্রভুত্ব ছিল এমন একচ্ছত্র যে সে-কারণে তাঁরা নিজেদের মনে করতে পেরেছিলেন যথার্থই আরো ধনী, আরো শক্তিশালী, আরো মুক্ত এবং আরো সুখী অন্যান্য সেই যে-কোনো লোক থেকে যারা এই দর্শনের অধিকারী নয় বলেই প্রকৃতি বা নিয়তির হাজার প্রসন্নতা সত্ত্বেও যেটা চায়, তার এমন আধিপত্যের *অধিকারী কিছুতে হতে পারে না।*

অবশেষে, এ-জীবনে মানুষের যত বৃত্তি থাকে, *তার একটি সামগ্রিক পর্যালোচনের* সিদ্ধান্ত আমায় নিতে হবে, যাতে আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ বৃত্তিটি বেছে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। এটিই শেষ ধাপ আমার ঐ নীতিটির। শুধু তাই নয়, অন্যদের বৃত্তি সম্বন্ধে মন্তব্য যদি না-ও করি, নিজের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে-বৃত্তিটা আমার আপনার বলে দেখতে পাচ্ছি, একমাত্র সেটাতে লেগে থাকাই আমার পক্ষে সবচেয়ে উচিত কাজ হবে—অর্থাৎ যে-রীতিতে নিজেকে চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটি ধরে সত্যের অনুসন্ধানে যতটা পারি আমায় এগোতেই হবে, সারাজীবন নিজের যুক্তি-শক্তির অনুশীলন করে চলতেই হবে। যেদিন থেকে রীতিটির সহায়তা নিয়েছি, যে-আনন্দ পেয়েছি, মিষ্টত্বে ও সারল্যে তার তুলনা ইহজীবনে আছে বলে মনে হয় না। এবং তার মাধ্যমে প্রতিদিনই আবিষ্কার করেছি এমন কোনো-না-কোনো সত্য যা সাধারণ্যে উপেক্ষিত হলেও অন্তত আমার কাছে তো মনে হয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ—আর সেই আবিষ্কারে যে-তৃপ্তি, তাতে আমার হৃদয় এমন কানায়-কানায় ভরে উঠেছে যে অন্য কিছুই আর আমায় একটুকু স্পর্শ করে না। তাছাড়া, নিজেকে শিক্ষাদান করে চলার যে-পরিকল্পনা আমি নিয়েছি, একমাত্র তারই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব-বর্ণিত তিনটি সূত্র—কারণ ঈশ্বর যেহেতু আমাদের প্রত্যেককেই সত্যকে মিথ্যা হতে পৃথক করার

কিছু-না-কিছু দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, তাই অন্যের মতামত গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকব, এমন প্রয়োজনীয়তার চিন্তাকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও আমল দিতাম না যদি যথাসময়ে আমার নিজের যুক্তিকেই কাজে লাগানোর কথা আমি না ভাবতাম। আবার অন্যের সেই মতামত অনুসরণের সময় নিজেকে বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত রাখতেও পারতাম না যদি না এই আশা থাকত যে পরে যখন আরো ভালো মতামত খুঁজে পাওয়ার অবকাশ আসবে—যদি তা আসেই —তখন সে-অবকাশটি আমি কিছুতে হারাব না। এবং সবশেষে, জানতে পারতাম না কী করে আমার বাসনাগুলিকে সীমিত করা যায় বা সুখী হওয়া যায়, যদি না এমন একটি পথ অনুসরণ করতাম যার মাধ্যমে আমার সাধ্যমতো যে-কোনো জ্ঞানকেই অর্জন করতে পারার নিশ্চিতি মনে-মনে পেতাম—শুধু তাই নয়, যা-কিছু সত্য সম্পদ[8] আমার পক্ষে একদিন আহরণ করা সম্ভব হতে পারে, সেই একই পথের অনুসরণে তারও অর্জন সম্ভব, মনে-মনে এ-নিশ্চিতিও পাই। অতএব যেহেতু কোনো বিশেষ জিনিস আমাদের বুদ্ধির কাছে ভালো বা মন্দ বলে ঠেকছে কি না ঠেকছে, সেই অনুযায়ীই আমাদের ইচ্ছাশক্তি তার পিছনে ছুটতে অথবা তার থেকে পালাতে যায়, সেহেতু ভালো কাজ করতে গেলে ভালো বিচারশক্তির দরকার। এবং যত ভালো কোনো মানুষ বিচার করতে সক্ষম হবে, সেই অনুপাতে কাজও করবে সে ততখানি ভালো—অর্থাৎ একদিকে যেমন গুণ[৫], অন্যদিকে তেমনি সম্পদ, এ-দুটির যত অর্জন মানুষের পক্ষে সম্ভব, তার সবই সে করতে পারবে। এবং এমন নিশ্চিতি মানুষ পায় যখন, তখন তৃপ্তি তার হাতছাড়া আর হবে না।

উল্লিখিত সূত্রগুলি সম্বন্ধে এইভাবে নিজেকে নিশ্চিত যখন করেছি, তখন তাদের একধারে পৃথক করে রাখলাম বিশ্বাস-জনিত সেই সত্যগুলির সঙ্গে যেগুলি সর্বদাই আমার প্রত্যয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছে। এটা করার পর বিবেচনা করলাম, আমার মতামতের আর যা-কিছু বাকী রইল, এবার তাদের ভাঙাচোরার কাজে আমি স্বচ্ছন্দে মাততে পারি। এবং আগুনে তপ্ত সেই ছোট্ট যে-ঘরটিতে আমার মধ্যে এত চিন্তার প্রথম উদয় হয়, তার মধ্যে নিজেকে অনর্থক অধিককাল আটক না রেখে বরং লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই ব্যাপারটির অন্তঃস্থলে আরো ভালো করে প্রবেশ করা যাবে বলে যেহেতু আশা ছিল, আমি তাই শীত শেষ হতে না হতেই আবার ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। এবং পরবর্তী নয় বৎসর ধরে সারাক্ষণ শুধু পৃথিবীর এখান থেকে ওখানে চষে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু করিনি—জীবনের যত নাটক সেখানে অভিনীত হতে দেখেছি, তাতে নিজে নট না হয়ে বরং দর্শকই হতে চেয়েছি। এবং প্রতিটি ব্যাপারে কড়া নজর রাখতে হয়েছে, পাছে কোন্ জিনিসটি মনে সন্দেহ জাগাতে পারে ও তাকে দেখতে না পাই এবং তাই ভুল করে বসি—আমার চিত্তের মধ্যে তাই যত ভুল আগে ঢুকে পড়ে থাকতে পারে, আমি তাদের প্রতিটিকে নির্মূল করলাম। এ নয় যে এটা করার জন্য আমি অনুকরণ করতে গেলাম সন্দেহবাদীদের, যারা সন্দেহ করে সন্দেহ করার জন্যই এবং সব সময় ভান করে যেন কোনো ব্যাপারেই তারা মতিস্থির করতে পারছে না —কারণ আমার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমি চেয়েছি শুধু নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করতে এবং চোরাবালি বর্জন করতে, যাতে খুঁজে পেতে পারি শিলা অথবা মৃত্তিকা। মনে তো হয় আমার ধাতে এটা চমৎকার সয়েছে, কারণ যখনই কোনো আলোচ্য প্রস্তাবের অসত্যতা বা অনিশ্চয়তা আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়েছি—ক্ষীণ অনুমানের ভিত্তিতে নয়, পরিষ্কার ও নিশ্চিত যুক্তির মাধ্যমেই—তখনই দেখেছি সন্দেহজনক এমন কিছুই আমি তাতে পাচ্ছি না যার থেকে কোনো-না-কোনো স্থির সিদ্ধান্ত আমি টেনে না বার করছি; এমন-কি এটা ঘটছে তখনো, যখন

সেরকম কোনো প্রস্তাবে এমন কিছুই নেই যেটাকে নিশ্চিত বলা চলে। এবং যেমন পুরানো বাড়ী ভেঙে ফেলার সময় তার কিছু-কিছু ভগ্নাংশ মানুষ সাধারণত রেখে দেয় পরে পুনর্নির্মাণে কাজে লাগতে পারে ভেবে, সেইরকম আমার যেসব মতামতের ভিত্তি সুদৃঢ় নয় বলে বিবেচনা করেছি, তাদের ধ্বংস করার সময় আমিও এটা-ওটা নানান পর্যবেক্ষণ সমানে করে গেছি—এমন বহু অভিজ্ঞতাও তখন সঞ্চয় করেছি যা পরে নিশ্চিততর মতামত গঠনের ব্যাপারে আমার সাহায্যে এসেছে। এ ছাড়া আমার ছিল যে-রীতির বিধান দিয়েছি নিজেকে, তাতে হাত পাকিয়ে চলা। কারণ সাধারণভাবে আমার সকল চিন্তাভাবনাগুলিকে সেই নিয়মকানুন অনুসারে চালিত করার জন্য যথেষ্ট যত্নবান তো হতামই, এর উপরও কখনো-কখনো কয়েকটি ঘণ্টা আমি নিজের জন্য রেখে দিতাম, যখন বসতাম গণিতশাস্ত্রের কোনো জটিল বিষয় নিয়ে, অথবা এমন অন্য শাস্ত্র[৬] নিয়ে যাকে অন্যান্য কিছু বিজ্ঞানের[৭] তত্ত্বসমূহ থেকে পৃথক করে আমি প্রায় গণিতেরই সামিল করে আনতাম—বিশেষত সেই সমস্ত বিজ্ঞান যার ভিত্তি আমার কাছে খুব দৃঢ় ঠেকত না। আপনারা এই গ্রন্থেই পরে[৮] দেখবেন, এইরকম কিছু জটিলতা নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করেছি, তাদের ব্যাখ্যাও করেছি। এইভাবে, আপাতদৃষ্টিতে আমি জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছি যদিও তাদেরই মতো যাদের সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত ভিন্ন অন্য কাজ নেই এবং তাই যারা আনন্দকে পাপ হতে পৃথক করার শিক্ষা রপ্ত করে ও অবসর-যাপনের সময় ক্লান্তি বোধ না করার জন্য সবরকম সৎ বিনোদনকেই কাজে লাগায়, তবু নিজের ক্ষেত্রে আমার লক্ষ্যের পিছনে ছোটা আমি এতটুকু বন্ধ করিনি, সত্যের জ্ঞানে লাভবান হওয়ার কোনো অবকাশও হারাইনি, যেটা এই পরিমাণে হয়তো পারতাম না যদি শুধুই পড়াশুনো নিয়ে মেতে থাকতাম বা শুধুই পণ্ডিতদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম।

যাই হোক, এই নয়টি বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল—ইতিমধ্যে জটিল বিষয় নিয়ে পণ্ডিতরা সাধারণত পরস্পরের সঙ্গে যে-সব তর্কে বসেন, তাতে কোনো পক্ষ আমি কখনো নিইনি, অথবা এমন কোনো দর্শনের ভিত্তি খুঁজতেও সুরু করিনি যা নাকি ইতর[৯] না থেকে আরো নিশ্চিত হতে পারে। এবং যেহেতু এমন জ্ঞানী-গুণীর অভাব নেই যাঁরা আগে আমারই মতো কোনো পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে সফলকাম হননি, তাঁদের দৃষ্টান্ত তাই আমার মনে বহু বাধা-বিপত্তির ভয় জাগিয়ে তুলেছিল—এবং সেই কারণবশত এ-কাজে এত শীঘ্র হাত হয়তো আমি দিতামই না যদি না কেউ-কেউ ইতিমধ্যেই গুজব রটিয়ে বসে থাকতেন এই বলে যে আমি নাকি আমার লক্ষ্যে পেঁছে গেছি। তাঁদের এই ধারণার ভিত্তিটা যে কী, তা বলতে পারব না। সে-ধারণা সৃষ্টির পিছনে আমার আলোচনা বা কথাবার্তার যদি কিছু অবদান থেকে থাকে, তা আমি জানি না, সেটা জানি না বলে আমার অকপটে স্বীকার করা—যা একটু পড়াশুনো যারা করেছে, তারা সচরাচর করে না—এবং হয়তো বা ঐ কোনো মতবাদের বড়াই না করে শুধু যুক্তির মাধ্যমে আমার দেখাতে চাওয়া, কেন আমি সন্দেহ না তুলে পারছি না এমন অনেক কিছু ব্যাপারে যা অন্যের কাছে নিশ্চিত বলে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু যেটা আমি আসলে, ঠিক সেইভাবেই যেন লোকে আমাকে নেয়, অন্য কোনো প্রকারে নয়, এমন চাওয়ার মতো ভালো মন আমার আছে বলেই ভাবলাম লোকে যখন সুখ্যাতিটা দিয়েছেই, তখন যতরকমে প্যারি চেষ্টা করতে হবে নিজেকে তার যোগ্য করতে। এবং সেই ইচ্ছাই আজ থেকে ঠিক আট বছর আগে আমার মনে এই সংকল্পের জন্ম দেয় : নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যাব এমন এক জায়গায় যেখানে কাউকে চিনি না, এবং এইভাবে অবশেষে আশ্রয় নিই এখানে,[১০] এই দেশে, যেখানে বহুকাল ধরে যুদ্ধ চলার দরুন এমন এক শৃঙ্খলার

সৃষ্টি হয়েছে যাতে যে-সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে, তা তো আমার মনে হয় গভীর নিরাপত্তার সঙ্গে মানুষকে শুধু শান্তির ফল ভোগ করাতেই সর্বক্ষণ নিয়োজিত। এ-দেশ এক মহান জাতির, কর্মঠ মানুষের, যারা অন্যের প্রতি অনাবশ্যক কৌতূহল দেখানোর বদলে স্ব-স্ব বিষয়েই যত্নবান, এবং যেসব জিনিস মিলতে পারে জনাকীর্ণ বড় বড় সহরে, তার কিছুরই অভাব এখানে নেই—এখানকার ভিড়ের মধ্যে থেকেও আমি যাপন করতে পেরেছি এমন নিঃসঙ্গ ও নিভৃত এক জীবন যেটা নির্জনতম ও দূরদূরান্তে পরিব্যাপ্ত কোনো মরুতে চলে গেলেও সমানই পেতাম।[১১]

পাদ-টীকা

[১] দেকার্ত যা বলতে চাইছেন, তা সত্যের অনুসন্ধান এক জিনিস, এবং জীবনে চলতে পারার আবশ্যকতা অন্য জিনিস। যে-মত নিশ্চিত ও স্বতঃসিদ্ধ নয়, তাকে বর্জন করার সঙ্কল্পটাকে ব্যবহারিক জীবনে সব সময় প্রয়োগ করা যায় না, কারণ তা করতে গেলে এমন অনেক মুহূর্ত আসতে পারে জীবনে যখন কোনো সিদ্ধান্তই নেওয়া সম্ভব হবে না—অথচ বাঁচতে গেলে সমস্যা আসেই এবং মানুষকেও নিয়ত সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। তাই দেকার্ত এক সাময়িক নীতির উপস্থাপনা করছেন যার দ্বারা সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকাকালীন দৈনন্দিন নানা সমস্যা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। অর্থাৎ স্থির সত্য আবিষ্কার না করা পর্যন্ত একই সঙ্গে যেমন তিনি সব কিছুকেই সন্দেহ করে চলেছেন, তেমনি এই সাময়িক নীতি গ্রহণ করে প্রয়োজনমতো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তও নিয়ে চলেছেন একটার পর একটা। তাঁর এই সাময়িক নীতির সূত্রগুলি একধারে, রীতি-মাফিক সন্দেহ অন্যধারে—দুটিই প্রতি মুহূর্তে বর্তমান রয়েছে, যদিও কোনোটিই অন্যটির সঙ্গে কখনো এক হয়ে মিশে যাচ্ছে না। এই বিভাজক রেখাটি সর্বদা টানতে চেয়েছেন বলেই তাঁকে সন্দেহবাদীদের দলে কিছুতেই ফেলা চলে না। বর্তমানে প্রস্তাবিত নীতিটিকে তাই 'সাময়িক' যখন বলছেন, তার অর্থ তখন এই যে এটিকে ততক্ষণই তিনি অনুসরণ করে চলবেন যতক্ষণ-না আবিষ্কার করছেন স্থায়ী নীতিটিকে। কেমন হবে সেই স্থায়ী নীতি? উত্তরে দেকার্ত বলছেন অন্যত্র, 'তাতে নিহিত থাকবে অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ের যাবতীয় জ্ঞান, তা হবে প্রজ্ঞার চরম ধাপ।' দুর্ভাগ্যবশত, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হঠাৎ মৃত্যুর দরুন দেকার্ত তাঁর কাজ শেষ করে যেতে পারেননি, তাই এই স্থায়ী নীতি সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত আলোকপাত তাঁর পরবর্তী লেখায় আমরা পাই না। তবে বোহেমিয়ার রাজকুমারী ও হল্যান্ডে শরণার্থী এলিজাবেথের সঙ্গে পত্রযোগে এই বিষয়ে বহু গভীর আলোচনা তিনি করেন, এবং সেই পত্রগুলি হতে এ-বিষয়ে তাঁর ধারণার খানিকটা আঁচ করা চলে। মনে হয়, সাময়িক ও স্থায়ী নীতির মধ্যে বিশেষ বিভেদ তিনি দেখেননি, এবং প্রথমটির সূত্রগুলিকে দ্বিতীয়টির পক্ষেও উপযোগী বলে বিচার করেছেন—কেবল এই খণ্ডে বর্ণিত সাময়িক নীতির প্রথম সূত্রটিকে তিনি স্থায়ী নীতির অন্তর্ভুক্ত করেননি, অন্তত সেই সূত্রটির উল্লেখ নেই তাঁর চিঠিপত্রে।

[২] সত্যের কার্তেজীয় ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো সম্ভাব্যতা বা অনিশ্চয়তার স্থান নেই। তবে এখন প্রসঙ্গ হচ্ছে ব্যবহারিক জীবন, যেখানে প্রতি মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, কাজ করতেই হবে।

[৩] অর্থাৎ, স্টোয়িক দার্শনিকরা।

[৪] শুধু ভালো কাজ করার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে-সঙ্গে থাকা চাই ভালো-মন্দ সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান—এই দুটি বস্তুর সংমিশ্রণ হলে তখনই দেকার্তের আদর্শ প্রজ্ঞা জন্ম নেয়। কারণ যে-কোনো অবস্থাতেই একমাত্র ভালোমন্দের বোধই সদিচ্ছাকে ঠিক লক্ষ্যে চালিত করতে পারে।

[৫] অ্যারিস্টট্‌ল্ গুণের নানা শ্রেণী-বিভাগ করেছেন। দেকার্ত কিন্তু ঘোষণা করছেন গুণের ঐক্য, যেমন কিছু আগে এ-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা তাঁকে দেখেছি সকল বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত ঐক্য ঘোষণা করতে।

[৬] এখানে দেকার্ত প্রসঙ্গ পাড়ছেন আলোকবিদ্যা ও আবহবিদ্যায় তাঁর কিছু তৎকালীন গবেষণার। আলোকবিদ্যায় যা প্রতিসরণের নিয়ম বলে পরিচিত, তার সত্যতা পরীক্ষার জন্য ১৬২৬-২৭-এর শীতে দেকার্ত একটি বিশেষ পরকলা কেটে প্রস্তুত করেন। আবহবিদ্যায় তাঁর পরীক্ষা চলে বিশেষত রামধনু নিয়ে।

[৭] মধ্যযুগীয় পদার্থবিদ্যা ও আবহবিদ্যার প্রতি ইঙ্গিত এখানে।

[৮] অর্থাৎ আলোকবিদ্যা ও আবহবিদ্যা বিষয়ে লিখিত তাঁর দীর্ঘ নিবন্ধ দুটিতে। এইরকম আরো একটি দীর্ঘ নিবন্ধ ছিল জ্যামিতিরও উপর—একত্রে এই তিনটি নিবন্ধের মুখবন্ধ হিসেবেই বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হয়।

[৯] 'ইতর' মানে এখানে সাধারণ মাত্র—কোনো নিন্দার ভাব নেই। দেকার্ত যা বোঝাতে চাইছেন তা মধ্যযুগের দর্শন।

[১০] অর্থাৎ হল্যান্ডে।

[১১] দেকার্ত বর্ণনা করছেন, কেন হল্যান্ডে আশ্রয় নিতে তিনি বাধ্য বোধ করেন। অনর্থক বিতর্ক বা

বাগাড়ম্বরে তাঁর ঝোঁক ছিল না, নিছক খ্যাতি বা প্রতিপত্তির পিছনেও তিনি কখনো ছোটেননি। ১৬৩৩-এ 'পৃথিবী বা আলোক-বিষয়ক নিবন্ধ' নামে পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত একটি সুদীর্ঘ রচনা তিনি বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত করেন—কিন্তু যে-মুহূর্তে শুনলেন সমভাবাপন্ন মতামত পোষণের জন্য গ্যালিলিওকে অভিশপ্ত ও নির্যাতিত করা হয়েছে, এ-লেখাটি দেকার্ত আর ছাপলেন না। ভেবেছিলেন, তাঁর মতকে কেড়ে নিতে যখন কেউ পারবে না—এবং ক্যুরের ধমকে সেই মত তিনি বদলাতেও যাবেন না—তখন অসময়ে লেখাটি ছাপিয়ে অনর্থক মানসিক শান্তি হারানো ভিন্ন তাঁর অন্য লাভ হবে না।

শব্দপঞ্জী

এই খণ্ডে ব্যবহৃত কিছু বাংলা শব্দের একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী পাঠকদের সুবিধার্থে এখানে দেওয়া হল, সঙ্গে সমার্থক ফরাসী ও ইংরেজী শব্দ, আগে ফরাসী পরে ইংরেজী।

অনুমান, conjecture, conjecture
আবহবিদ্যা, météores, meteorology
আবহবিদ্যা, météorologie, meteorology
আলোকবিদ্যা, dioptrique, optics
আলোকবিদ্যা, optique, optics
আলোচনা, discours, discourse
গুণ, vertu, virtue
দেশাচার, moeurs, customs
ধর্ম, vertu, virtue
নিয়ম, loi, law
নিয়ম, ordre, order
নীতি, morale, morals
নৈতিকতা, morale, morals
পদার্থবিদ্যা, physique, physics
পরকলা, lentille, lens
প্রজ্ঞা, sagesse, wisdom
প্রতিশ্রুতি, promesse, promise
প্রতিসরণ, réfraction, refraction
প্রত্যয়, créance, credence
বিশ্বাস, foi, faith
বৃত্তি, occupation, profession
ভাগ্য, fortune, fortune
মধ্যযুগের দার্শনিকরা, scolastiques, scholastics
যুক্তি, raison, reason
যুক্তি, raisonnement, reasoning
রামধনু, arc-en-ciel, rainbow
রীতি, méthode, method
রীতি-মাফিক সন্দেহ, doute méthodique methodical doubt
সন্দেহবাদী, sceptique, sceptic
সম্পদ, biens, wealth
সম্ভাব্যতা, probabilité, probability
সিদ্ধান্ত, conclusion, conclusion
সুখ-সম্পদ, biens, wealth
সূত্র, maxime, maxim
স্টোয়িক দার্শনিক, stoïcien, stoic
স্থপতি, architecte, architect

[ক্রমশ]

মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ : **লোকনাথ ভট্টাচার্য**

স মা লো চ না

কবিতা : চিত্রিত ছায়া— বার্ণিক রায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। কলিকাতা-১৬। মূল্য পনেরো টাকা।

বিশেষভাবে পাশ্চাত্য কবিদের বক্তব্য, ধ্যান ও ধারণা, এবং তার সঙ্গে কিছু পাশ্চাত্য আলঙ্কারিক-প্রসঙ্গ বার্ণিক রায় রচিত পুস্তকটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। তা-ছাড়া তিনি ৫৬ জন বাঙালী এবং আধুনিক কবির কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মত ব্যক্ত করেছেন। বাঙালী কবিদের কাব্যালোচনায় বহুদিন আগে থেকেই পাশ্চাত্য কবি-প্রসঙ্গ টেনে আনা হচ্ছে। ভাবখানা যেন, পশ্চিমী কাব্যের আলোকে বাঙলা কবিতার আলোচনা না করলে বাঙালী কবিরা কাব্য-সংসারে কল্কে পাবেন না। বার্ণিক রায় আলোচ্য বইতে সেই পুরানো সমালোচনা-রীতির অনুবর্তন করেছেন। কাজটি অন্যায় কিছু নয়; কিন্তু তাতে নতুনত্ব নেই। 'হয়তো এ-জাতীয় আলোচনা এর আগে বাংলায় হয় নি'—'নিবেদন'-এ উচ্চারিত লেখকের এই দাবী 'হয়তো' কথার অন্তর্নিহিত সংশয়ে সীমাবদ্ধ।

'নিবেদন'-এ লেখকের বক্তব্য: তুলনা, বিশ্লেষণ, তথ্য-নির্ভরতা, ব্যাখ্যা, বিচার, 'সংগঠিত জ্ঞান' ইত্যাদি, 'কোনো সমালোচনাই নয়'। এ-বইতে 'সংগঠিত জ্ঞান' এবং 'তথ্য-নির্ভরতা' ছাড়া আর সবই আছে। কিন্তু ঐ দু'টি গুণের অভাবে তুলনা, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, বিচার ইত্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হয়েছে।

বইটির অপর একটি দোষ,—দুর্বোধ্যতা, সর্বত্রই পরিস্ফুট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। বইটিতে ভূরি ভূরি পাশ্চাত্য নাম দেখা যায়। কিন্তু বইটির নির্ঘণ্ট নেই। তার ফলে পাঠকের অসুবিধা হয়। যে-সব পাশ্চাত্য লেখকের নাম করা হয়েছে, খুব কম জায়গাতে তাঁদের সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হয়েছে। অন্ততঃ তাঁদের মতের উদ্ধৃতি-প্রসঙ্গে তাঁদের বইগুলোর কথা বলা উচিত ছিল। বইয়ের রেফারেন্স না থাকায় বইটি প্রায় একটি মুদ্রিত নামাবলীতে পরিণত হয়েছে। নামাবলী ভক্তদের ভক্তির উদ্রেক করলেও পাঠকের জিজ্ঞাসা থেকেই যায়।

'শব্দ শব্দ শব্দ'—এ-বইয়ের প্রথম অধ্যায়। কবিতার শব্দতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তার সারমর্ম কী? 'ধ্বনিবর্ণকর্মচিন্তাপরিবেশের অসংলক্ষ্যক্রম' লেখকের মতে জনগণের ভাষায় দেখা যায়। (পৃ. ১) কিন্তু আধুনিক কবিতায় সেই 'অসংলক্ষ্যক্রম' কোথায়? দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি "কোন দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ/করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে।" পদটি উদ্ধৃত করেছেন। (পৃ. ২) কিন্তু এ-ভাষা, জনগণ বলতে যাদের বোঝানো হয়, তাদের ভাষা নয়। জনগণের ভাষায় কবিতার আবির্ভাব খুবই সম্ভব। কিন্তু লেখকের মতে যে-সব কবি জন-ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের আসল কাব্য-ভাষা কি সত্যি সত্যি জন-ভাষা? আদিম যাদুর ভাষা অনেক আধুনিক কবি, লেখকের মতে, কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু তাতে দাঁড়িয়েছে কি? আদিম জনবাসীদের ভাষা নাকি শিশুদের ভাষার মতো 'নিরর্থ'। (পৃ. ৪) দৃষ্টান্ত না দিয়ে এ-ধরনের মন্তব্য করা উচিত নয়।

উত্তম কবিতায় সঙ্গীতের ভাব সম্পর্কে লেখক সচেতন। কিন্তু তার দৃষ্টান্ত

আলোচনায়, 'ধ্বনি-সাম্য', 'শ্রুত্যনুপ্রাস', 'সম', 'আনুনাসিক্য', প্রভৃতি বিকট শব্দ-প্রয়োগ বিষয়টিকে কর্কশ স্বরে গাওয়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মতোই শ্রুতিকটু করে তুলেছে। এ-আলোচনায় ধ্বনি-জ্ঞানের পরিচয় আছে কিনা, জানি না; তবে সুর-জ্ঞানের পরিচয় একেবারেই নেই। (পৃ. ৫-৬)

৭ পৃষ্ঠায় 'মাণ্ডুকী গ্রন্থ' উল্লিখিত। জিনিসটি কী? গ্রন্থটি কোন্ ভাষায়, এবং কবে রচিত? ঐ পৃষ্ঠাতেই, De Scintillatious Sitôt le Septour বাক্য, কিংবা বাক্যাংশের অর্থ কী? লেখক কি ধ'রে নিয়েছেন যে, এ-বইয়ের পাঠক-পাঠিকাদের ফরাসিজ্ঞান তাঁর নিজের ফরাসি-জ্ঞানের মতোই সুগভীর?

মালার্মে নাকি 'শূন্য'-কে 'মূর্ত' করতে চেয়েছেন। (পৃ. ৮) দৃষ্টান্ত ছাড়া বিষয়টি উপলব্ধির গোচরে আনা যায় না। 'জীবনানন্দের রীতি ভালেরির'। (পৃ. ৯) জীবনানন্দ, বার্ণিক রায়ের মতে, মালার্মে ও ভালেরিকে 'আত্মসাৎ' করেছেন। 'আত্মসাৎ' কথাটি প্রভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, নাকি স্রেফ্ চুরি করার অর্থে লেখক কথাটি এনেছেন? ঐ-পৃষ্ঠায় স্ফোটবাদ কথাটির উল্লেখ দেখা যায়। স্ফোটের আবার 'ব্রহ্মবাদী অভিধা'। স্ফোটবাদ, এবং তার 'অভিধা'র কোনো ব্যাখ্যা লেখক করেন নি। এ-থেকে স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই পুস্তকের পাঠক-পাঠিকাদের ফরাসি জ্ঞান এবং প্রাচীন সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রজ্ঞান লেখক দ্বিধাহীনচিত্তে ধ'রে নিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ লেখকের মতে, স্ফোটবাদী। কিন্তু কীভাবে? আবার বলেছেন: 'সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ধারায় রোমান্টিক'। (পৃ. ১১) স্ফোটের সঙ্গে কাব্য-বিষয়ক রোমাঞ্চ কীভাবে হ'তে পারে? "ঈনীড্"-এ 'গথিক' রূপ দেখেছেন লেখক। কিন্তু তাহ'লে ভার্জিল কি 'গথিক' শিল্প-স্রষ্টা? 'গথিক' রীতির আবির্ভাবের পূর্বেই কি "ঈনীড্" রচিত হয় নি? আশ্চর্য!

কবিতার দুর্বোধ্যতার বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 'কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে কবিই স্রষ্টা', বলেছেন লেখক, 'সুতরাং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রহস্যময় এইরকম কিছু দুর্বোধ্যতা থাকবেই'। আলোচনার সূত্রপাতেই এ-কথা ব'লে, ১২ থেকে ২২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ-বিষয়ে সুদীর্ঘ এবং রহস্যময় বাগ্‌বিস্তারের কী প্রয়োজন ছিল?

কবিতার সাহায্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে। (পৃ. ১২) খুব খাঁটি কথা। কিন্তু নিশ্চয় দুর্বোধ্য কবিতা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে খুব একটা সাহায্য করেনি। শেক্‌স্‌পিয়ার, কালিদাস, দান্তে, গ্যয়টে—সভ্যতার ইতিহাসে যাঁদের অবদানের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে—আমাদের রবীন্দ্রনাথ,—এ'রা কি দুর্বোধ্য? হোমার কি দুর্বোধ্য? 'ডিফিকাল্টি', 'অব্‌স্‌কিওরিটি', 'অ্যাম্বিগুইটি' (পৃ. ১৩) ইত্যাদি দুর্বোধ্যতার তিস্তা নদীতে এ'রা ভাসমান ছিলেন না। কবি যখন ভাবনার অভাবে কাতর, তখনই তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য হয়। যে-কবিতার রস বুঝতে গলদ্‌ঘর্ম হ'তে হয়, কোনো রহস্যবাদী 'থিওরি' দিয়ে তার যাথার্থ্য প্রমাণিত করা, আর ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট গলানো, প্রায় একই রকমের অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। 'দুর্বোধ্যতা কবির অভিপ্রেতও নয়, পরিত্যাজ্যও নয়', বলেছেন বার্ণিক রায়। (পৃ. ১৪) এই ধাঁধার জবাব তিনি নিজেও খুঁজে পেয়েছেন কিনা, সন্দেহ। আসলে এ-ধরনের মত প্রতিক্রিয়াশীল এবং অসামাজিক। স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন, অহংকারী, একলাষেঁড়ে 'কবি' দুর্বোধ্য হিং টিং ছট্ লিখবেন। তা না-পড়লে, না-বুঝতে পারলে নিন্দাভাজন হ'তে হবে। এ-ধরনের সাহিত্যিক নাসিকাকুঞ্চনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই বাঞ্ছনীয়; তার বাহ্‌বা দেওয়াই পাপ। লেখক এই প্রসঙ্গে বারবার ভালেরির কথা বলেছেন। কিন্তু ভালেরির মতো অমন

সুন্দর কবিতা ক'জন লিখেছেন? তিনি কি দুর্বোধ্য? কাব্যিক দুর্বোধ্যতার বিশ্লেষণে বার্ণিকবাবু নিজেও দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠেছেন। দৃষ্টান্ত, 'ভাষাছন্দসুরচিত্রকল্প', 'অর্থহীন ধ্বনি', 'লাফানো ভঙ্গি', 'আপাতযুক্তিবিশৃঙ্খলা', 'ভাঙা চিত্রকল্প' প্রভৃতি আধো বাণভট্টীয়, এবং আধো জনভাষায়, সমাসবদ্ধ বিচিত্র শব্দের বাগুরা-বিস্তার। (পৃ. ১৫-১৬) যা আবোল-তাবোল, অর্থহীন, এবং হয়তো বা নিছক মদ্য বা অন্য কোনো মাদকদ্রব্য প্রভাবিত উন্মত্ততা মাত্র, তাকে জাতে তুলবার কী চেষ্টা! আধুনিক অলঙ্কারশাস্ত্র এখন তথাকথিত 'কবি'দের কৌলিন্য প্রমাণের জন্য যেন দিশেহারা! কিন্তু প্রাচীন এবং অজ্ঞাত সংস্কৃত কবির সুভাষিত মনে পড়ে,

কালিদাস প্রভৃতি কবিরাও কবি:
আমরাও কবি।
পর্বতে এবং পরমাণুতে পদার্থত্ব প্রতিষ্ঠিত!

মম্মট ভট্ট থেকে শ্লোকের উদ্ধৃতি ভুল। (পৃ. ১৮) [দ্রষ্টব্য, "বাক্যপ্রকাশ", চৌখাম্বা সং, ১৯৫১, পৃ. ১১৪] বার্ণিক রায় কর্তৃক শেষ পঙ্‌ক্তিতে উদ্ধৃত কথাটি 'বন্ধ্যাং' কখনই নয়; কথাটি 'বন্দ্যাং'। "বন্ধ্যাং" মানে 'বন্দী রমণী' নয়; বন্দী রমণী (পৃ. ১৯) ব'লতে মূলে 'বন্দ্যাং' কথাটি আছে। অথচ লেখক মম্মট-প্রসঙ্গে বলেছেন: 'এ-সব আলোচনার কোন মানে নেই, আনন্দবর্ধনই এ-ব্যাপারে আমাদের প্রকৃত পথে চালিত করে'। করছেন কবিতার আলোচনা; টেনে আনছেন গালভরা সব নাম; মম্মট-এর বেলায় তাঁর আপত্তি; অথচ, তাঁর কথাটির অর্থই তিনি জানেন না!

আনন্দবর্ধনের পরেই এসেছে ভিকো-র কথা। এই নামাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" উপন্যাসের অন্যতম নায়ক অমরনাথের বিবরণ স্মরণ করিয়ে দেয়। সেক্ষপিয়র গেলারির ছবির আলোচনা থেকে শুরু করে অমরনাথ চলে এসেছিলেন সীতা, শকুন্তলা, বাসবদত্তা প্রসঙ্গে। সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন তাসিতস, প্লুটার্ক ও থুকিদিদিস-এ। তারপরে ফিরে এসেছিলেন হক্‌স্‌লী, ওয়েন, ডারুইন ও সোপেনহয়রে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, নাম থেকে নামান্তরে এই কৌতূহলোদ্দীপক চংক্রমণ "কবিতা : চিত্রিত ছায়া"-তেও দেখা যায়। অমরনাথের পাণ্ডিত্যমুগ্ধ শচীন্দ্র আসলকথা ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের আসল-কথা ভুল হবে না। যে-এজরা পাউন্ড সম্পর্কে লেখক মুগ্ধ, তিনি 'ইমেজিষ্ট' হলেও, কোনো এক অকাব্যিক প্রেরণার বশীভূত হ'য়ে, বর্বর নাৎসিদের সমর্থন করেছিলেন। 'জয়েসের মতো দুর্বোধ্যতা এনেছেন পাউন্ড'। (পৃ. ২১) জয়েস দুর্বোধ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি পাগল ছিলেন না। পশ্চিমী চিন্তায় জয়েসের প্রভাবের সঙ্গে পাউন্ডের প্রভাবের তুলনা, যেন পাউন্ডের সঙ্গে পেন্‌স্‌-এর তুলনা!

বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে আছে 'ঐতিহ্যচিন্তা ও বাংলা কাব্য' সম্পর্কে আলোচনা। (পৃ. ২৩-৩৩) ২৩ থেকে ২৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ-আলোচনায় বাঙলা কাব্য সম্পর্কে একটি কথাও নেই। আছে 'এলিঅট'-এর ঐতিহ্য-চিন্তার আলোচনা। প্রসঙ্গক্রমে বার্ণিকবাবু হেগেলের 'ইতিহাসতত্ত্বে, জাতিতত্ত্বে, নীতিতে, বীরধর্মে, রাষ্ট্রমুক্তিতে' প্রচুর 'কৌতুক ও ভুলের উপাদান' দেখেছেন। (পৃ. ২৭) ভুল হয়তো আছে। কিন্তু হেগেলের দর্শনে তিনি 'কৌতুক' পেলেন কোথায়? তারপরেই এসেছে বাঙালীর ঐতিহ্য-বিষয়ক গবেষণা। (পৃ. ২৮) লেখকের মতে সেই ঐতিহ্যের প্রধান দুটো উপাদান, 'বিষণ্ণ ভাবুকতা' এবং 'আত্মগর্বের পরিপ্রেক্ষিতে তার একক শ্রেষ্ঠত্ব'। অথচ তিনিই বললেন: 'এ দুটোর কোনটাই ধোপে টেকে না।' (পৃ. ২৮)

অতঃপর জাতিতত্ত্বালোচনায় নিবিষ্ট থেকে লেখক প্রকৃতির সঙ্গে বাঙালীর মিতালি খুঁজে পেয়েছেন। এই আলোচনাও ধোপে টেকে কিনা, সন্দেহ। কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে বাঙালীর মিতালি যদিও বা সত্য, তা বাঙালীর জাতিতত্ত্ব দ্বারা দুর্নির্ণেয়। ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অবশ্য স্বীকৃত হয়েছে। (পৃ. ২৯)

বারবার লেখক এই প্রসঙ্গে একটা 'বেদনা'র কথা বলেছেন। আবার 'সসংবেদ্য অন্বয় অনুভূতিজাত সহজানন্দ' পাশাপাশি উল্লিখিত হয়েছে। (পৃ. ৩০) ব্যাপারটা কী? বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রযুক্তি-শব্দের আমদানি দেখা যায় ২৮ থেকে ৩১ পৃষ্ঠায়। কিন্তু 'যোগিনীর মুখচুম্বনে কমলরস পান' করার সঙ্গে (পৃ. ৩০) বাঙালী ঐতিহ্যের যোগ আছে নাকি? অথবা, ৩১ পৃষ্ঠায় হঠাৎ রাধা-তত্ত্ব উৎক্ষিপ্ত হ'লো কেন? এ-সব তত্ত্বের সঙ্গে 'এলিঅটি' ঐতিহ্য-চিন্তার সম্পর্কই বা কি? তবে বাঙালী-ঐতিহ্যে 'পাশ্চাত্য সংস্কৃতি'র প্রভাব লেখক দেখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে 'অষ্ট্রিক' বাঙালীর 'লিরিকতা'র প্রসঙ্গ উঠেছে। 'লিরিকতা'ই নাকি 'অষ্ট্রিক জাতির মনোভঙ্গির' এক 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য'। এ-তথ্য সত্যি অবাক ক'রে দেয়। কিন্তু 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য' কি রকম?

এ-ধরনের আলোচনায় বাঙালীকে খুঁজে পাওয়া খুবই মুশ্‌কিল। এখানে প্রথমে বাঙালী 'অষ্ট্রিক'। তারপরে বজ্রযানী বৌদ্ধ। অতঃপর বৈষ্ণব। এবং সবশেষে সাহেব। আসল বাঙালী এখানে এক বি-চিত্রিত ছায়ায় পরিণত!

পাশ্চাত্য প্রভাব বর্ণনায় প্রথমেই এল রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ। তারপরে (আগে নয়) মাইকেলের কাব্য। তারপরেই শুরু হয়েছে সেই একঘেয়ে নামাবলীর ঘূর্ণীপাক। চমক লাগিয়ে বলা হয়েছে, সুধীন্দ্রনাথের উপর 'ক্ষণবাদী' বৌদ্ধদের প্রভাব পড়েছে। (পৃ. ৩০)

পরের অধ্যায়, 'চিত্রকল্প, চিত্রকল্প ও চিত্রকল্প'। পাশ্চাত্য রসশাস্ত্রের চর্বিতচর্বণের ফলে সমগ্র অধ্যায়টি বিবর্ণ। দশ রকমের চিত্রকল্পের উল্লেখ আছে ৩৮ পৃষ্ঠায়। সমগ্র আলোচনাটি হয়ত বা কতগুলো পশ্চিমী লেখকের সারানুবাদ!

'সেন্সিবিলিটিময়' (পৃ. ৪৩), 'জৈব কাইনেস্থেটিক' (পৃ. ৩৭), 'অ্যাটিচুড' (পৃ. ৪৫), 'টেনসন', 'রিয়ালিটি' (পৃ. ৪৮) প্রভৃতি বিদেশী শব্দ উদ্ধৃতিচিহ্ন ছাড়া বাঙলা অক্ষরে লিখে বার্ণিক রায় কী প্রমাণ করতে চান?

এই অধ্যায়ের শেষে আছে একটি দীর্ঘ পাদটীকা। অথচ প্রায় পনেরো জন বিদেশী লেখকের কোনো রেফারেন্স তাতে নেই। লেখক এঁদের বক্তব্য আলোচনায় ব্যস্ত। তিনি নিজে চিত্রকল্প সম্পর্কে কী বলেন, বা ভাবেন, তা তিনিই জানেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আধুনিক বাঙলা কবিতার ধারা। শুরু হয়েছে মোহিতলাল থেকে। শেষ হয়েছে ডিলান টমাস-এ। আলোচনার কিছু নমুনা: 'নজরুলের কবি হিসাবে কৃতিত্ব খুবই কম' (পৃ. ৫৫); মোহিতলালের কবিতায়, 'শব্দপ্রয়োগের অসাবধানতা' (পৃ. ৫৩); বুদ্ধদেবের কবিতায়, 'ভালেরির পেন্ডুলাম' (পৃ. ৫৬); অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়, 'প্যাটার্নের চঞ্চল অস্থিরতা' (পৃ. ৫৭-৫৮); এবং জীবনানন্দই 'ভিশন-প্রাপ্ত একান্ত সৎকবি' (পৃ. ৬০)। অসাধারণ এই সব মন্তব্য দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই আলোচনার দ্বিতীয় অংশে লেখক এক জায়গায় বলেছেন: 'সব কবিই এলিঅটের 'ভাব চোলাই করে প্রেরণা লাভ করেন' (পৃ. ৭০)। চোলাই-কারখানাগুলোর সন্ধান জানালে সমাজের মঙ্গল হ'তো। তারপরে বার্ণিক রায় লিখেছেন: 'লেডা যখন জিউসকে বুকে নিয়ে-ছিল, তার উরু শিথিল করে দিয়েছিল, তখন জিউসের প্রেম নয়, জিউসের কাছ থেকে

ভীষণতাই সে পেয়েছিল' (পৃ. ৭৩)। লেডার 'হৃদয়-স্পন্দন' পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। এ-সবের মানে কি? ৯০ পৃষ্ঠা থেকে বইটির শেষ পর্যন্ত বার্ণিক রায় ৫৬ জন বাঙালী কবি সম্পর্কে মত ব্যক্ত করেছেন। মত নিজস্ব। কাজেই এ-বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু দু-এক জায়গায় আলোচনা দুর্বোধ্য, যেমন: "আলোকরঞ্জনকেও এই প্রকৃতি নারীরূপে তাঁকে সৃষ্টি করেছে, তাঁর অনুভবের মধ্যে বাক্‌স্পন্দের মধ্যে প্রকৃতিই কথা বলেছে..." (পৃ. ১৮৩)। তাহ'লে কবি আলোকরঞ্জন, এবং পুরুষ আলোকরঞ্জন দুটি আলাদা সত্তা? যখন তিনি কবি, তখন তিনি 'নারী'?

লেখকের মতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। 'তাই কবিতা এখন আর নিটোল হয়ে ওঠে না' (পৃ. ১৬৬)। অথচ, কী আশ্চর্য! এজরা পাউন্ড নাৎসিবাদের সমর্থক হ'লেও বার্ণিক রায়ের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র!

না-মেনে উপায় নেই, এই ৫৬ জন কবি-প্রসঙ্গই কিছু প্রশংসা পেতে পারে। 'তাৎপর্য'-পূর্ণ এই আলোচনার জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ।

রমাকান্ত চক্রবর্তী

স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক—গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। রূপা অ্যান্ড কোম্পানি। কলিকাতা ১২। মূল্য ছয় টাকা।

আধুনিক গবেষণায় যে-দায়িত্ব নেওয়া উচিত প্রতিষ্ঠানের, দুর্ভাগ্যবশত বাঙলাদেশে সে-জাতীয় দায়িত্ব এখনো পর্যন্ত প্রধানত ব্যক্তি-নির্ভর; এবং সৌভাগ্যক্রমে এ-ধরনের কাজ করার মতো গবেষকের অভাব আজও বাঙলাদেশে হয়নি। তাই বাঙলায় পাঁচ খণ্ডে সুবৃহৎ সাহিত্যের ইতিহাস বা ব্যুৎপত্তিগত অভিধান, জীবনীকোষ বা গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন এখনো অঘটন হ'য়ে পড়েনি—যদিও তাঁদের এবং তাঁদের প্রকাশকদের উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনকি পৃষ্ঠপোষকেরও নয়। অবশ্য প্রতিষ্ঠান-প্রযোজিত নয় ব'লেই হয়তো সেগুলো এখনো পাঠযোগ্য—অন্তত "ভারতকোষ"-এর দৃষ্টান্তে তাই মনে হয়। ব্যক্তিগত উৎসাহে লেখা অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো বিশেষজ্ঞের লেখা নয়, সে-কথা স্বীকার ক'রেও বলা যায়, স্বেচ্ছাবৃত ব'লেই বিষয়ের প্রতি হয়তো তাঁদের মমতা ও নিষ্ঠা সেই পরিমাণেই বেশি। আবার, এ-জাতীয় গবেষণায় রচনার গভীরতা বা ব্যাপ্তি অনেকাংশেই নির্ভর করে লেখকের ব্যক্তিগত পক্ষপাতের ওপর। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত পরিকল্পিত একশোজন স্বদেশীয় ভারতবিদ্যাবিদের জীবনীসঙ্কলনের প্রথম খণ্ড প'ড়ে একই সঙ্গে এই আশ্বাস ও আশঙ্কা পাঠকের মনে জাগা অসম্ভব নয়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীব্যাপী এই সঙ্কলনের প্রথম পর্বে যে পনেরোজন ভারত-বিদ্যাবিদের জীবনী সঙ্কলিত হয়েছে, তাঁদের জন্মের সময়সীমা ১৮১২ থেকে ১৮৬০। গ্রন্থনামে 'স্বদেশীয়' নিছক প্রাদেশিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ নয়; পনেরোজনের মধ্যে আটজন বাঙালী ও অবশিষ্ট ভিন্ন প্রদেশবাসী। বর্তমান গ্রন্থে যাঁদের জীবনী সঙ্কলন করা হয়েছে তাঁদের অন্তর্ভুক্তি প্রশ্নের অতীত; তবুও গৌরদাস বসাক, রামদাস সেন বা মহেশচন্দ্র ন্যায়-রত্ন প্রমুখ পণ্ডিতের জীবনী বাদ পড়া কিছুটা অস্বস্তির কারণ অবশ্যই। কিন্তু সঙ্কলনে

যেহেতু নির্বাচনের প্রসঙ্গ অনিবার্য, কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিষয়ে, বিশেষত নির্বাচন যেখানে সংখ্যার দ্বারা সীমিত, সঙ্কলকের বিচারই চূড়ান্ত।

বাঙলা জীবনী সঙ্কলনের ধারায় এই জাতীয় বৈশেষিক (specialised) বই এর আগে প্রকাশিত না-হ'লেও শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কারের "জীবনীকোষ : ভারতীয় ঐতিহাসিক" অনেক পরিমাণে সেই দায়িত্ব পূরণ ক'রে আসছিলো। এবং ব্যবহার-যোগ্যতার দিক থেকে আভিধানিক বিন্যাসরীতি জন্মকাল অনুযায়ী গ্রন্থনার তুলনায় অনেক বেশি উপযোগী। অবশ্য উপযোগের প্রশ্ন সঙ্কলকের ঈপ্সিত পাঠকশ্রেণীর প্রত্যাশার দ্বারাও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত। গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ লেখক বলেছেন: 'আমার বিশ্বাস ভারততত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছাত্র ও গবেষকেরা এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন। তবে আমি এই গ্রন্থ শুধু তাঁহাদের জন্যই রচনা করি নাই। দৈবক্রমে উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত অথচ জ্ঞান-পিপাসু সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে।' শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে একালের তরুণ-তরুণীদের ভারতচর্চায় আকৃষ্ট করাই, লেখক বলেছেন, তাঁর 'মুখ্য উদ্দেশ্য'। ছাত্র-গবেষকের জ্ঞাতব্য হ'লো নতুন তথ্য অথবা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরনো তথ্যের ব্যাখ্যা, আর বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে হ'লে প্রয়োজন চরিত্রের আদর্শগত সমর্পণের দিকটিকে বিশদ ক'রে তোলা। এই একাধিক প্রায় বিপরীতমুখী অভিপ্রায়কে এক সঙ্গে মেলানোর অবশ্যম্ভাবী পরিণামচিহ্ন রয়েছে বইটির প্রতিটি প্রবন্ধে। আয়তনের মতোই প্রবন্ধ-গুলোর তথ্যসঙ্কলনও অত্যন্ত অসম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা রমেশচন্দ্র দত্ত বিষয়ে লেখক যতোটা তথ্য পরিবেশন করেন, আনন্দরাম বড়ুয়া বা ভাণ্ডারকর বিষয়ে জ্ঞাতব্য প্রায় সেই পরিমাণেই কম। শুধু তাই নয়, রমেশচন্দ্রের বাঙলা উপন্যাস বা চর্যাপদ বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিক বিতর্ক এই বইয়ে কেন বিশেষ গুরুত্ব পাবে, যুক্তি দিয়ে বোঝা কঠিন। বর্তমান পনেরোজন ভারত-তাত্ত্বিকের অধিকাংশেরই পূর্ণাঙ্গ জীবনী আছে, সুতরাং এই বৈশেষিক বইতে ব্যক্তিজীবন সংক্রান্ত তথ্যের পুনরুক্তির প্রয়োজন ছিলো না। এই পণ্ডিতদের জীবনী রচনা করতে গিয়ে গৌরাঙ্গগোপালবাবু জীবনী অংশ সংক্ষেপ ক'রে যদি তাঁদের রচনাবলীর ওপর নির্ভর ক'রে (অন্যের মন্তব্যের সাহায্যে নয়) ভারতবিদ্যাচর্চায় তাঁদের ভূমিকা বিশ্লেষণেই বেশি মনোযোগ দিতেন, তাহ'লে বইটির ব্যবহারযোগ্যতা বাড়তো। বর্তমান অবয়বে একটি সাধারণ জীবনী-গ্রন্থের সঙ্গে ব্যক্তি নির্বাচনে ছাড়া বইটির স্বভাবগত বিশেষ কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না।

একটি প্রাসঙ্গিক সমস্যা, যা এই ভারততাত্ত্বিকদের অন্বেষার স্বরূপ জানতে আমাদের সহায়তা করবে ব'লে আমার বিশ্বাস, তা গৌরাঙ্গগোপালবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ব'লে অনুমান করি। এবং সেই অভাবই সামগ্রিকভাবে এই সঙ্কলনকে একটি পূর্ণাঙ্গ বই হিশেবে গ'ড়ে উঠতে বাধা সৃষ্টি করেছে। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যে একশোজন ভারতবিদ্যাবিদের জীবনী গৌরাঙ্গগোপালবাবু সঙ্কলন করতে গিয়েছেন, ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির বাইরে শিক্ষিত পণ্ডিতের সংখ্যা তাঁদের মধ্যে নগণ্য। অর্থাৎ ইংরেজের ইশকুলে প'ড়ে এ'রা শেষ পর্যন্ত ধ্যান করেছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতির, ইংরেজী শিখলে চাকুরীর পথ খোলা জেনেও বরণ ক'রে নিয়েছিলেন তুলনায় দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবিকা। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের পর এই মনোবৃত্তির ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তার আগের পর্বে? সে কি ঐতিহ্যেরই ধারাবাহিক চর্চা, না কি প্রতিক্রিয়া? যার শুরু হয়েছিলো আরো আগে থেকে, মেকলের উদ্ধত ঘোষণার চাপা প্রতিবাদস্বরূপ? তাঁরা কি কেবলমাত্র অতীত-মুখই ছিলেন, না কি বর্তমানের জন্য সঞ্জীবনী সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন

অতীতে? সেই ইতিহাস আলোচনা না-করলে এই পণ্ডিতাগ্রগণ্যদের যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব কিনা আমার সন্দেহ। এ-জাতীয় জীবনী সংকলনের পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য গৌরাঙ্গ-গোপালবাবুর হাতের কাছেই আছে, আশা করি আলোচনাকে আরো সংহত ও বিশ্লেষণাত্মক ক'রে তিনি এই জীবনীমালাকে পূর্ণতর ক'রে তুলবেন।

স্বপন মজুমদার

New Writers 9. Calder and Boyars. London. 75*p*.

তরুণরা বোধহয় বিরাট আকারের কিছু লেখার পক্ষপাতী নন, অন্তত যখন সমস্ত সনাতন মূল্যবোধ ধূলিসাৎ হতে চলেছে। চারিদিকে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা আছে, তার মধ্যে মনস্থির ক'রে তথাকথিত বড় কিছু করা প্রায় অসম্ভব। দ্রুত পরিবর্তমান বিশ্ব মানুষকে কোন জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে দিচ্ছে না, ফলে স্বাভাবিকভাবে যে কোনও সমস্যার সামগ্রিক চেহারা, সেই সমস্যা যে আরও পাঁচটা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত তা ভাবা মুস্কিল হচ্ছে; বিশেষ ক'রে তরুণ লেখকরা কেন্দ্রের সেই ধ'রে রাখা শক্তির অভাবে দিশেহারা, খানিকটা অসহায়ও বটে; তাই তাঁদের কাছে তাৎক্ষণিক ব্যাপারগুলি বড় হয়ে ওঠে, অথচ এই ব্যাপারগুলো গল্প বা উপন্যাসায়িত করার জন্য যে স্থৈর্য ও নিরাসক্তি দরকার, তারও অভাব ঘটেছে।

উপরন্তু উন্নত দেশগুলি আজ নানা সংকটে জর্জরিত, প্রাচুর্যের গ্লানি আত্মিক সংকটকে তীক্ষ্ন করে তুলেছে, সেই আত্মিক সংকট সংবেদনশীল মানুষকে কেবলি বিপন্ন করে তোলে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে আত্মতুষ্টি তাঁদের আচ্ছন্ন করে রাখে, সেই আচ্ছন্নতা যে সংকটের ছদ্মবেশ মাত্র তা টের পেতে তাঁদের অনেকদিন কেটে গেল; সুখের কথা তরুণরা লেখা সুরু করেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই দেউলে রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। তার মানে এই নয় যে এ'দের আগে কেউ লেখায় ব্যাপারটা তুলে ধরেন নি, তুলে ধরেছেন, তবে তরুণরা যেমন একে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেন নিজের তাগিদে এবং তাই উপজীব্য করেন তাঁদের লেখায়, ঠিক তেমন ভাবে নয়। অবশ্য সামগ্রিকভাবে অধঃপতনেব অন্তঃসারশূন্যতার রূপ এখনও পাওয়া যাচ্ছে না; খানিকটা হয়ত সাহিত্যিক কারণেও বাইরের জগৎ আর তেমন ভাবে টানছে না লেখকদের, যতটা টানে অন্তর্লোক; অথচ আমাদের সংস্কার এই যে বাইর ও ভেতর—উভয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করলেই সেই সব অসম্ভব লেখার দেখা পাওয়া যাবে যা এখন আমাদের কাছে ধ্রুপদী নামে পরিচিত; যদিও সাহিত্য শিল্পে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম কাজ করে না, হয়ত অন্তর্লোকের নিদারুণ বিবরণই একদিন আশা পূরণ করবে যেমন করেছিলো প্রুস্ত-এর স্মৃতিরোমন্থনময় বিরাট রচনাটি, অবশ্য আপাতত তেমন লেখার সাক্ষাৎ এখনও মেলে নি।

গল্প উপন্যাসে বর্তমানে মন প্রাধান্য পাওয়ায়, কোনও কোন ক্ষেত্রে মন সর্বৈব হয়ে ওঠায় লেখকের যে বিষয়মুখ দৃষ্টির উপর গল্প উপন্যাসের সিদ্ধি অনেকখানি নির্ভরশীল তার ব্যত্যয় ঘটে, ফলে গাল্পিক বা ঔপন্যাসিকের বিষয় বা ঘটনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, আর মন প্রাধান্য পায় ব'লে লেখক চেতনা-প্রবাহ বা আত্মকথনের রীতি গ্রহণ করেন।

New Writers 9-এর দুটি গদ্য রচনায় মন প্রধান বিষয় হয়ে ওঠায় উপরিউক্ত পদ্ধতির সাক্ষাৎ মেলে। সংকলনের প্রথম রচনাটি হচ্ছে রেনেট র‍্যাম্প-এর গল্প 'দ্য ওআক্ টু

সেন্ট হাইনারিখ'। হেলমুট ও হিলডা স্বামী-স্ত্রীরূপে বহুদিন বসবাস করছে একসঙ্গে, ডোরিস নামে তাদের এক মেয়েও আছে; অথচ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সেই উষ্ণতা নেই যাকে আমরা সচরাচর সুখী পরিবার হিসাবে চিহ্নিত করি। দুজনে বিছানায় একসঙ্গে শোয়, যদিও তারা দুজনে দুজনের চাহনির মানে শরীরের নানা সক্রিয় নিষ্ক্রিয় ইঙ্গিতের তাৎপর্য এমনকি পোষাক-পরিচ্ছেদের বিশেষ বিশেষ ভাঁজের অন্ধিসন্ধি জানে, এত ভালো ভাবে জানে যে যার ফলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের সজীবতা গড়ে ওঠে না, দৈনন্দিন অনিবার্য কৃত্যের মত তাদের দাম্পত্যজীবন অভ্যাসে পরিণত হয়। তাই হিলডা যখন 'আমার স্বামী' বলে হেলমুটের পরিচয় দেয় তখন 'প্রতিবার সে মনে করে যেন সে (হিলডা) তার শরীরের একটি অঙ্গের উল্লেখ করছে', হিলডা-হেলমুটের বিবাহিত জীবন বহুদিন আগে ফুরিয়ে গেছে, শুধু থেকে গেছে অভ্যস্ত অভ্যাসিকতা এবং রেনেট র‍্যাম্প সেই আলেখ্য তুলে ধরেন রবিবারের বেড়ানো-র এক সামান্য ছুতোয়। বেড়াতে বেরিয়ে তারা অনেক কিছু উপভোগ করে, হয়ত সেই উপভোগে কিছুটা আত্ম আবিষ্কারের সুযোগ মেলে, অথচ সেই আনন্দ আবেগের স্তরে উঠে আসে না বা তেমন উত্তাপের সঞ্চার করে না, যেজন্য বনের মধ্যে হেলমুটের যা বলতে ইচ্ছা জেগেছিল তা বলা হয় না বাড়ি ফেরার পথে অন্ধকারে এবং সেই আনন্দ বা উপভোগ অবশেষে প্রাত্যহিকতার ম্লান স্পর্শে শুকিয়ে যায়। লেখিকা বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের খণ্ড খণ্ড ঘটনা বিবৃত ক'রে স্বামীর দৈহিক অক্ষমতা বা নেহাৎ অভ্যাস কি ভাবে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক ক্লৈব্যকে ত্বরান্বিত করে অতি সংক্ষেপে দু-একটি পংক্তির মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন। স্বামী-স্ত্রীর ভয়াবহ শূন্যতাকে কঠিন পদার্থের মত দৃশ্যগ্রাহ্য করার জন্যই বোধহয় র‍্যাম্প বারবার শরীরের জামাকাপড়ের খাঁজ ও ভাঁজের বর্ণনা করেন। কোনও ভয়ঙ্কর নাটকীয়তা নয় কিংবা বিস্ফোরণ, তবু গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়ে ওঠা প্রাচীর কেবল অটল-ই নয় অভেদ্য তা টের পাই গল্প পড়া শেষ হ'লে। চাক্ষুষ নয় সেই প্রাচীর, কিছু বিষণ্ণ হই তার অস্তিত্বে। শঠতা, ছল বা ভান—সচেতনভাবে দুজনের মধ্যে কাজ করে না, তারা দুজনে দুজনকে ভালোভাবে জানে, এবং নিজেদের আবিষ্কার করেও নির্মমভাবে নিজেদের জীর্ণ বিবাহের রেশ টেনে চলে অগত্যা—সেই বিষাদের গল্প অমোঘ করে তোলেন রেনেট র‍্যাম্প মগ্নচৈতন্যের নানা অনুষঙ্গে স্মৃতিমন্থনের সীমিত ব্যবহারে।

অথচ জন ডনোভ্যান "অ্যান" নামক উপন্যাসোপম লেখায় চেতনা-প্রবাহ ও অন্তর্লীন আত্মকথনের ভঙ্গি ব্যবহার করেন অসংকোচে, কখনো হয়ত নিপুণভাবে-ও। প্রেমের উষ্ণ আবেগ প্রায় অগোচরে হিমশীতল হয়ে যাচ্ছে, আর তাই মনে অপরাধবোধের পাহাড় ক্রমে উঁচিয়ে উঠছে। দুজনের সম্পর্ক ক্লান্তির সীমান্তে এসে ঠেকেছে, এবং এই ক্লান্তি কি এই জন্য যে 'আমি অপরাধী মনে করছি, কারণ আমি কিছু-ই করি নি?' অথচ নায়ক জানে, সে একটা কিছু করেছে যা আতঙ্ক, ঋণ এবং অপরাধের মিশ্রণে মানসিক ব্যাপার। সামান্য সূত্র ধ'রে লেখক ভালবাসার ক্ষয় এবং সেই ক্রমাগত ক্ষয়ের শেষে অপরাধবোধের বিবরণে ডুব দেন নায়কের মনের অতলে, তুলে আনেন মগ্নমনের চিত্রলতায় প্রায় কবিতার মত নানা চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনা। এখানে নায়কের ভাবনা চিন্তা আত্মবিশ্লেষণ স্মৃতিমন্থন নানা অনুষঙ্গের সাহায্যে কাহিনী গড়ে ওঠে ব'লে শব্দ বা বাক্য যেন এক জায়গায় থেমে থাকে না, প্রবহমান পাথরের মত কেবল আমাদের তা উধাও করে নিয়ে যায়, ফলে মনস্ক পাঠকের পক্ষেও কিঞ্চিৎ শৈথিল্যে নায়কের মানসিক মানচিত্র সর্বদা অনুসরণ করা সম্ভব নয়, তবু অসতর্ক পাঠেও একথা মনে হয় যে নায়কের চারপাশে আছে কেবল অর্থহীনতার প্রাচীর, এই অর্থহীনতা অপরিবর্তনীয়

বটে—'বাইরে আমি সেই একই আছি, ভেতরে কেবল নিজেকে পীড়িত করি ও দীর্ঘশ্বাস ফেলি, কিন্তু লক্ষ বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন আমার কাজকর্ম দিয়ে বিচার করলে আমি ঐ পাথরের মত জড় ছাড়া কিছুই নই', তাই নায়কের কোন আশা নেই বা সামঞ্জস্যময় কোন এক বিশ্বদৃষ্টি, ফলে উপন্যাসটির অনেকখানি জুড়ে থাকে দুঃখবাদ এবং অবক্ষয়ের জীর্ণ চিহ্ন, হয়ত লেখক তাই শব্দ নিয়ে অযথা খেলা করেন, কিংবা ঐ শব্দ নিয়ে খেলার মধ্যে তিনি নায়কের অর্থনীতার পরিবেশ তুলে ধরেন আমাদের সামনে। রেনেট র‍্যাম্প-ও মগ্নচৈতন্যে ডুব দেন, তবু তাঁর গল্পটি কোনরূপে চতুর ব'লে মনে হয় না, অথচ "অ্যান"কে বড্ড বেশী কৌশলী লাগে, বিষয় ছাড়িয়ে এখানে লেখার প্যাঁচটাই বড় হয়ে উঠেছে, হয়ত-এজন্যেও লেখাটি পড়তে পড়তে আমাদের মত অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে ক্লান্তি লাগে, অন্যদিকে গদ্য পদ্য-র বিভেদ মাঝে মধ্যে অযথা লুপ্ত হয় ব'লে লেখাটি নিজের পায়ে যেন দাঁড়াতে পারে না।

আমান্দা স্মিথ-ও মগ্নচৈতন্যকে অনাবৃত করতে চান তাঁর কবিতায়। দৈনন্দিন জীবন বা চারপাশের সাধারণ কান্ডকারখানাকে উপজীব্য করলেও তিনি পলকেই সেই তুচ্ছ ব্যাপার-সমূহকে অভিজ্ঞতার স্তরে নিয়ে যান, এবং এই উত্তরণের মধ্যে ফলে বহু উল্লম্ফন থাকে যা আধুনিক কবিতায় সচরাচর উহ্য থাকে। বর্তমান সংকলন কবিতার ব্যাপারে কৃপণ। মাত্র তিন চারটি কবিতা পাঠ করে একজন কবির প্রতিভার প্রাথমিক মূল্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব।

কার্তিক লাহিড়ী

ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

৪নং ফর্ম

[রুল ৮]

১। প্রকাশ স্থান: ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
২। প্রকাশের সময়: প্রতি তিন মাসে
৩। মুদ্রাকর: আতাউর রহমান
জাতীয়তা: ভারতীয়
ঠিকানা: ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
৪। প্রকাশক: আতাউর রহমান
জাতীয়তা: ভারতীয়
ঠিকানা: ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
৫। সম্পাদক: দিলীপকুমার গুপ্ত
জাতীয়তা: ভারতীয়
ঠিকানা: ২৫।৪ একবালপুর রোড, কলিকাতা ২৩
৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা: শ্রীমতী এন. রহমান, ৮এ শামসুল হুদা রোড, কলিকাতা ১৭; এ. রহমান, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩; শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্তী, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩।

আমি, আতাউর রহমান, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

আতাউর রহমান
প্রকাশক।

তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩